পরিবর্তন এবং মমতা—দুটো শব্দই এখন সমার্থক। কিন্তু এই পরিবর্তন একদিনে আসেনি। বাংলার মানুষের বহু কাঙ্ক্ষিত এই পরিবর্তন হতে সময় লেগেছে বহু বছর। এর পিছনে রয়েছে পরিবর্তনের কাণ্ডারি মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর সহযাত্রীদের একনিষ্ঠ ধারাবাহিক আন্দোলনের ইতিহাস। এই আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মমতা ব্যানার্জীর নিজের কলমে—এই বইয়ে।

SHOUT
SHARE
IT

পরিবর্তন

পরিবর্তন

পরিবর্তন

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

লেখিকার অন্যান্য বই

উপলব্ধি
পল্লবী
জনতার দরবার
একান্তে
অনুভূতি
অশুভ সংকেত
মানবিক
তৃণমূল
ক্রোকোডাইল আইল্যান্ড
জাগো বাংলা
গণতন্ত্রের লজ্জা
অনশন কেন
আন্দোলনের কথা
নন্দী-মা
চলো যাই
অবিশ্বাস্য
Slaughter of Democracy
Struggle of Existence
Dark Horizon
Smile
মা
জন্মাইনি
সরণী
লাঙল
মা-মাটি-মানুষ
নেতাই
Motherland
শিশুসাথী
আজব ছড়া

ভূমিকা

কী রাগিণী বাজালে মম অন্তরে। আমার লেখনীর একটু একটু করে পথ চলতে চলতে সৃষ্টিপর্ব শেষ করে এক নতুন সৃষ্টির —এই সংযোজন—ঐতিহাসিক 'পরিবর্তন'-এর কাহিনি এবং ধারাবাহিকতাকে দু-মলাটের মধ্যে ধরে রাখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। কলকাতা বইমেলার বইপিপাসুদের জন্য উৎসর্গ করলাম 'পরিবর্তন' বাংলা সহ সর্বত্র মা-মাটি-মানুষের উদ্দেশ্যে। নানা কর্মযজ্ঞ আর অহোরাত্র ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সাঁঝেরবেলায় এই কাজটি করতে আমায় যে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে, সেই আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক অনিন্দ্য জানাকে অজস্র অজস্র ধন্যবাদ। তার সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া একমাসেরও কম সময়ে এই বই শেষ করা সম্ভব হত না।

এই বইয়ে যে ছবিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তার সিংহভাগ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সৌজন্যে পাওয়া। ওই দুই সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছেও আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা রইল।

দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার শ্রীসুধাংশুশেখর দে এগিয়ে না-এলেও এই বই প্রকাশিত হওয়া সম্ভব হত না। ধন্যবাদ তাঁকেও।

১

কী করে পরিবর্তন

আমি 'না'-এ বিশ্বাসী নই।

চিরকালই 'হ্যাঁ'-র প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছি। বাংলার সাধারণ মানুষ যখন 'ত্রাহি-ত্রাহি' করতে করতে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জীবনের বাঁচার দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে আমরা খোলা হাওয়ায় পাল তুলে ফিরে এলাম পরিবর্তনের নতুন পথ ধরে।

এই 'হ্যাঁ'-এর বিশ্বস্ত বাংলায়।

দুঃখের আঁধার রাত্রি পেরোতে গিয়ে, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি উপড়ে ফেলতে গিয়ে, জীবনের মিথ্যা কুহকের পাশে না-দাঁড়িয়ে মৃত্যুর নিদারুণ যন্ত্রণাকে বিকীর্ণ আঁধারের কারাগারে নিক্ষেপ করে নিশীথ রাতের বাদল ধারার পথ চলতে-চলতে, আপন অন্তরে দুঃখের বিদীর্ণ যন্ত্রণাকে গিলতে-গিলতে, দীর্ঘতম কটূক্তি আর অনাচারের সরণি ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবচেতন মনের মহাসমুদ্রতল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। মনুষ্যত্বের এক বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে-করতে বুঝলাম, জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শতাব্দীর কলঙ্কিত রক্ত-সকালের থেকে তমসা ভেঙে জ্যোতির্ময় সূর্যের আভাস মানুষ স্পর্শ করবেই।

এ বিশ্বাস আমার ছিল।

সেই বিশ্বাস নামক প্রবল এক মনুমেন্টের উপর দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের কিছু 'অমৃতবাণী'।

"জাগো, জাগো। দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। মহা ঢেউ উঠেছে। কিছুতেই আর এর গতিরোধ করতে পারবে না...। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় পেও না। সবচেয়ে গুরুতর পাপ ভয়।"

নিশ্চিন্ত হলাম। আমার চেতনার রং হল সবুজ। আমার ভাবনার রং হল হাওয়া-বদলের, পরিবর্তনের এক নতুন ভোর।

*　　*　　*

কী করে এল এই 'পরিবর্তন?

এটা কিন্তু একটা লাগাতার চেষ্টা। নিরন্তর প্রক্রিয়া। এটা কিন্তু একদিনের লড়াইয়ে আসেনি। সেই পরিবর্তনকে ধরে রাখার সংগ্রামই চলছে এখনও। প্রতিদিন। প্রতিনিয়ত। প্রতিমুহূর্তে।

২০১১ সালের শেষে এই কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলাম। তখনই প্রথম মাথায় ভাবনাটা এল—কী করে এল এই পরিবর্তন।

অনেকেই হয়তো ভাবেন, এটা একটা ম্যাজিকের মতো ঘটে গিয়েছে। যারা ক্ষমতা থেকে চলে গিয়েছে, তারা এখনও ভাবতে পারছে না তারা আর ক্ষমতায় নেই। তাই নানা অছিলায় এখনও বিভিন্ন চক্রান্ত করছে। মগরাহাটের বিষমদ কাণ্ড বা নোদাখালিতে পানীয় জলে বিষ আছে এই গুজব ছড়িয়ে দেওয়া সেই সমস্ত চক্রান্তেরই অঙ্গ। কিন্তু বিষমদ খেয়ে মৃতদের জন্য আমরা যা করেছি, সিপিএম তার কিছুই করেনি। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরে তো নয়ই, ক্ষমতায় থাকার সময়েও নয়। আমি সবসময় মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে গিয়েছি। বিরোধীদলে থাকার সময় আমরা কিন্তু কখনও সরকারের বিরুদ্ধে 'সাবোতাজ' করার চেষ্টা করিনি। বরং সঙ্কটের সময় সবসময় সরকারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দাঙ্গা ঠেকাতে ঘুরে বেড়িয়েছি। একমাত্র মাদার টেরিজাকে তখন রাস্তায় দেখেছিলাম। জ্যোতি বসু বা সিপিএমের বড়মাপের কোনো নেতা তখন কিন্তু রাস্তায় নামেননি!

এই পরিবর্তন হওয়ার আগে অনেক মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধছিল। আদৌ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে হটানো যাবে কি? ক্রন্দনরোল বক্ষে যখন তুফানের আলোড়ন তুলেছে, দমকে-দমকে গুমরে-গুমরে অত্যাচারিত মানুষের বুকের তীব্র যন্ত্রণা যখন ফুলেফেঁপে কাঁদছে, যখন গণতন্ত্রের কণ্ঠকে টুঁটি টিপে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে, তখন মানুষ ভাবছিলেন, সত্যিই কি বাংলায় পরিবর্তন হবে? সত্যিই কি এই বামফ্রন্ট বাংলার শাসনক্ষমতা থেকে

বিদায় নেবে?

এক অজানা ভয়ে মানুষের মন ভারাক্রান্ত হচ্ছিল। অনেকবার স্বপ্ন দেখেও হতাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই ভাবতে পারছিলেন না যে, মাটির ঘ্রাণে আসছে পরিবর্তনের গন্ধ। ঠিক সেই সময়টায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সন্দেহের বিভীষিকাকে হৃদয়ের কারাগারে বন্ধ করে রেখে আমরা এগোচ্ছিলাম এক নিঃশব্দ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে।

সেই নিঃশব্দ বিপ্লব কিন্তু এক বা দু'বছরে সম্ভব হয়নি। এর জন্য বছরের পর বছর, নিশির পর নিশি কেটে গিয়েছে। কত শত নিশীথের বাদলধারাকে অগ্রাহ্য করে বাসনা-শূন্য হৃদয়কে, নির্বাক বহ্নিকে নিজের অন্তরে গোধূলির ক্ষীণ আলোয় বন্দি করে, একটু একটু করে সংগ্রামকে হাতিয়ার করে এগোতে হয়েছে। এগোতে হয়েছে মাটির আঁচলকে সাক্ষী রেখে।

এ একমাত্র জানে আমার 'ডাউন মেমরি লেন'-এর ভাণ্ডার! আমার 'ফিরে দেখা'।

কেই-বা জানত যে, একটার পর একটা আন্দোলন করে যখন আমাদের সংগ্রামকে আমরা মানুষের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছি, যখন যুদ্ধজয় করার দিকে এগিয়েছি, তখন রাজনীতির বোঝাপড়ার খেলায় সেই লড়াইকে ছোট করে দেখাতে গিয়ে গোপনে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাই ঘরপোড়া গরুর মতো সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পেতেন মানুষ। আর সেই ভয় থেকে বেরোনোর জন্য আমার শুধু মনে হত, 'এল যে শীতের বেলা, বরষ পরে। এ বার ফসল কাটো, লও গো ঘরে। কর ত্বরা, কর ত্বরা। কাজ আছে মাঠ-ভরা'। এগোতে আমাদের হবেই। এই আশায় বুক বেঁধে যে, হয় করব। নয় মরব। হয় লড়ব। নয় মরব। এই মানসিকতা নিয়েই লড়তে-লড়তে ফাগুন-শেষে দিলাম বিদায় পুরোনোকে। দীর্ঘদিনের এক কঠিন লড়াইয়ের কারাগার ভেঙে এগিয়ে গেলাম নতুনের দিকে।

পরিবর্তন বাংলার বুকে আরও ১৫ বছর আগেই, এমনকী, ১৯৯৬ সালেই হতে পারত। হতে পারত এমনকী ২০০১ সালেও। কেন হয়নি, কী কারণে হয়নি, তা হয়তো অনেকের জানা। আবার নতুন প্রজন্মের কাছে অজানাও হতে পারে। তাই বন্ধু, মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই একটু স্মৃতির সরণির দিকে ফিরে তাকানো।

আমার বেশ মনে আছে, ১৯৮৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে ভিন্ন-ভিন্ন

গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করে সারা বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরে-ঘুরে মানুষের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে দীর্ঘ দশ-বারো বছর ধরে সিপিএমের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস জুগিয়েছিলাম। যার পরিণতি সিপিএম সহ্য করতে পারছিল না। তাই ভাবছিল, কী করে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। যাতে কেউ আর প্রতিবাদ করতে না-পারে আর আমরাও যাতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাথী না-হতে পারি। সিপিএমের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আঁতুড়ঘরে চলছিল তার পরিকল্পনা।

যখন বেহালায় ভেজাল তেলের কেলেঙ্কারিতে বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন, তখন সেই আঁতুড়ঘর থেকেই ক্যাডার লেলিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে ভাঙার চক্রান্ত হয়েছিল। সেই ক্যাডাররা প্রশাসনের সামনেই আক্রমণ করত বিনা দ্বিধায়। কখনও বাসভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনে পরপর অনেককে গুলি করে হত্যা করা। মানুষ এবং গণ আন্দোলনকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা চলছিলই।

১৯৮৪ সালের শেষদিকে নভেম্বরে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সংসদে পা দেওয়ার পর থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বারবার লোকসভায় তুলে ধরার ও অন্যের জন্য দরবার করার একটানা প্রয়াসকে অনেক সাধারণ মানুষই সমর্থন করছিলেন। যাদবপুর থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর সেখানকার সাধারণ মানুষের একটাই দাবি ছিল—উদ্বাস্তুদের জন্য 'নিঃশর্ত জমির দলিল'।

তখন সংসদের নিয়ম-কানুন তেমন জানতাম না। ইংরেজিও ভালো বলতে পারতাম না। কী করে সংসদে নিজের দাবি জানাতে হয়, তা-ও ঠিকঠাক বুঝতাম না। উদ্বাস্তুদের বিষয়টি কার অধীনে, কী করে বিষয়টা সংসদে তোলা যায়, এসব ভাবতে ভাবতেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, সংসদে আমি একেবারে এক নতুন 'স্টুডেন্ট'। তাই শুরু করে শেষ—সারাদিন সংসদের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখতাম। দেখতাম, কে কী বলছেন, কে কী করছেন। আর রাজীব গান্ধীর নামে কেউ উল্টোপাল্টা কিছু বললেই প্রাণপণে চিৎকার করে বাধা দিতাম।

বয়সে ছোট ছিলাম বলে সকলে আমায় একটু বেশিই স্নেহ করতেন আর সাহস সংক্রান্ত নানা বিশেষণে ভূষিত করতেন। রোজ একেবারে স্কুলের

ছাত্রীদের মতো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সংসদে বসে থাকতাম। এ ভাবেই বসে লক্ষ করতে-করতে আমার জীবনে নির্বাচনে জেতার পর প্রথম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি উদ্বাস্তুদের জন্য নিঃশর্তে জমির দলিলের লড়াই শুরু করেছিলাম। শুধু শুরু করেই থেমে যাওয়া নয়। লাগাতার সংসদ থেকে রাস্তা—লেগে থাকতে-থাকতে এবং আইনত সরকারের একটা জমির দলিল জোগাড় করে, একটা যখন হচ্ছে, অন্যটা কেন হবে না—যুক্তি দিয়ে সেই স্বীকৃতিও আদায় করে নিতে পেরেছিলাম।

পুরোনো সংবাদপত্র লক্ষ করলে দেখা যাবে, তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন চহ্বান'জি। তাঁকে 'কনভিন্স' করার পর তিনি যখন কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন, তখন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় ওই দফতর থেকে। দায়িত্ব দেওয়া হয় বুটা সিংহকে।

বুটা সিংহ'জিকে আবার বোঝাতে নথিপত্র দেখিয়ে এ-পার বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জীবনে স্বপ্ন দেখার বাস্তব কাহিনি ও নেহরু'জি-লিয়াকত চুক্তি, ইন্দিরা-শেখ মুজিব চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করে, যাঁরা ও-পার বাংলা থেকে এক কাপড়ে চলে এসেছিলেন, তাঁদের সম্মান জানিয়ে, তাঁরা যে চুক্তির ফসল হিসেবে নিঃশর্তে জমির দলিল পাওয়ার অধিকারী, তা বুঝিয়ে সাংসদে তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে উদ্বাস্তুদের জন্য নিঃশর্ত জমির দলিল দেওয়ার ব্যবস্থা আদায় করে নিতে পেরেছিলাম। এবং আমার আব্দার মেনেই তারপর বুটা সিংহ'জি স্বয়ং এসে যাদবপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য নিঃশর্তে জমির দলিল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর জনগণের কাছে দেওয়া কথা রাখার জন্য পথচলা সেই শুরু আমার।

তারপর থেকে কখনও ভেজাল তেলের আন্দোলনে আমার উপর সিপিএমের আক্রমণ, কখনও জনগণের জন্য ঋণ মেলাকে কেন্দ্র করে হামলা, কখনও বাসভাড়া বৃদ্ধি, কখনও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আমি এবং আমার সহকর্মীদের উপর পুলিশ-সিপিএমের যৌথ হামলা।

যাদবপুরে আমাদের দু-জন সহকর্মী ছিল তখন। তাদের নাম মণি দাস ও মনা দাস। আমি তখন ছাত্র-রাজনীতি করি। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ শিশির বসুর সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ওই দুই কর্মীকে খুন করে সিপিএম

অ্যাম্বুল্যান্স দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছিল। ফলে সেখানে তখন তুঙ্গ উত্তেজনা।

বেশ মনে পড়ে, জীবনে প্রথমবার সাংসদ হওয়ার পর রাজডাঙায় জোর করে উদ্বাস্তুদের জমি কেড়ে নেওয়া নিয়ে পুলিশের প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছিল। সেটা সম্ভবত ১৯৮৫ বা '৮৬ সাল হবে। আচমকা মধ্যরাতে আমার কাছে খবর আসে যে, সারা বাংলার পুলিশকে একত্রিত করে এলাকাকে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে পুলিশ এবং সিপিএম। বুলডোজারের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বাস্তুরা লড়তে পারছেন না। তাঁরা অসহায়। হাহাকার করছেন।

প্রথমে ভাবতে পারিনি যে, এমন একটা ন্যক্কারজনক ঘটনা সত্যি সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে।

সেদিনই দুপুরে উদ্বাস্তুদের একটি টিম নিয়ে আমি তদানীন্তন জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিলাম, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না-করে যেন গায়ের জোরে মরিচঝাঁপির কায়দায় উদ্বাস্তুদের বুলডোজার আর বন্দুক দিয়ে উচ্ছেদ না-করা হয়। অনেকক্ষণ আলোচনার পর প্রশাসনের তরফে আমায় আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে আলোচনা করে পুনর্বাসন প্যাকেজের ব্যবস্থা করে তবে ওই এলাকার দখল নেওয়া হবে।

ওই আলোচনা হওয়ার পরেও একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ঘটেছিল। যা শুনে আমি যথেষ্ট অবাক এবং হতচকিত হয়ে গিয়েছিলাম।

বরাবরই আমি জীবনে আমি একটু একগুঁয়ে, জেদি। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে পারব না—এই চিন্তাধারাই আমায় রাজনীতির মধ্যে দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য কাজ করায় উৎসাহিত করেছে।

সেদিন আলোচনার পর বেরোনোর আগে হঠাৎ যে প্রস্তাব তদানীন্তন জেলাশাসক প্রশাসনের তরফে আমায় দিয়েছিলেন, তাতে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। উনি আমায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার একটু আলাদা কথা আছে।'

আমি সম্মতি দেওয়ার পর বাকি সকলে মিটিং-রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন জেলাশাসক আমায় বললেন, 'যাদবপুর থেকে জেতার জন্য আপনাকে অভিনন্দন। আপনি জিতে যাবেন, এমন ধারণা আমাদের ছিল না। যাই হোক, যে কথাটা আপনাকে আলাদা করে বলতে চেয়েছিলাম, তা হল, আমরা কিন্তু জোর করে বুলডোজার আর বন্দুক নিয়েই ওই এলাকা থেকে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ

অভিযান করব। আপনি যদি কাল দিনটা কলকাতায় না-থেকে দিল্লি বা অন্য কোথাও চলে যান, তা হলে ভালো হয়। আপনি না-থাকলে মসৃণভাবে উচ্ছেদ অভিযান হয়ে যাবে। উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় উদ্বাস্তুদের নিয়ে আপনি আমার কাছে এসে ডেপুটেশন দেবেন। তখন আমি আপনার কিছু কিছু দাবি মেনে নেব। আমাদের কাজও হবে। আর আপনার কাজও হয়ে যাবে।'

আমি প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না যে, উনি আমায় কেন ওইসব কথা বলছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম, ওঁদের ধারণা যে, মানুষকে প্রতারণা করে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি সরে যাব। সব হয়ে যাওয়ার পর একটা লোক-দেখানো ঘেরাও অভিযান করব। তখনই আমার মনে হল যে, তার মানে সিপিএম এই কায়দা করেই বিরোধীদলের লোকদের 'ম্যানেজ' করে সুকৌশলে ক্ষমতায় রয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমায় আরও সতর্ক থাকতে হবে। ওই ঘটনাটা রাজনৈতিক জীবনে আমায় আরও সতর্ক ও মানবপ্রেমী হতে সাহায্য করেছিল।

ওই জেলাশাসককে সাফ বলে এসেছিলাম, 'আপনি যখন আমায় সরে যেতে বলছেন, তখন জেনে রাখুন, আমি কোথাও যাব না। আর জোর করে বুলডোজার চালালে কিন্তু অসহায় মানুষের হয়ে বিরুদ্ধতার মানবপ্রাচীর গড়ব। আমায় মেরে না-ফেললে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন না-দিয়ে গায়ের জোরে ওই জমি নিতে পারবেন না।'

গনগনে রাগ মাথায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। আর উদ্বাস্তু ভাইবোনদের বলে দিয়েছিলাম, 'এলাকায় যান। পুলিশ আর বুলডোজার ঢুকতে শুরু করলেই আমায় ফোন করবেন।' সারা রাত জেগে বসেছিলাম ফোনের পাশে। শেষপর্যন্ত ভোর চারটের সময় ঝনঝন করে ফোন বেজে উঠল। বুঝলাম, কোনো অশনি সঙ্কেত। ঠিক তাই। গোটা এলাকায় বুলডোজার, বুট আর বন্দুকের তর্জন। ফোনে বললাম, 'আপনারা জড়ো হন। আমি আসছি।'

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ওই ভোরে একাই বেরিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লাম স্পটে। পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে, অত দ্রুত আমি পৌঁছে যাব। গিয়ে দেখি হাজার হাজার মা-ভাই-বোন জড়ো হয়েছেন। আমি তাঁদের নিয়ে বুলডোজারের সামনে বসে পড়লাম। বুলডোজারের গর্জনকে ছাপিয়ে গেল মানুষের গর্জন। জ্বলে উঠল উদ্বাস্তু মানুষগুলোর প্রাণের বিদ্রোহ। একটা সময়ে পুলিশ পিছু

হটতে শুরু করল। গণবিদ্রোহের মধ্যে পড়ে গেলেন তদানীন্তন এসডিও। নামটা এখনও আমার মনে আছে। তিনি আলিপুরের এসডিও ছিলেন। সত্যব্রত চক্রবর্তী। তাঁকে জনতা প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছে। তার মধ্যে বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল পড়ছে। গুলিও চলছে। আমি দেখলাম, যে ভাবে এসডিও ঘেরাও হয়ে গিয়েছেন, তাতে জনতার রোষে তিনি প্রাণ হারাতে পারেন। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে জনতাকে শান্ত করলাম। সত্যব্রতবাবুকে বললাম, বুলডোজার নিয়ে ফিরে যান। বললাম, 'বারণ করা সত্ত্বেও আগুন নিয়ে খেলতে গেলেন কেন?' এলাকা থেকে সরিয়ে সেদিন প্রাণে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম ওঁকে। এরপর বহুদিন ওই উচ্ছেদ-অভিযান বন্ধ ছিল।

ওই আন্দোলনের জেরে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মহাকরণে ডেকেছিলেন। আমরা গিয়েছিলাম উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করতে। কিন্তু তাঁর ঘরে বৈঠক করতে যেতেই শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মহারাজা সুলভ ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমায় বললেন, 'অত ঝগড়া করেন কেন? ঝগড়া বন্ধ করার জন্যই আপনাকে ডেকেছি।' শুনেই মাথাটা গরম হয়ে গেল। বললাম, 'ঝগড়া করতে আমরা আসিনি। কিন্তু আমাদের ডেকে এনে আপনি এভাবে ঝগড়া করছেন কেন?'

তারপর জেলাশাসকের সঙ্গে পুনর্বাসন প্যাকেজ নিয়ে কথা হল। তখন সিপিএম তার নিজস্ব কায়দায় উদ্বাস্তুদের ভয় দেখিয়ে ও তাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে কিছু কিছু লোককে নিজেদের মতো করে বুঝিয়ে (আসলে ভুল বুঝিয়ে) সরকারি ক্ষতিপূরণের নামে অল্পবিস্তর কিছু নিতে বাধ্য করল।

সেটা অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করার সুযোগ ওদের হয়নি। তবে আমাদের আন্দোলনের ফলেই ওই অসহায় মানুষগুলো পুনর্বাসন প্যাকেজ ও ক্ষতিপূরণ পেতে শুরু করেছিল। সে ক্ষতিপূরণও খুব সামান্য। কিন্তু ওই আন্দোলনের ফলে বাংলার মানুষ বহু জায়গায় উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস পেয়েছিলেন। আর আমার শুরু হয়েছিল পথ-চলা। অবহেলিত ও অসহায় মানুষের বিচারের দাবিতে, ন্যায্য অধিকারের জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ না-করে, রাজনতির ফায়দা না-তুলে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমার লড়াই। রাজনৈতিক জীবন শুরুর প্রথম থেকেই।

মায়ের সঙ্গে কিশোরী মমতা।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পদযাত্রা।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে। ২২ ডিসেম্বর ১৯৯১।

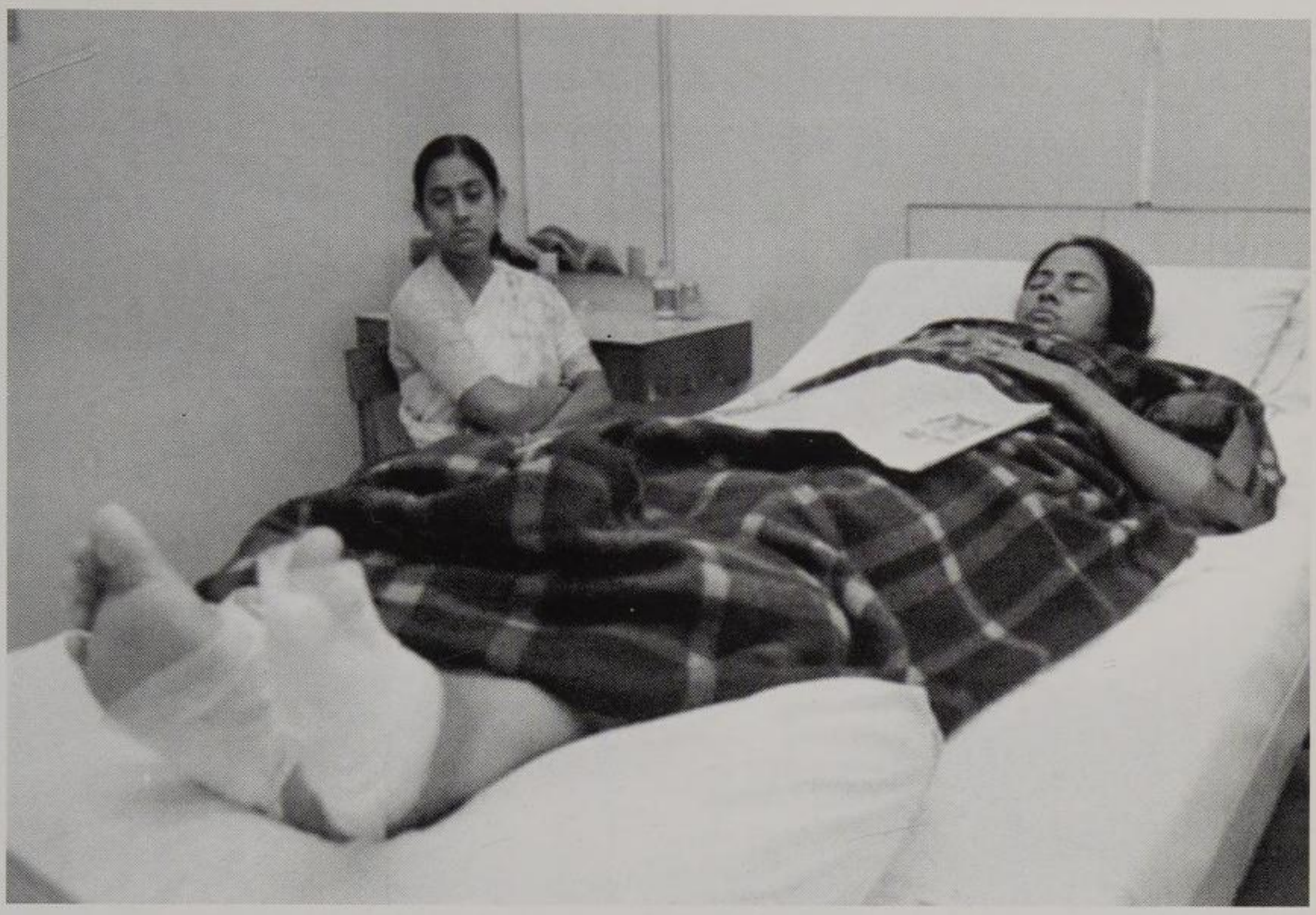

রডন স্কোয়ারে বিক্ষোভ চলাকালীন আহত হওয়ার পর নার্সিংহোমে শায়িত জননেত্রী।

আগস্ট ১৯৯০। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই জনসভায় জননেত্রী।

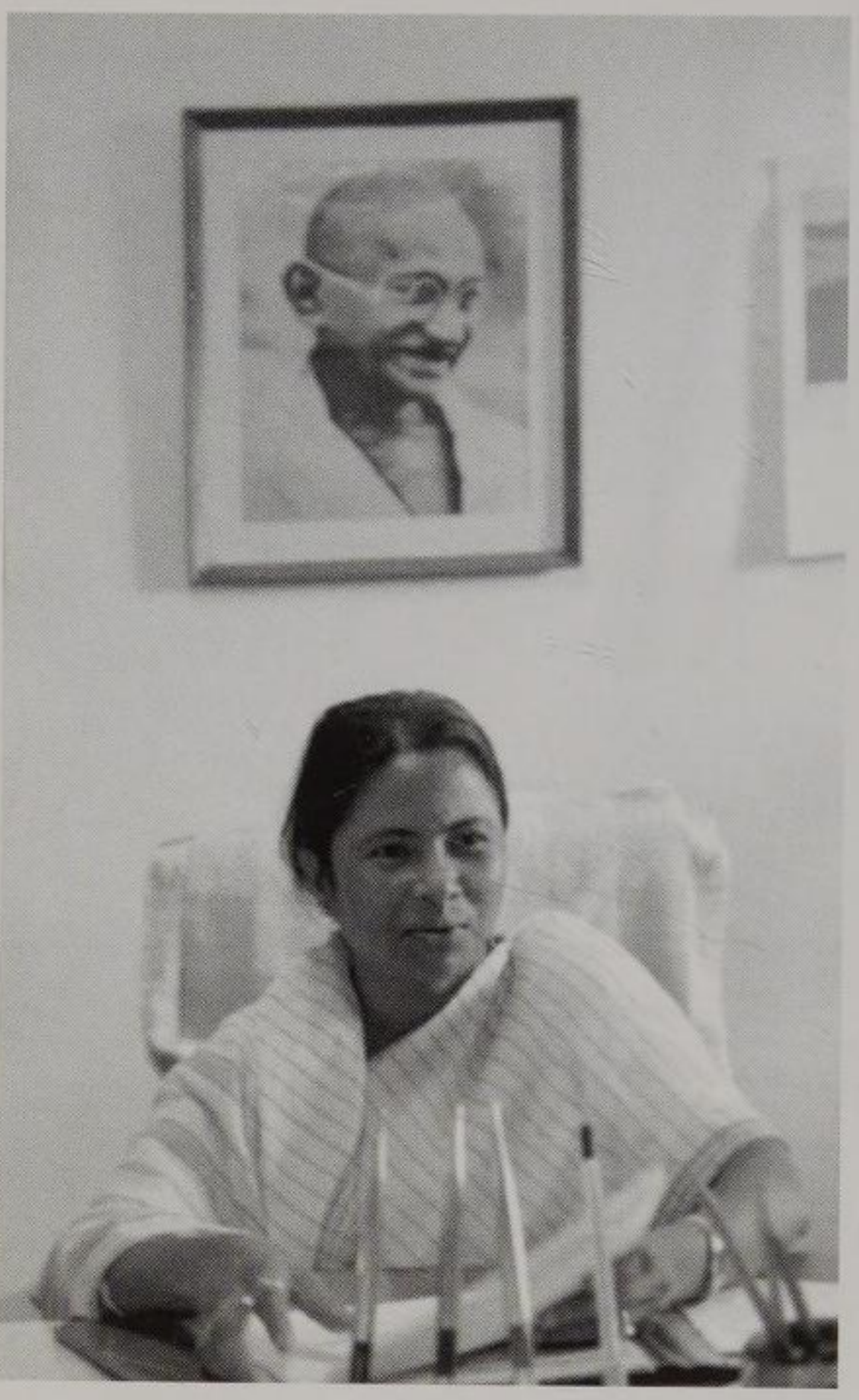

১৯৯২ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে নিজের দফতরে।

আবার আইনজীবীর ভূমিকায়।

শহরের এক হাসপাতালে ভর্তি মমতাকে দেখতে এলেন প্রবীণ নেতা বলরাম জাখর।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সুনীল দত্তর সঙ্গে কালীঘাটের বাড়িতে মমতা ব্যানার্জী।

আগস্ট ১৯৯০। স্থান হাজরা মোড়। সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনি ঝাঁপিয়ে পড়ল মমতার উপর।

৭ জানুয়ারি ১৯৯৬। তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা আলিপুর এসডিজেএম আদালতে, আইনজীবীর ভূমিকায়।

১৯৯০, ১৬ আগস্ট। সিপিএমের হার্মাদবাহিনির আক্রমণে আহত মমতা।

হাসপাতালে বলরাম জাখরের সঙ্গে।

২২ মে ১৯৯৮ । তৃণমূলের সভায় জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে ।

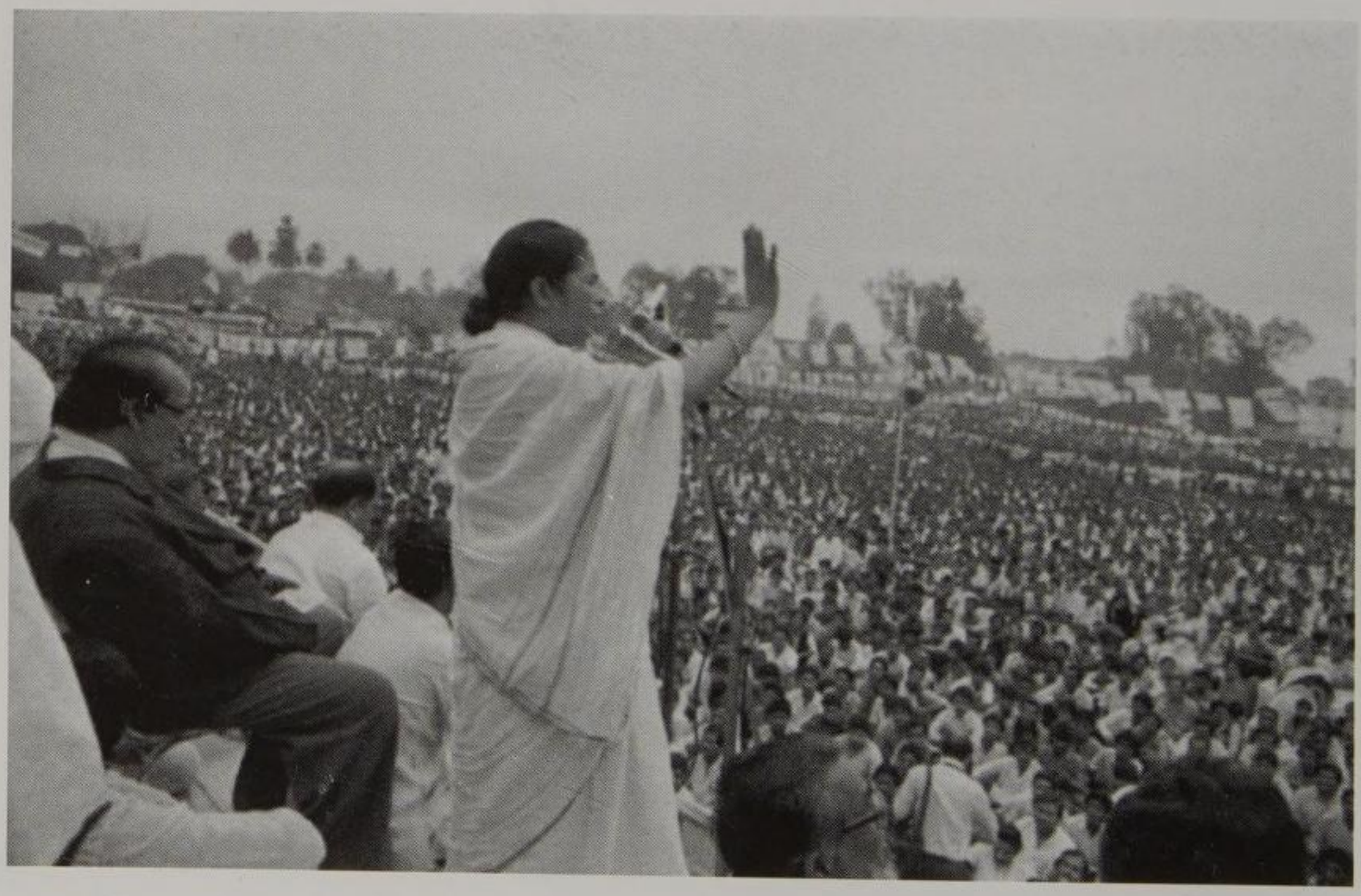

জনাকীর্ণ জনসভায় জনগণের নেত্রী ।

রমজান-এর সময় ইফতারের আগে প্রার্থনা।

মাদার টেরিজার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

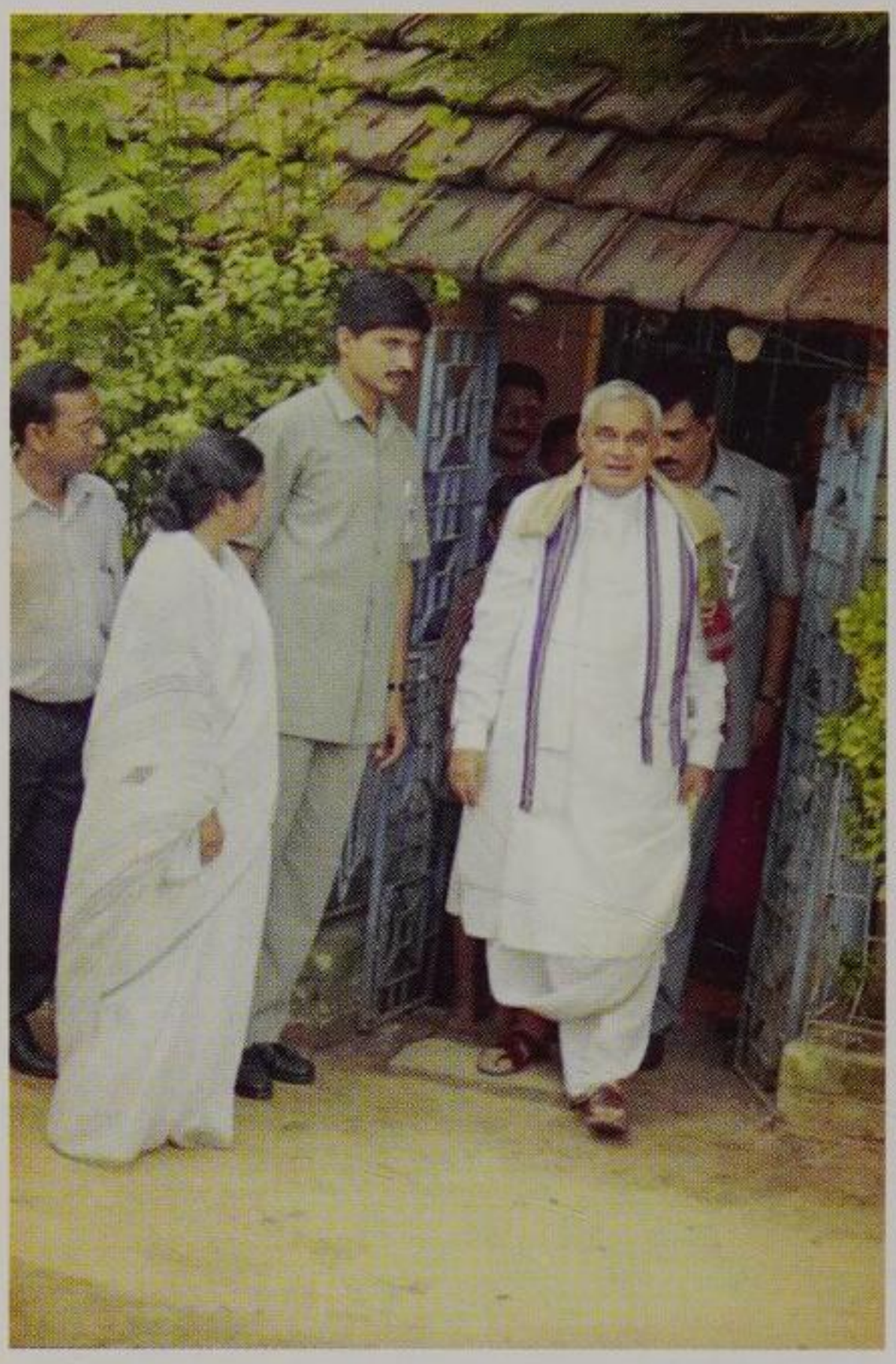

৬ জুলাই ১৯৯০। মমতা ব্যানার্জির কালীঘাটের বাড়িতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ী।

শরীরে অসংখ্য আঘাত। তবু অপ্রতিরোধ্য মমতা।

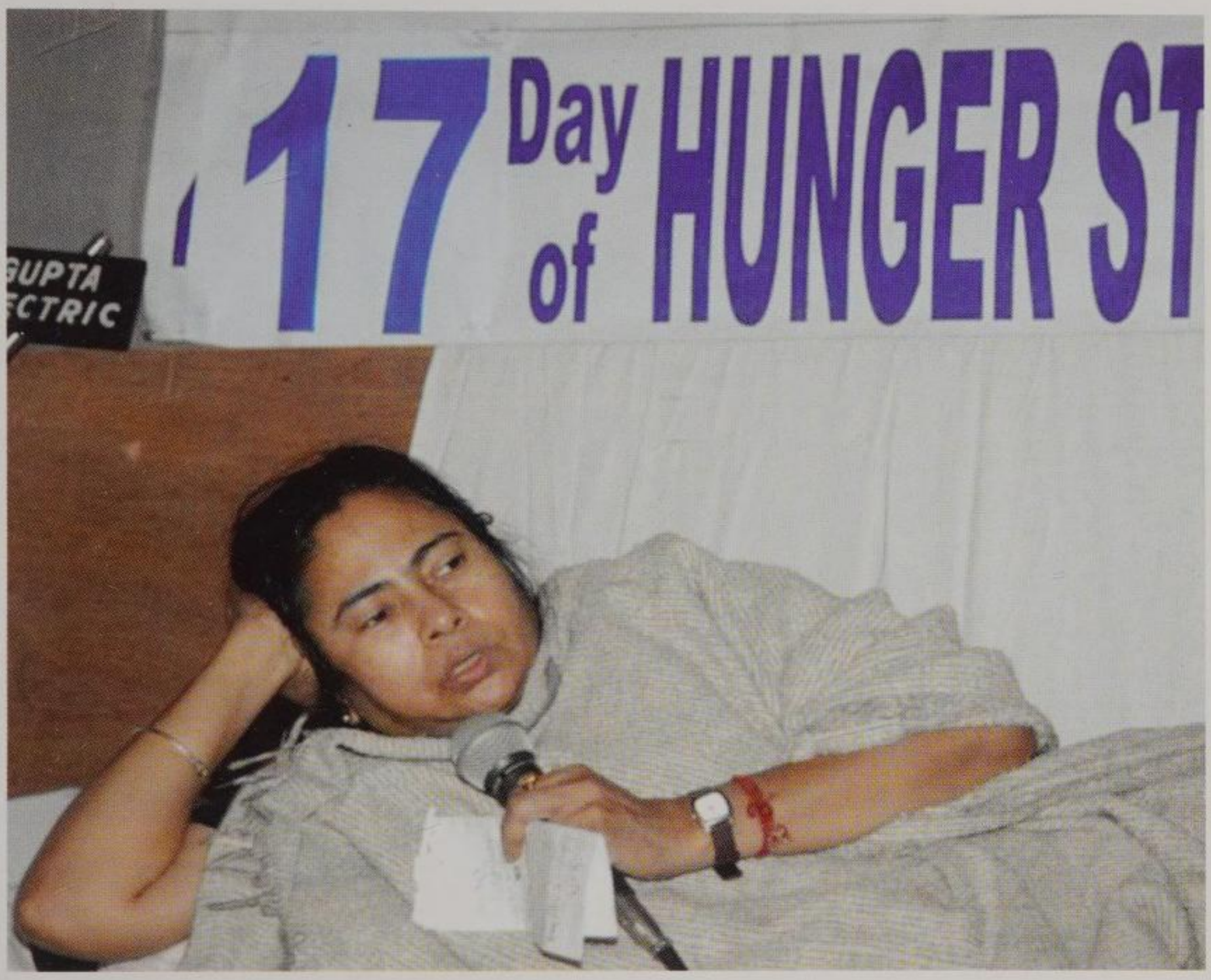

সিঙ্গুর আন্দোলনে মমতা। অনশনের সপ্তদশ দিন। ২০ ডিসেম্বর ২০০৬।

ধর্মতলার অনশন মঞ্চে।

অনশন সত্যাগ্রহের অষ্টাদশ দিন। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর সঙ্গে।

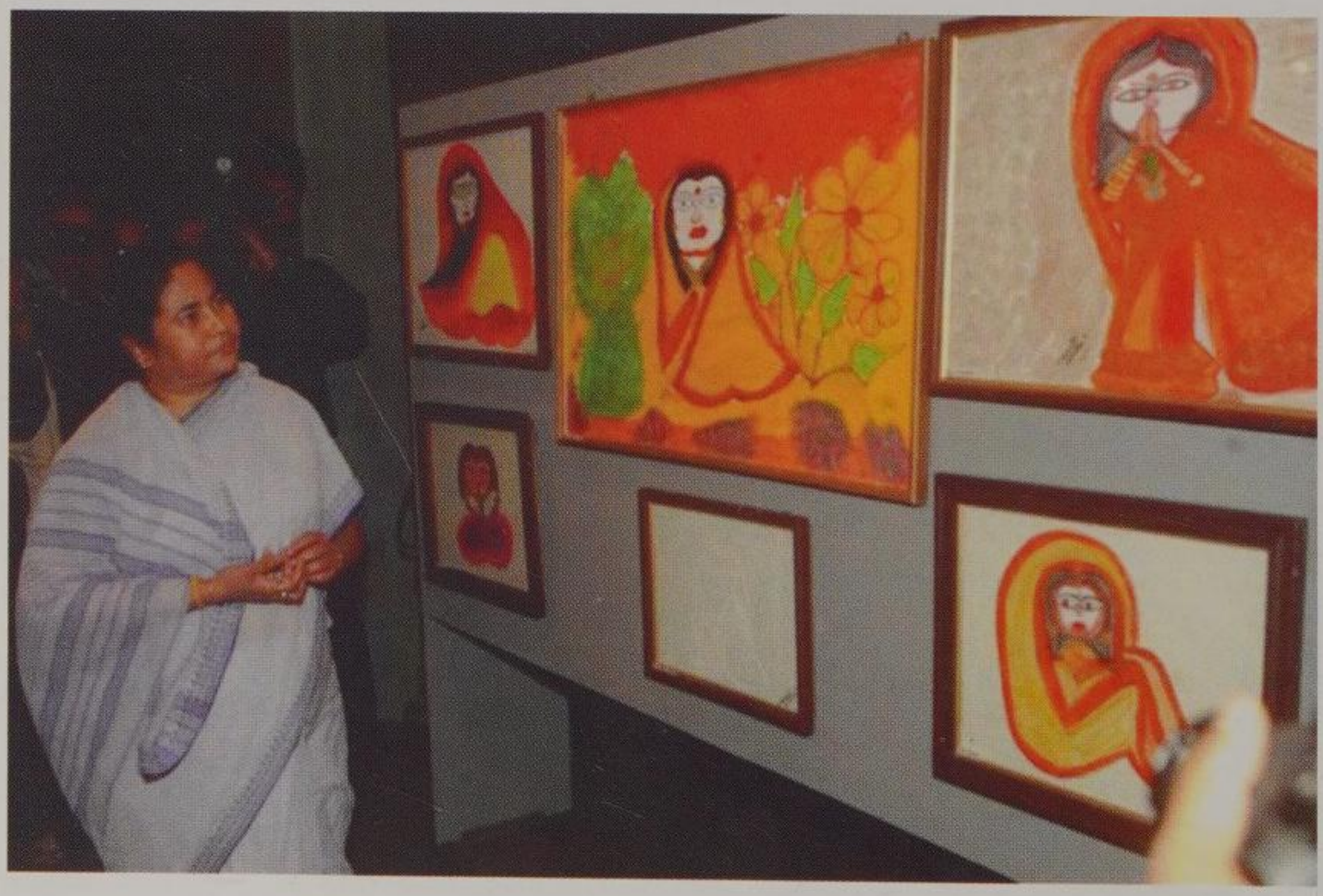

নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনীতে, ২০০৪।

ভোট প্রচারে মমতা।

মাদার টেরিজার সঙ্গে।

পরিবর্তন চাই, তৃণমূলের সভায় জনপ্লাবন।

রেলযাত্রী জননেত্রী। একবার চোখে দেখার আশায় আকুল জনতা।

রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাটিলের সঙ্গে।

সর্বদা প্রতিবাদী। অকুতোভয়।

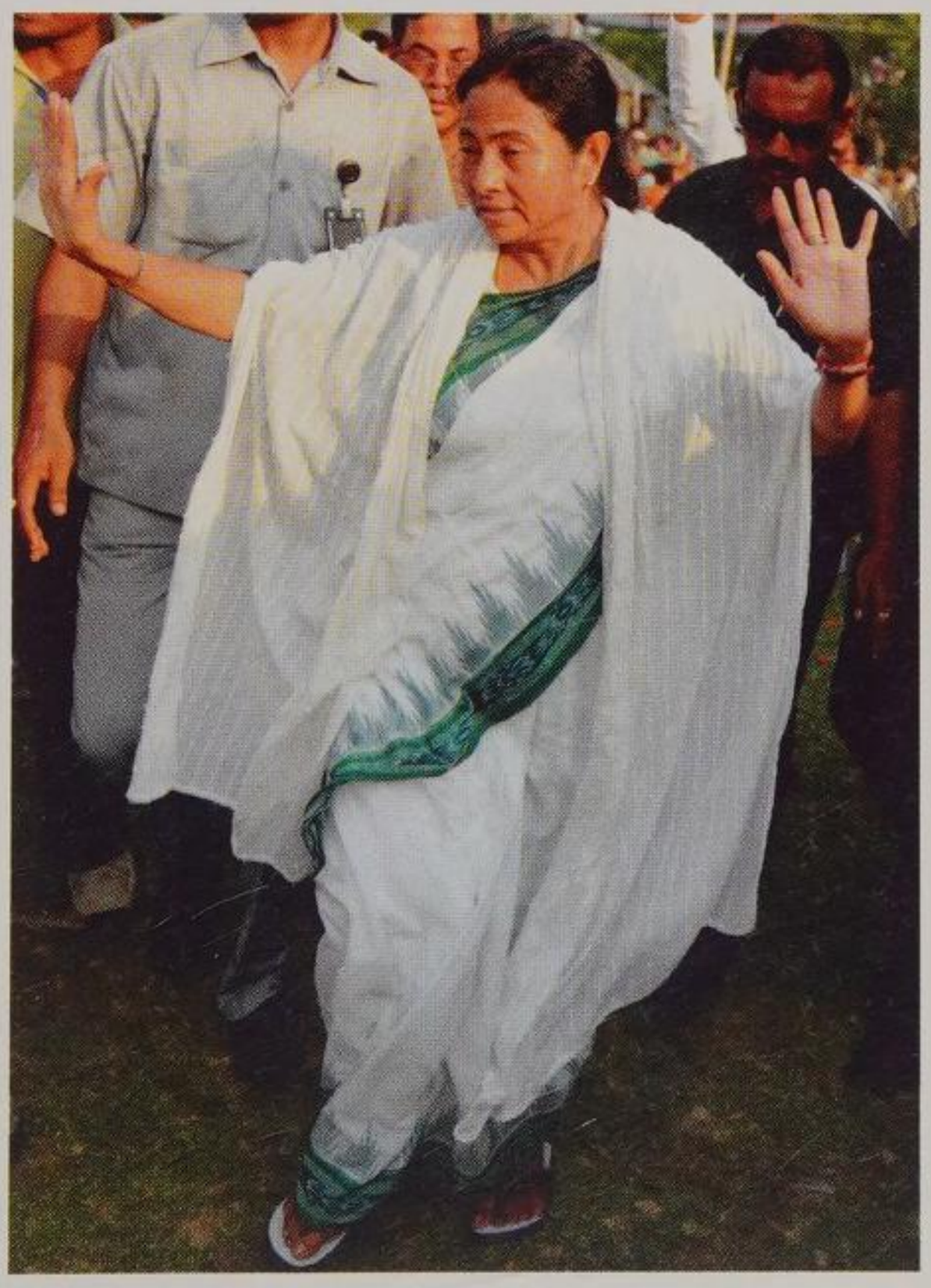

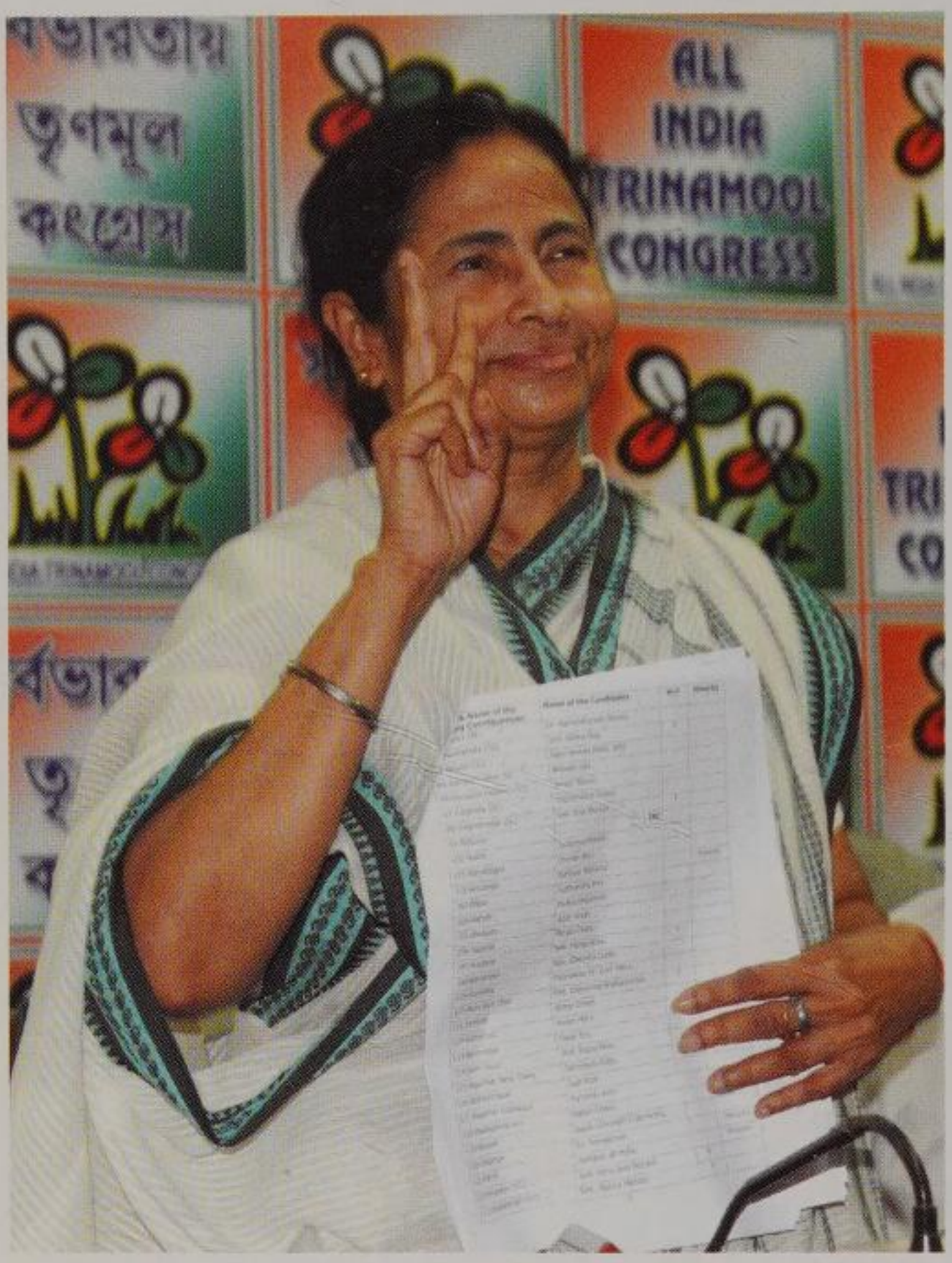
ALL
INDIA
TRINAMOOL
CONGRESS

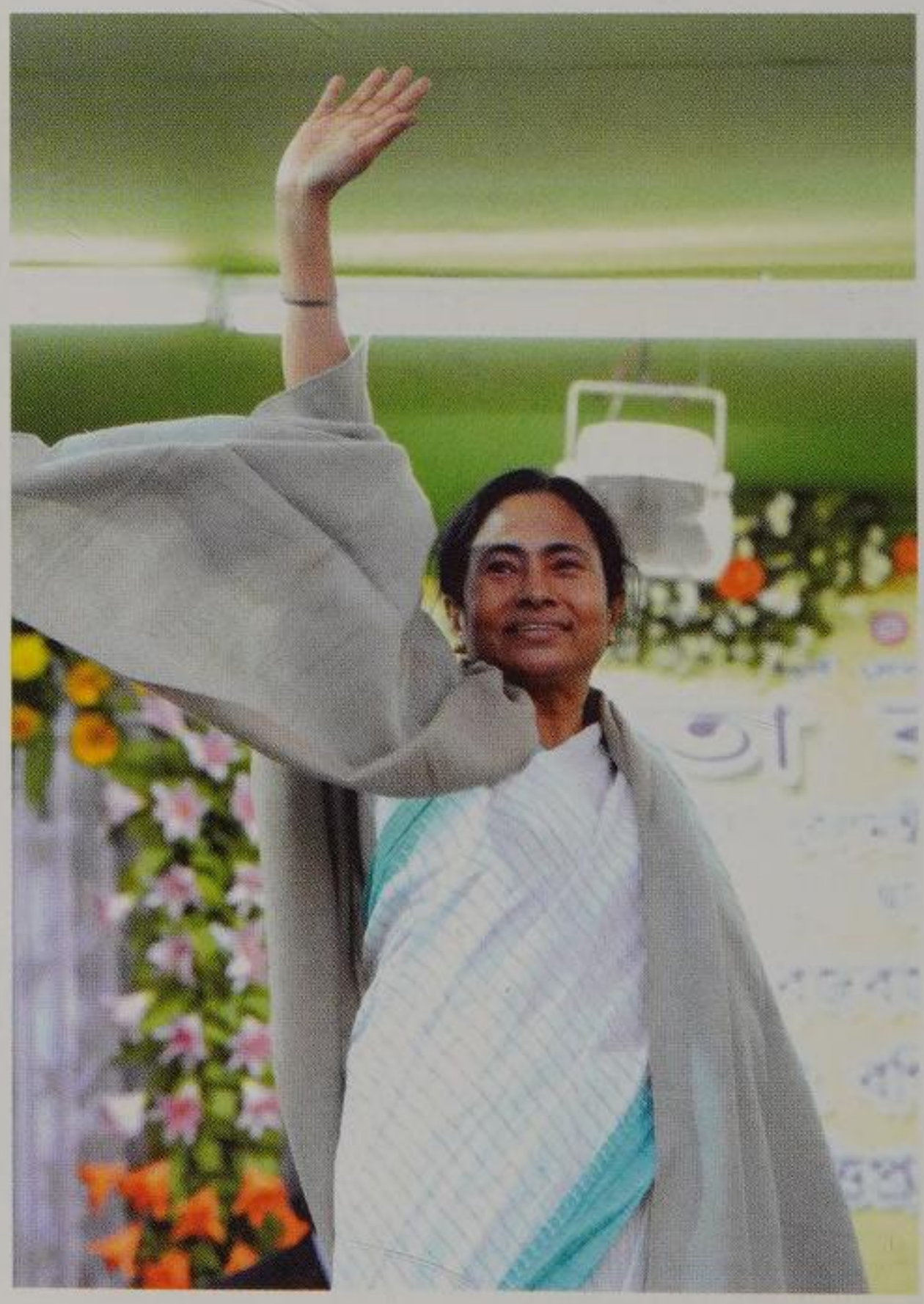

জ্যোতি বসুর জন্মদিনে শুভেচ্ছা। পাশে শোভন চট্টোপাধ্যায়।

২৭ এপ্রিল ১৯৯১। চৌরঙ্গি বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রচারে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে।

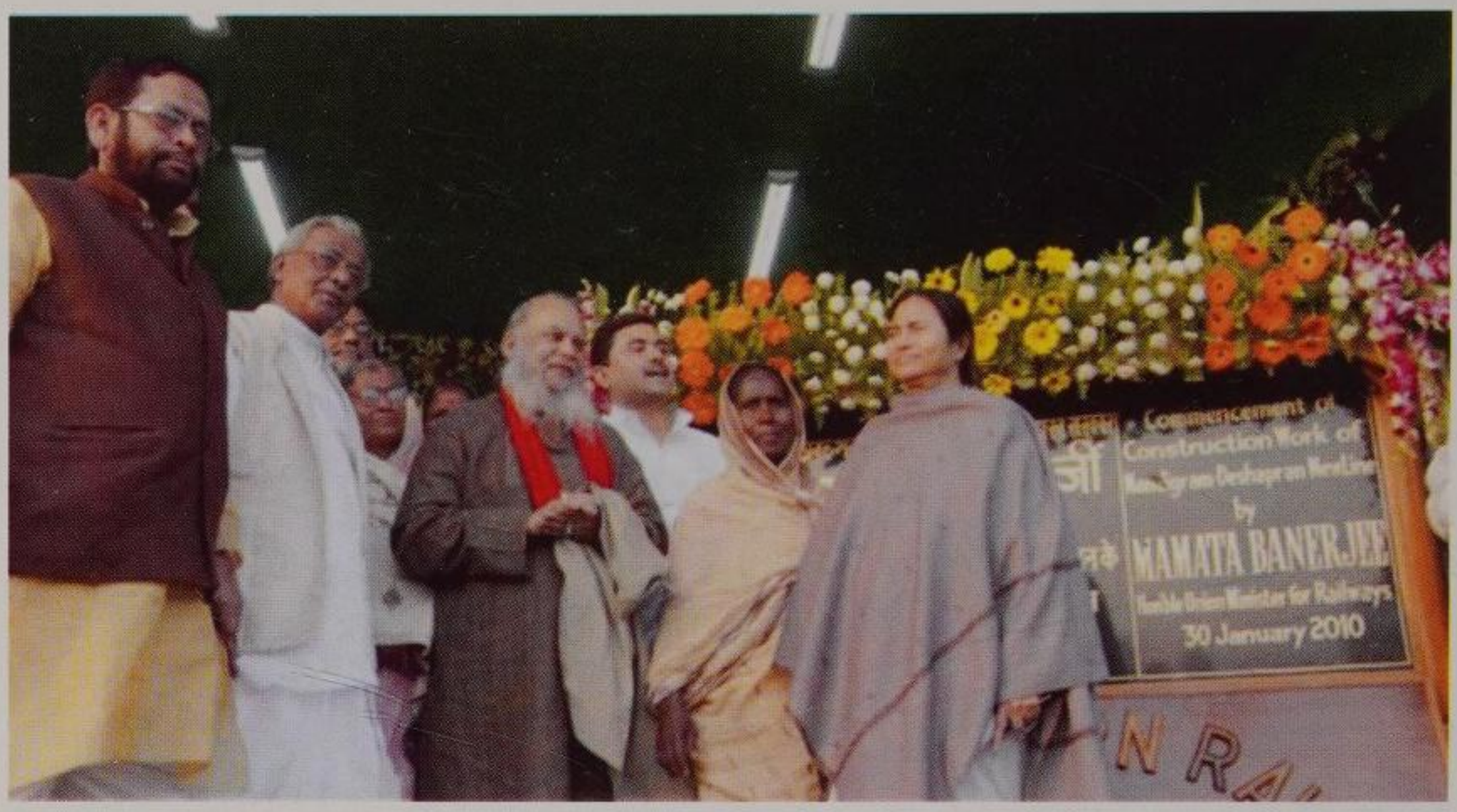

তখন রেলমন্ত্রী। নন্দীগ্রামে এক অনুষ্ঠানে।

হাত বাড়ালেই বন্ধু।

পরিবর্তন আনবই। ধর্মতলার জনসভায়।

২০০৬-এর জুন মাস। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধরনা চলাকালীন প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে কথোপকথন।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ হাসিনার সঙ্গে।

২৬ দিন অনশনের সময় দেখা করতে এলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং।

আজ অনেক সংবাদমাধ্যম বলার চেষ্টা করে, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আমার লড়াই নয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াই অবশ্যই ঐতিহাসিক। কিন্তু আমাদের লড়াই চলেছিল দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর ধরে। বহু সংগ্রাম ও বহু প্রতীক্ষার ফসল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন। উদ্বাস্তু আন্দোলনের পর পরই হয়েছিল ভেজাল তেল নিয়ে আন্দোলন। মাসখানেক ধরে বেহালায় ওই আন্দোলন চলার পর আবার গরিবদের জন্য ঋণমেলা নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলাম। একদিকে গরিব মানুষকে ঋণ পাইয়ে দেওয়া অন্যদিকে সিপিএমের চেষ্টা, যাতে আসল গরিব মানুষরা সাহায্য না-পায়। সিপিএমের সেই প্রত্যক্ষ অন্যায়ের প্রতিবাদে ধারাবাহিক আন্দোলন করেছিলাম। প্রশাসনিক আর রাজনৈতিক হামলাও হয়েছিল সেই আন্দোলনের উপর।

ক্ষমতায় থাকার লোভে কী না-করেছে সিপিএম! প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রামে 'সূর্যোদয়ে'র জন্য তেখালি ব্রিজ থেকে পুলিশ-ক্যাম্প পর্যন্ত সরিয়ে নিয়েছে প্রশাসনকে হাত করে। সিঙ্গুরে দিনের পর দিন ১৪৪ ধারা জারি করে গণ-আন্দোলনের টুঁটি টিপে মারতে চেয়েছে। এখনও মনে পড়ে, বাঁকুড়া সার্কিট-হাউসের ১ নম্বর ঘরটায় আমায় কখনও থাকতে দেওয়া হয়নি। ফাঁকা থাকলেও। এখন জেলা সফরে গেলে পারতপক্ষে আমি ওই ঘরটায় থাকি না।

সিপিএম এখনও প্রতিদিন অশান্তি ছড়াতে চাইছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। কিন্তু শান্তি প্রক্রিয়া চলবেই। শান্তি-উন্নয়ন-প্রগতি হল জীবনের মূল স্রোতের ধারা। যাঁরা বাইরে বসে নানা মন্তব্য করেন, তাঁদের সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক থাকে না। যাঁরা মানুষের সঙ্গে মেশেন, তাঁরাই বোঝেন মানুষ কী চান। মুষ্টিমেয় জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কী বললেন, তাঁদের মুখের কথা কী আর কী-ই বা মুখোশের কথা—কেউ জানে না। তার সঙ্গে জনস্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকে নানা সংগঠন, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা ট্রাস্ট তৈরি করে নানা কাণ্ড করেন। সমাজের বেদনার কথা উপর উপর বলে দেখানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা মানুষের পাশে রয়েছেন। কিন্তু আসলে তাঁরা আসেন নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। মানুষকে ব্যবহার করতে। এই ধরনের মানুষদের থেকে আমি একটু দূরে থাকতে চাই।

তবে এমন অনেক সংগঠন আছে, যারা সত্যিই মানুষের স্বার্থে কাজ করে।

রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে শুরু করে খ্রিস্টান, মুসলিম বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক সংগঠন আছে, যারা নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে মানুষের জন্য কাজ করে। তাঁদের আমি স্যালুট করি। কিন্তু যাঁরা মুখে এক, মনে অন্য, তাঁদের আমি পছন্দ করি না। তাঁদের কাজকর্ম দুর্ভাগ্যজনক। তাঁদের জন্য আমার দুঃখ হয়। করুণা হয়।

বাংলার বুকে দীর্ঘ ৩৪ বছর অপশাসন চলেছে। গোটা রাজ্য অবহেলার শিকার। আইন ছিল না। বিচার নেই। পুলিশ এবং উন্মত্ত হার্মাদরা বছর বছর ভোট লুঠ করে ক্ষমতায় থেকেছে। সম্পত্তি লুঠ করেছে। লুঠ করেছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। আজ যাঁরা হঠাৎ বিবেকের ভূমিকায় মুখোশ পরে বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরা সেই বছরগুলোয় কোথায় ছিলেন? তাঁরা যে তখন ছিলেন না, সে জন্য আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁরা এখন এমন হাবভাব করছেন, যেন তাঁরাই পরিবর্তনের ধারক-বাহক। তাঁদের জন্য কিছু কথা মাঝেমধ্যে বলতে ইচ্ছে করে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতাই বড় বড় ঘটনা। স্পর্শকাতর বিষয়। কেউ কেউ বলতে চাইছেন, এই তিনটি ঘটনার উপর ভিত্তি করেই রাজ্যে পরিবর্তন চলে এসেছে! নিশ্চয়ই কেউ কেউ এই বিষয়গুলিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। তাঁরা দু-একটি মিটিং-মিছিলও করেছেন। আমি তাঁদের সম্মান করি। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার মানব কী করে? দু-তিনটে ইস্যুতে কয়েকটা মিছিল করেই কেউ কেউ ভাবছেন, তাতেই পরিবর্তন এসে গেল রাজ্যে!

ভুল। নিশ্চয়ই ওই তিনটি বিষয়ে আন্দোলন সঠিক। কিন্তু আমি বলতে চাই, পরিবর্তন এসেছে দীর্ঘসময়ের ধারাবাহিক আন্দোলনে। যেদিন আমি বা আমরা থাকব না, সেদিন পশ্চিমবঙ্গের এই আন্দোলন নিয়ে হয়তো গবেষণা হবে।

পৃথিবীর ইতিহাস দেখুন। একটা-দুটো ছোট আন্দোলন করেও অনেকে নোবেল পেয়ে গিয়েছেন। কারণ তাঁদের 'লবি' ছিল। বাংলার মা-মাটি-মানুষের আন্দোলন উপেক্ষিত। কমিউনিস্ট শক্তি তার স্বৈরাচারী চেহারা নিয়ে বিশ্বের বুকে যেখানেই জনবিরোধী ভূমিকায় পৌঁছেছে, সেখানেই তারা ধ্বংস হয়েছে। ব্যতিক্রম ছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। এখান থেকে সিপিএম বিদায় নেবে, কেউ কোনোদিন ভাবতে পারেনি। কিন্তু তিন দশকের ধারাবাহিক আন্দোলন, কারও

সাহায্য ছাড়াই সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে-যাওয়া এবং বহুকষ্টে সেই ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনের ভিত তৈরি করা হয়েছিল। তাই এ নিয়ে কোনো অসাধু উদ্দেশ্যে কোনো প্রচার হলে আমি দুঃখ পাই।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকায় ক্ষমতায় এসেছিল। প্রথম কয়েকবছর নিশ্চয়ই তারা ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই তো সন্ত্রাস, দলবাজি, দুর্নীতি। ধর্মতলায় গুলিতে চারজন খুন, আনন্দমার্গীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা—সিপিএমের হাত বহু মানুষের রক্তে লাল। মরিচঝাঁপির কথা ভুলে যাব? তখন ছোট ছিলাম। কিন্তু মনে আছে এখনো।

ছাত্রজীবন থেকেই সিপিএমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিলাম। তখন আমাদের বয়স কম। সমাজে তো বয়সে বড় অনেকেই ছিলেন। তখন কেন তাঁরা প্রতিবাদী হয়ে নামেননি? সন্ত্রাসের ভয়ঙ্কর দিনগুলো দেখে বইয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতাম। সিপিএমের ধারাবাহিক অসভ্যতা-বর্বরতা আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কেউ তো এগিয়ে আসেননি! পরপর সন্ত্রাস। কোচবিহারে ছাত্র খুন, শান্তিপুরে কৃষক খুন, হাওড়া ব্রিজে শিক্ষিকা খুন, দার্জিলিং চা-বাগানে গরিব মানুষ খুন, করন্দায় পিছিয়ে-পড়া দরিদ্রতম মানুষকে খুন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়ায় মানুষের হাত-পা বেঁধে গলায় জ্যান্ত কইমাছ ঢুকিয়ে পাশবিক অত্যাচার করে খুন, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অপরাধে হাওড়ার আমতায় কান্দুয়াতে কব্জি থেকে হাত কেটে নেওয়া, বানতলায় নৃশংস নারী নির্যাতন—পর পর ঘটনায় অপরাধের মহাভারত তৈরি হয়েছে সিপিএম আমলে। আমরা তার বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছি। নিজেদের জীবন দিয়েছি। জীবনের ২০-৩০ বছর রাস্তাতেই কাটিয়ে দিয়েছি। সেদিন তো কাউকে পাশে দেখিনি বন্ধু। লড়াইয়ে কাউকে দেখিনি। শেষ আড়াই-তিন বছরে দু-তিনটে মিছিল করে পরিবর্তন নিয়ে এত কথা?

পরিবর্তন অনেক আগেই হতো। ২০০১-এ হতো। ২০০৬-এ হতো। মানুষ চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে হাত করে সিপিএম নির্বাচনী মেশিনারিতে প্রভাব বিস্তার করে, পরিকাঠামো দখল করে ক্ষমতায় টিকে গিয়েছিল। এটা কিন্তু আজ বলছি না। অনেক আগে আমার একটা বইতে লিখেও রেখেছি। ছাপার অক্ষরে। যাঁরা পড়েননি, পড়ে দেখে নেবেন। তখন মানুষ সরব হতে ভয় পেতেন। কেশপুর-গড়বেতায় রক্তের হোলি খেলত

সিপিএম। মানুষ সন্ত্রস্ত থাকতেন। সিপিএমের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস ছিল না তাঁদের। তাঁরা ভাবতেই পারতেন না, সিপিএম কখনো হারতে পারে। তাই আজ যাঁরা অনেক কথা বলছেন, তখন তাঁরা মুখ লুকিয়ে বসে থাকতেন। আমাদের সহকর্মীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে যখন মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, তখন কেউ কেউ সামনে এসে দু-একটি মিছিলে গেলেন।

বন্ধু মনে রাখবেন, বেলপাহাড়িতে আমি গিয়েছিলাম নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। সারা বাংলায় ২১ হাজার কিলোমিটার ঘুরেছি। একটা ভাঙা জিপ ছিল সম্বল। জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রামে ঢুকেছি হয় পায়ে হেঁটে কিংবা কোনো সহকর্মীর মোটরসাইকেলে চেপে। দেখেছি মানুষের অসহনীয় যন্ত্রণা। তখনই লিখেছি, সরকার ব্যবস্থা নিক। নইলে পরিস্থিতি জটিল হবে। এখন যাঁরা বড় বড় কথা বলেন, তাঁরা কোথায় ছিলেন সেদিন? পারবেন আমাদের জীবনের সেই দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে? মার খেয়ে খেয়ে আমার গোটা শরীর ক্ষতবিক্ষত। দিন থেকে রাত মানুষের জন্য নিবেদিত। মানুষের পাশে ছিলাম-আছি-থাকব। যাঁদের কখনো দেখিনি দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের স্বার্থে সরব হতে, তাঁরা অপপ্রচার করলে সেটা শুনতে হবে? মানুষই আমার ভরসা। মানুষই আমার শক্তি। তাঁরাই আমাকে পাঠিয়েছেন মানুষের দরবারে মানুষের কথা বলতে।

যাঁরা কুৎসা করছেন, তাঁদের বলি, কু-কথা বলছেন বলুন। কিন্তু রাজ্যে ৩৪ বছর পর একটা নতুন সরকার এসেছে। এর মধ্যেই এত সমালোচনা? এত কম ধৈর্য আপনাদের? সিপিএমের অপশাসনে রাজ্যের ভাণ্ডার শূন্য। তার মধ্যেই রাজ্যের গরিব মানুষকে দু-টাকা কিলো দরে চাল, জঙ্গলমহলের মানুষকে বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, সিঙ্গুরের জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আইন, নন্দীগ্রামে রেল-সহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন, সারা বাংলায় ঢালাও কর্মযজ্ঞের দিশা দেখাচ্ছে এই সরকার। বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে যা করতে পারেনি, তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ প্রথম ছ-মাস করেছে আমাদের সরকার।

মানুষকে তো আমরা স্বচ্ছভাবে জানাচ্ছি, কী ভাবে দিন-রাত খেটে কাজ করছি। চেষ্টা করছি। কাজ হচ্ছে। মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। আমরা বাংলার মানুষকে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি।

যে সেট-আপ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, সেটা তো সিপিএমেরই তৈরি করা! বাধা আসছে। সে সব কাটিয়েই এগোতে হচ্ছে।

এই সময় নতুন বাংলা গড়ার প্রশ্নে কোথায় সকলের সহযোগিতা পাব, তা নয়, সিপিএম এবং তাদের বন্ধুরা নানা চক্রান্ত শুরু করে দিয়েছে।

মাওবাদ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কারও আদর্শ আলাদা হতেই পারে। সেখানে অসম্মানেরও প্রশ্ন নেই। কিন্তু উগ্রপন্থা-খুন-সুপারি কিলার দিয়ে পর পর হত্যা আমি কিছুতেই মানব না।

যাঁরা বন্ধুর বেশে এসে পিছন থেকে ছুরি মারেন, সিপিএমের হাত শক্ত করেন, তাঁদের কী বলব? আপাতত বন্ধুই বলছি। তবে এত দ্রুত এই বন্ধুদের চিনতে পারার জন্য ঈশ্বর-আল্লাকে ধন্যবাদ। তাঁদের আশীর্বাদ আছে বলেই চিনতে পারছি এই বন্ধুদের।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন বন্ধু?

যে সারাজীবন শুধু দিতেই চেয়েছে। বিনিময়ে কিছু পেতে চায়নি, তার বিরুদ্ধে? কাজ করি। বিনিময়ে কিছু চাই না। যা পেয়েছি, অনেক। মানুষের ভালোবাসা-আশীর্বাদ-শুভেচ্ছা পেয়েছি। আমি তাতেই সন্তুষ্ট। মানুষের জন্যই কাজ করে যেতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে কে নিজের স্বার্থে আমার প্রশংসা করল বা কুৎসা করল, তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করতে চাই না। যে ক-টা দিন থাকব, কাজটাই করে যাব। বাংলার জন্য। দেশের জন্য। যাঁরা পারবেন, সহযোগিতা করবেন। যাঁরা মানুষের স্বার্থের বিরোধিতা করে আমার কাজ আটকাতে চাইবেন, তাঁরা চেষ্টা করে দেখুন, পারবেন না। নদীর স্রোতকে কি ঠেকানো যায়? সেই কথাটা আছে না?

‘হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো, ঠেকাতে পারে কি কেউ?
চক্রান্ত করে রোখা যায় না উন্নয়ন আর শান্তির ঢেউ।’

আমাদের প্রিয় রাজ্যকে নতুন করে গড়ার জন্য মানুষ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন। আশীর্বাদ করেছেন। মানুষের সেই ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে আমরা কাজ করছি। বাংলার পুনরুজ্জীবনে দলমত নির্বিশেষে সকলের সাহায্য চাই। সকলে আসুন। কিন্তু যাঁরা চক্রান্ত করছেন, জেনে রাখুন, উন্নয়নের ঝড়কে ঠেকাতে পারবেন না। মা-মাটি-মানুষের শুভেচ্ছা আর শক্তি সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি। অপপ্রচার-কুৎসা কেন? সিপিএমের দালালি কেন? কেন জনগণের সঙ্গে

শত্রুতা? প্রকাশ্যেই হোক বা ছদ্মবেশে, ক্ষমতা থাকলে কাজ আটকানোর চেষ্টা করে দেখুন। মানুষ বিচার করবেন। যা করছি, যা ভাবছি, যেভাবে করছি, মানুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে, মানুষের জন্য, মানুষকে জানিয়ে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। মানুষ সব দেখছেন। বিচার তাঁরাই করবেন।

সকলকে সম্মান জানিয়েই কিছু কথা বলতে চাই। আমার লড়াইয়ের জীবন। লড়াইয়ের মধ্যেই থাকতে ভালোবাসি। সংগ্রামী জীবন নিজেও সংগ্রামকে আহ্বান করে। মানুষের অন্তর থেকে জন্ম নেয় আত্মনিবেদিত প্রাণ। হৃদয়টাকে খুলে রাখতে হয়। অর্ধেক ঢেকে রাখলে হৃদয় প্রস্ফুটিত হয় না। আমরা আমাদের হৃদয় খোলা রাখি। খোলামনে সকলকে ভালোবাসি। খোলা প্রকৃতি মায়ের আঁচল থেকে তার স্বাদ নিতে ভালোবাসি। আর মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ আর দোয়া নিয়ে পথ চলি।

এ পথ লড়াইয়ের পথ। উন্নয়নের পথ। শান্তির পথ। প্রগতির পথ। সংহতির পথ।

পাহাড়ে শান্তি এসেছে। গত ৩৪ বছরে যা হয়নি। পর্যটকরা হাসিমুখে পাহাড়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ের মানুষ দোকানবাজার খুলে অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ পাচ্ছেন।

পাহাড় হাসছে। তরাই-ডুয়ার্স হাসছে। জঙ্গলমহলেও শান্তির প্রক্রিয়া চলছে। সাড়ে তিন দশকের অন্ধকার যুগ পার হয়ে বাংলার মুখে হাসি। বাংলার এই জাগরণে সকলে শামিল হোন। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কখনো কখনো খুব ছোট্ট ছোট ঘটনা, কখনো বা বড় ঘটনার মধ্যে দিয়েই আমাদের টানা পথ চলতে হয়েছে।

পথ চলতে চলতেই দেখা হবে বন্ধু। আমি সেই পথেরই পথিক।

২

কলেজ জীবন ও রাজনীতি

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অসীম। চলমান জীবন যখন পথ চলতে-চলতে ঠিক-বেঠিক, সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারিতে থমকে দাঁড়ায়, তখন অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ফেলে-আসা জীবনের দিনগুলির উপর দাঁড়িয়ে আত্মসমীক্ষার আলোই ভবিষ্যতের সঠিক পথ চিনতে সাহায্য করে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বহু দুর্গম পথ পেরিয়ে জীবনের যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, তাতে লাভ-লোকসানের খতিয়ানের পাশাপাশিই রয়েছে নানা ভুলভ্রান্তি। অনেক কিছু করতে চেয়েও করতে না-পারার বেদনা। তবু গর্ব হয় এটা ভেবে যে, ক্লান্তিহীন এই চলার পথে ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষের অফুরান ভালোবাসায় আমি আপ্লুত হয়েছি। তাঁরাই বিশ্বাস যুগিয়েছেন প্রতিপদে।

আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছেও, যাঁরা প্রতিনিয়ত শত্রুতা করে, পদে পদে আঘাত দিয়ে আমার নতুন করে ভাবার অবকাশ দিয়েছেন। বাস্তবের রুক্ষ কঠোর জমিতে দাঁড়িয়ে দুনিয়া চিনতে সাহায্য করেছেন।

আমার অনেক সমালোচকই বলেন, 'মমতা বড্ড আবেগে চলে'। এবং সেটাই নাকি আমার জীবনের সবচেয়ে 'বড় ভুল'।

আমি তাঁদের সমালোচনার প্রথমাংশের সঙ্গে একমত।

আমার জীবনের প্রতিটি মাইলস্টোনে আবেগের ছোঁয়া। ঠিকই। আবেগের উৎস হৃদয়ের উপলব্ধি এবং অনুভূতি থেকে। যে উপলব্ধি সমস্ত সৃষ্টির মূলকথা, যে অনুভূতি মানুষকে জাতি-রাষ্ট্র-সমাজ-মানবতার কল্যাণে অনবরত উদ্বুদ্ধ করে, সে-ই তো আবেগ। আবেগ অর্থ দিয়ে ক্রয়যোগ্য নয়। জোর করেও

আনা যায় না। কারও সত্যি হৃদয় না-থাকলে, অন্যের কষ্ট উপলব্ধির ক্ষমতা না-থাকলে তাঁর আবেগ আসবে না। সে তিনি যতই অর্থ, সামাজিক প্রতিপত্তি বা রাজনীতিতে ক্ষমতাবান হোন না কেন। আবেগ কোথাও ভুল করতে পারে। কোথাও ঠিক। কাউকে হারাতে পারে। কাউকে জেতাতে। কিন্তু অন্তরের আবেগ মানুষের বিবেককে উদ্ভাসিত করে। বিবেককে দংশন করে সত্যের অমল আলোয় আলোকিত করে পথচলার পাথেয় জোগায়।

ছোটবেলায় ভাবিনি এই বৃহৎ রাজনীতির গণ্ডিতে কখনো প্রবেশ করব। সংসদে যাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা পাব বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হব। ভাবিনি, মানুষের ভালোবাসাকে সম্বল করে কলকাতার ব্রিগেডে ঐতিহাসিক জনসভা করতে পারব। রাজনীতির ঘূর্ণায়মান আবর্তের অমোঘ বিধানই হয়তো আমায় এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কৃত্রিম আবেগের ওপর ভর করে রাজনীতি করাকে আমি ঘৃণা করি। তাই অনেক সময় আদর্শের সংঘাত ঘটে যায়।

আমার স্বর্গীয় পিতা যে আদর্শের বীজ আমার অন্তরে রোপণ করেছিলেন, মানবিকতার স্বরূপ যে ভাবে আমার সামনে উন্মোচিত করেছিলেন, তা আজও আমায় অনুপ্রেরণা জোগায়। মনে হয়, 'সংসারে যারা শুধু দিলে। পেলে না কিছুই। যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না, সমস্ত থেকেও কেন কিছুতেই তাদের কোনো অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের অন্যায়ের নালিশ জানাতে'। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তিই আমার, আমাদের লড়াইয়ের অনেকটা সম্বল।

সব মানুষেরই জীবনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। আমরাও একটা লক্ষ্য ছিল—মানবিকতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন কিছু করে দেখানোর।

ছোটবেলা থেকেই আমি একটু অন্যরকম ছিলাম। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বাইরের জগৎ সম্পর্কে অন্যান্য বন্ধু বিভিন্ন আলোচনা করত। আমি চুপচাপ ক্লাসের এককোণে বসে ভাবতাম। ক্লাস টেনে উঠে বন্ধুরা আলোচনা করত, স্কুল ফাইনাল পাস করে কে কোন কলেজে ভর্তি হবে, কেমন সাজগোজ করবে। আমি অপলকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার সেসব কিছু মনে হতো না। ছোট ছোট ভাইবোনেদের চিন্তা নিয়ে স্কুলে যেতাম। মা অসুস্থ থাকায়

ভোর তিনটে-সাড়ে তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সকলের জন্য রান্না করে, ভাইবোনেদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করে নিজে স্কুলে যেতাম। স্কুল থেকে ফিরেই আবার বিকেলের রান্নার কাজে লেগে পড়তাম। স্বপ্ন দেখার সময়ই ছিল না!

কলেজ জীবনেই আমার সক্রিয় রাজনীতিতে হাতেখড়ি।

বাবা আচমকাই মারা গেলেন। শুধু ঈশ্বর জানেন সে সব দিনের কথা। শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম। তার মধ্যেই যেদিন সক্রিয় রাজনীতির আঙিনায় পা রাখলাম, কী উন্মাদনা! কাজ করার অফুরান মানসিকতা। আদর্শের টান। রোজ ভোরবেলায় কলেজে যেতাম। কত ছাত্রীকে যে পড়াশোনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছি! তাদের সংখ্যা আমি নিজেও বলতে পারব না।

আমাদের কলেজে ডিএসও-র ইউনিয়ন ছিল। আমি সেখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করলাম ছাত্র পরিষদের। ডিএসও-র বিরুদ্ধে পদে পদে লড়তে গিয়ে বামপন্থী সংগ্রামের হাতিয়ারগুলোর দখল নিয়েছিলাম। তাই ডিএসও-র মতো অত শক্তিশালী ইউনিয়নও আমাদের পাল্লা টানতে পারেনি। কলেজে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্রীবন্ধু এমনকী, অশিক্ষক কর্মচারীদেরও অফুরান ভালোবাসা পেয়েছিলাম। এমনও দিন গিয়েছে যে, আমি সাধারণ ছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আমি ক্লাসে যেতে পারছি না। আর শ্রদ্ধেয়া এবং জনপ্রিয় অধ্যাপিকা অন্য ছাত্রীদের বলছেন, "যাও, মমতাকে ডেকে নিয়ে এসো। না হলে ক্লাস নেব না।"

কলেজ জীবনের পাঁচটা বছর এক দুর্দান্ত সংগ্রামের কাহিনি। সে সব আমি কখনো ভুলতে পারব না। একটা ছোট, সদ্য রোপণ-করা চারাগাছকে জল-আলো-বাতাস দিয়ে পত্রপুষ্পে বিকশিত করার আপ্রাণ প্রয়াস।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল। তখন অনেকেই আমায় চাকরির 'অফার' দিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি আমি করিনি। তা হলে রাজনীতির জন্য সময় দেওয়া যেত না। তখন কিন্তু আমরা কোনো রাজনৈতিক নেতার বাড়ি যেতাম না বা কারও থেকে সাহায্যও নিতাম না। কিন্তু কলেজে ডিএসও-র বিরুদ্ধে লড়াইটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার নামটার সঙ্গে প্রায় সমস্ত নেতাই পরিচিত ছিলেন।

১৯৭৭ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন হল। হেরে গেলেন ইন্দিরা গান্ধী।

দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্র থেকে হেরে গেলেন প্রিয়'দা। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু তখনো বহির্জগতের রাজনীতি ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ-তে ভর্তি হলাম। তখন রাজ্যে সিপিএম-জমানা শুরু হয়ে গিয়েছে। একটা বছর ক্লাস করতে পারিনি। পরের বছর ক্লাস করে পরীক্ষা দিলাম। পাস করলাম। তার মধ্যেই চারদিকে ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে আন্দোলন। আমিও আমার রাজনৈতিক সঙ্গীসাথীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সেই আন্দোলনে। ইন্দিরাজি'কে গ্রেফতার করা হল। আমরা গ্রেফতার হলাম। আমি তখন শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের বিএড-এর ছাত্রী। এমনও দিন গিয়েছে যে, আন্দোলনে গিয়েছি সঙ্গে পাঠ্যবই নিয়ে। তখন তো আন্দোলন মানেই গ্রেফতার। অথচ পরদিনই বিএড পরীক্ষা। লক-আপে বসেই বইয়ের পাতা উল্টেছি। সন্ধেবেলায় পুলিশ লক-আপ থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর পরদিন গিয়ে পরীক্ষায় বসতাম। তার পরদিন আবার আন্দোলন!

সেই ভাবেই এমএ, বিএড, এলএলবি করলাম। বিশেষ প্রশিক্ষণ নিলাম ওয়ার্ক এডুকেশনে।

পাশাপাশিই চলতে লাগল প্রতিবাদ। অন্যায় যেখানে। প্রতিবাদ সেখানে।

তখন জনতা সরকারের আমল। নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে ইন্দিরা'জিকে। লাঞ্ছনা করা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য। পরে লোকসভার সাংসদ হওয়ার পর রাজ্যসভার সাংসদ সরোজ খাপার্দের কাছে শুনেছিলাম, তখন ইন্দিরাজি'কে ট্রেনে চড়ার রিজার্ভেশন পর্যন্ত দেওয়া হতো না! ভাবুন, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে রেলে চড়ার সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে না! খাপার্দে ইন্দিরাজি'র সঙ্গী হয়ে তখন বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। ইন্দিরাজি'র উপর লাঞ্ছনা, হেনস্থার প্রতিবাদে তখন রোজ মিটিং-মিছিল-বিক্ষোভ।

তখনই কলকাতায় আসছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। আমরা দ্রুত ঠিক করলাম, প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে হবে। সুব্রত'দা, সুব্রত মুখোপাধ্যায় কালো পতাকা দেখানোর কর্মসূচি নিলেন। আমাদের কাছে নির্দেশ ছিল, প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি দেখতে পাওয়া গেলেই রাস্তায় কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কনভয় যাতে বিনা-সমস্যায় বেরিয়ে যায়, সে জন্য পুলিশ আমাদের উপর কড়া নজর রেখেছিল। আমি প্রদীপ'দাকে (অধুনা প্রদেশ কংগ্রেস

সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য) বলে রেখেছিলাম, "আমার দিকে একেবারে তাকাবেন না। ঠিক সময়ে আমি মোরারজি দেশাইয়ের গাড়ির সামনে কালো পতাকা দেখাব।"

পুলিশ ততদিনে আমার নামের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু চেহারাটা তো চিনত না! সেটাই ছিল আমার পক্ষে প্লাস পয়েন্ট। একেবারে শান্ত মেয়ের মতো এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। যাতে কেউ কোনো সন্দেহ না-করে। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আসতেই চারদিকে স্লোগান শুরু হল। আমি পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে একেবারে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতেই কালো পতাকা তুলে দিলাম।

ইন্দিরা'জি হেরে যাওয়ার পর আমাদের অনেককেই বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু ভয় পাইনি। সাহস নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে। কোথা থেকে অত সাহস পেতাম কে জানে! আমাদের পাড়ায় আমার ও আমার পরিবারের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধীদের লেলিয়ে দিয়েছিল সিপিএম। চোখের সামনে দেখতাম, তারা গরিব মানুষের থেকে জোর করে টাকা তুলত। প্রকাশ্যে অত্যাচার করত। প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের বাড়ির পাশের ছোট্ট লন্ড্রি থেকে গরম ইস্ত্রি নিয়ে এসে মানুষের গায়ে ছ্যাঁকা দিত!

কোনো সভ্য মানুষ এ জিনিস মানতে পারে?

একদিন জোরাল প্রতিবাদ করলাম। সাফ বললাম, ওইসব গুণ্ডামি ওখানে চলবে না। ওরা তখন আমার বাড়িতে বোমা মারল। বাড়ির লোকেরা কেউ বাইরে বেরোলেই তাদের প্রায় নিয়ম করে ছুরি-ভোজালির সামনে পড়তে হতো। রোজ থানায় ডায়েরি করা হত। কিন্তু বিচার করবে কে? তখন তো কেন্দ্র বা রাজ্য—কোথাওই কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই!

কিন্তু আমি তাতে দমে যাইনি। পাড়ায় একটা মহিলাবাহিনী গড়ে তুললাম। তাদের নিয়ে জোরদার আন্দোলন শুরু হল। শাসকদলের মদতে তখন ওই সমাজবিরোধীরা আমার এবং আমার পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে থানায় অভিযোগ করল, আমরাই নাকি সমাজবিরোধী। পুলিশ এল তদন্ত করতে। এসে কী বলল জানেন? "আরে। আপনাদের নামে এই অভিযোগ। ছি-ছি! কী লজ্জার ব্যাপার।" পুলিশি রিপোর্ট শেষপর্যন্ত আমাদের পক্ষেই গিয়েছিল। গুণ্ডারা অবশ্য তাতেও দমেনি। রাস্তায় গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছে। নেহাত এক বন্ধু ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আরও একদিন। দাদার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। ওর স্ত্রীর নাম চন্দনা। বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট। পাড়ারই মেয়ে। আমি ওকে নাম ধরেই ডাকতাম। দাদা চন্দনার সঙ্গে বেরিয়েছে কোথাও একটা যাওয়ার জন্য। পাড়ার অন্য ছেলেরা কোনো একটা নিমন্ত্রণ বাড়িতে গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে ওই গুণ্ডারা আমার দাদার উপর হামলা করে। বাড়িতে তখন আমি আর আমার ছোট বোন। হঠাৎ দেখলাম, চন্দনা কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে আসছে। ওর কাছ থেকেই ঘটনাটা শুনলাম। আমি বোনকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়লাম। এমনিতেই ছোটবেলা থেকে রোগে ভুগে-ভুগে আমার বোনের চেহারাটা বরাবরই খারাপ। ভাইবোনেদের কারও সঙ্গেই ওর চেহারার কোনো মিল নেই। কিন্তু ওর সাহস দুর্জয়। অনেকের চেয়ে বেশি। ও ছুটে গিয়ে একজনের কলার চেপে ধরল। আমি কোনোমতে দাদাকে ওদের হাত থেকে ছাড়িয়ে কয়েকজনকে সপাটে চড়-থাপ্পড় কষাই। পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। বীরপুঙ্গবরা তখন চম্পট দিয়েছিল।

ওইভাবে একটার পর একটা ঘটনার মোকাবিলা করতে করতে ওই দুষ্কৃতীরা নিজেরাই বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কেউ খুন হয়ে যায় দলীয় ঝগড়ায়। কয়েকজন ভালো পথে আসারও চেষ্টা করেছিল। আমরা তাদের সেই সুযোগও করে দিয়েছিলাম। কয়েকজনকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল ছোটখাট চাকরির। তারা এখন শান্তিতেই পারিবারিক জীবন যাপন করছে।

আসলে ভালোবাসা দিয়ে, মানবিকতা দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে সমাজবিরোধীকে বুঝিয়ে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনলে সে-ও ভালো হতে পারে। কেউ তো আর সমাজবিরোধী হয়ে জন্মায় না। কিন্তু এক শ্রেণির ক্ষমতাবান মানুষ তাদের নিজের স্বার্থে বিপথে চালিত করে।

এমন যে কত ঘটনা ঘটেছে!

আশুতোষ কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন। কলেজের গেটের বাইরে আমাদের গেট-মিটিং চলছে। তখন টানা ঘণ্টাদুয়েক স্লোগান দিতে পারতাম। সেদিন স্লোগান দিতে দিতে গলা শুকিয়ে কাঠ। সহকর্মী অশোকা মণ্ডল এসে বলল, "দিদি চলো, আমরা একটু জল খেয়ে আসি।" কলেজের পিছনে দরজা দিয়ে জল খেতে গিয়েছি। দেখি সিপিএমের এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী (এখন অবশ্য ভদ্র) কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে আমাদের দুই সহকর্মী মলয়

আর অরূপকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কী করি! কাউকে ডাকারও সময় নেই। আমি আর অশোকাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম। হয়তো ঈশ্বর সাহস জুগিয়েছিলেন। আমি গিয়ে সেই কুখ্যাত সমাজবিরোধীর কলার চেপে ধরলাম। আর অশোকা আগুপিছু না-ভেবে ওকে মারতে শুরু করে দিল! ঘটনাটার জন্য ওরা আদৌ তৈরি ছিল না। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেল। কলেজের গেটে পুলিশ ছিল। তারাও এসে পড়ল।

ছেলেদুটোর জীবন বাঁচল। কিন্তু সিপিএম তারপর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। হাজরা রোডে তখন ভয়াবহ তাণ্ডব। আমার পিছনে দৌড়চ্ছে সশস্ত্র সিপিএম ক্যাডাররা। কীভাবে যে সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম, আজও ভুলিনি। ভবানীপুর থানার উল্টোদিকে শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশে স্যাঙ্গুভ্যালি বলে একটা রেস্তোরাঁ ছিল। সেখানে কয়েকজন ছেলে বসেছিল। পরিস্থিতি দেখে তারাই কোলাপসিব্‌ল গেট খুলে আমায় ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। শুধু ওদের জন্য সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম। না হলে সম্ভবত সেদিনই সিপিএম আমায় মেরে ফেলত।

তারপর আবার রোজ আন্দোলন। রোজ গ্রেফতার। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে অন্তত ৩৩০ দিনই কোনো না কোনো আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছি।

ইন্দিরাজি'কে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সুব্রত'দা রাইটার্স অভিযানের ডাক দিলেন। আমরা সকলে হাজির। সঙ্গে আমার মহিলাবাহিনী। সিপিএম তখন সবে ক্ষমতায় এসেছে। আমাদের কর্মসূচিকে চ্যালেঞ্জ করে ওরাও জমায়েত করল। চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে সাঁড়াশি অভিযানের মতো করে ওরা আমাদের উপর হামলা চালাল। পার্ক স্ট্রিটের একটা সরকারি অফিসে ঢুকিয়ে আমাদের অনেক সহকর্মীর উপর ক্ষুর চালাল। রক্তাক্ত, আহত অবস্থায় যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। এমনকী, অনেক নেতাও। আর পুলিশের তো কাজই ছিল নেতাদের সরিয়ে নিয়ে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের পেটানো। মেয়েরাও আহত অবস্থায় ছটফট করছে। তখনই এক নেতাকে দেখলাম, পাবলিক বাসে উঠে পালাচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "পালাচ্ছেন কেন?"

নেতা জবাব দিলেন, "চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা।"

আরও এক নেতাকেও একইভাবে পালাতে দেখলাম। তাঁকে প্রশ্ন করায়

তিনি বললেন, "আমি মালদহে চললাম। জরুরি সভা আছে।"

আমরা কয়েকটা মেয়ে শুধু রাস্তায়। কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সিপিএমের কমরেডরা হুংকার দিল, "কংগ্রেসের পতাকা গুটিয়ে ফেলো।" আমরা বললাম, "না! এই তেরঙা পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরব। ক্ষমতা থাকলে মেরে ফেলো। কিন্তু আমরা আমাদের জায়গা থেকে নড়ছি না।"

তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অশোক সেন। আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ধর্মতলা এলাকায় বিক্ষোভ হবে। পুলিশের গুলিতে তিনটে ছেলে মারা গেল। চারদিকে পুলিশি তাণ্ডব চলছে। শ'খানেক সহকর্মীকে নিয়ে আমি তার মধ্যে পড়ে গিয়েছি। বেপরোয়া পুলিশ তখন যাকে পারছে, তাকে মারছে। কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে। পড়িমড়ি করে সকলকে নিয়ে ঢুকলাম ময়দানের ভবানীপুর টেন্টে। অনেকে ভয়ে কান্নাকাটি করছে।

ভাবছি, পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে বেরোব। বাইরে তো রণক্ষেত্র। এমন সময় পুলিশ এসে ঢুকল ভবানীপুর টেন্টে। প্রথমেই আমার ভাই অমিত আর সুব্রত বক্সীকে ওরা মারতে মারতে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। পুলিশের চোখেমুখে তখন যেন প্রতিহিংসার আগুন। ওদের দু'জনকে টেন্ট থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো মেরেই ফেলত। কিন্তু আমরা মেয়েরা মিলে পুলিশদের ঘিরে ধরলাম। সাফ বললাম, "আমাদের ধরছেন কেন? আমরা তো বেড়াতে বেরিয়ে এই গোলমালে আটকে পড়েছি। দেখছেন না, ছেলে-মেয়ে সংখ্যায় সমান-সমান।" পুলিশ যুক্তিটাও মেনেও নিল। তারপর জোড়ায় জোড়ায় আমরা টেন্ট থেকে বেরোলাম।

এই তো রাজনীতির জীবন! পদে পদে ভয় আর আশঙ্কা। তাতে অবশ্য আগ্রহ আর উন্মাদনাটা আরও বেড়েই গিয়েছিল।

১৯৭৯ সাল। আমাদের আন্দোলন তখন তুঙ্গে। হঠাৎ একদিন খবর এল, ইন্দিরাজি'কে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিকেলেই টালিগঞ্জের বাঙুর হাসপাতালের গায়ে পুরোনো দূরদর্শন কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হল। স্বভাবতই কংগ্রেসকর্মীরা প্রচণ্ড উত্তেজিত। সভা চলাকালীন রাস্তা অবরোধ হয়ে গেল। পুলিশ লাঠি চালাতে শুরু করল। অনিবার্যভাবেই পুলিশের সঙ্গে কংগ্রেসকর্মীদের সংঘর্ষ বাধল। পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যাপক মারধর করে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পরেই পুলিশ আরও খেপে গেল। আমরা

হাসপাতালের চত্বরে গিয়ে ঢুকলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মেন গেট বন্ধ করে দিলেন।

বাইরে তখন উত্তেজনা চরমে। পুলিশ তখন এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেছে। আমি মেয়েদের নিয়ে ধাক্কা দিয়ে হাসপাতালের গেট খুলে সহকর্মী ও পথচারীদের জায়গা করে দিয়েছিলাম পুলিশের গুলি থেকে বাঁচার জন্য। বাইরে তখন গুলিবৃষ্টি থেকে বাঁচতে অনেক কংগ্রেসকর্মী দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

পরদিন কংগ্রেসের ডাকে বাংলা বন্‌ধ। তখন বরকত'দা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। সুব্রত'দা সাধারণ সম্পাদক। সকাল ৮টা নাগাদ তিন মহিলা সহকর্মীকে নিয়ে সুব্রতদা'র বাড়িতে গেলাম। তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন। ওঁকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, "আজ না কংগ্রেসের ডাকে বাংলা বন্‌ধ? অথচ ট্রাম-বাস সবই চলছে? চলুন, মিছিল করি।"

সুব্রত'দা বললেন, "তোরা চার। আমি এক—পাঁচ। কী করে মিছিল হবে?"

আমি বললাম, "চলুন না। আমরা তো আছি।"

গড়িয়াহাট থেকে মিছিল শুরু হল। সুব্রত'দা আমাদের সামনে হাঁটতে শুরু করলেন। পিছনে আমি এবং আমার তিন সহকর্মী। যারা, প্রকৃত অর্থেই, বিচ্ছু। ওরা ওদের কায়দায় বন্‌ধ করতে করতে চলেছে। মিছিল শুরু হয়েছিল পাঁচজনকে নিয়ে। যখন শেষ হল, তখন প্রায় ৫০০ মানুষ। সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সুব্রতদা'কে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে এলাম। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর এল, গোলমাল বাধানোর অভিযোগে সুব্রতদা'কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এটা অনস্বীকার্য যে, ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত ছাত্র পরিষদ তথা সুব্রতদা'র নেতৃত্বে একটার পর একটা আন্দোলন হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জয়ন্ত'দা (ভট্টাচার্য), অশোকদা (দেব), প্রদীপ'দা, সুশোভন'দা (বসু), বক্সী'দা (সুব্রত বক্সী), বাণী (সিংহরায়), বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক), তমা (তমোনাশ ঘোষ) সকলেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। কিন্তু তারপর থেকেই কেন জানি না, ওই আন্দোলন চোরাবালিতে মুখ লুকোল। কেন জানেন? কংগ্রেস রাজনীতিতে কেউ একটু বেশি সক্রিয় হলেই শক্তহাতে তার রাশ টেনে ধরে উপরতলা।

সম্ভবত সে জন্যই তখন একবার সুব্রতদা'কেও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে বাদ পড়তে হয়েছিল।

চুপচাপ, শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে বসে থাকলে খুব ভালো। ভাষণ দাও। নেতৃত্বকে রিপোর্ট পাঠাও। টাকা রোজগার করো, তার কিছু ভাগ দাও—রাজনৈতিক কর্মসূচি বলতে এটাই।

এবং সেটাই বাস্তব।

এই 'বাস্তবে'র শিকার হন কিছু নেতা। উপরতলার আদেশকে 'বেদবাক্য' বলে মনে করেন তাঁরা। যেন স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশ। আজ মনে হয়, সুব্রতদা'র সংগ্রামী মনোভাবটাকেও মাঝখানে কেউ ওই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। যখন লোকে তাঁকে 'অন্য চেহারায়' দেখে সমালোচনা করত, তখন আমরা বাস্তবকে উপলব্ধি করতাম। সুব্রত'দা অনেক সময় আমার সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন। খারাপ লেগেছে। দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু কখনও পাল্টা কটূক্তি করিনি। কারণ, সমালোচনা তিনিই করতে পারেন, যাঁর করার অধিকার আছে। সুব্রত'দা আমাদের হাতে ধরে আন্দোলন করতে শিখিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অনেকের ধারণা, সুব্রতদা'র হাত ধরেই আমার রাজনীতিতে হাতেখড়ি। সেটা ঠিক নয়। ১৯৭০ সালে আমি সক্রিয় রাজনীতিতে এসেছিলাম। সেদিন যাঁরা আমায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন পার্থ রায়চৌধুরী, রণজিত ঘোষ এবং দিলীপ মজুমদার।

১৯৮০ সালে ক্ষমতায় ফিরলেন ইন্দিরা'জি। ১৯৮৩ সালে আমি চলে এলাম বৃহত্তর রাজনীতির জগতে। সে বছরই কলকাতায় বসেছিল এআইসিসি-র অধিবেশন। সুব্রত'দা ছিলেন অ্যাকোমোডেশন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান। প্রণব'দার (মুখোপাধ্যায়) অনুরোধে সুব্রতদা'কেই পুরো ভার নিতে হয়েছিল। যেহেতু আমরা সুব্রতদা'র 'টিম' করতাম, উনিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভিআইপি-দের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। প্রণব'দা আমায় নামে চিনতেন। কিন্তু তার আগে কোনোদিন কথা হয়নি। আমার কাজ দেখে প্রণব'দা খুব প্রশংসা করলেন।

রাজীব গান্ধী তখন এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক। আর কমলাপতি ত্রিপাঠী কার্যনির্বাহী সভাপতি। তখনই রাজীবজি'কে খুব কাছ থেকে দেখার

সুযোগ ঘটেছিল। প্রতিদিন ভোর ৬টায় বেরিয়ে পড়তেন। ফিরতেন রাত ১টায়। সবসময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন ভিনসেন্ট জর্জ। রাজীবজি'র জন্য কাউকেই কোনো অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়নি। কিন্তু সমস্যা হত বর্ষীয়ান ত্রিপাঠীজি'র ক্ষেত্রে। সুব্রত'দা আমায় বললেন, "শোন, উনি কিন্তু ব্রাহ্মণীর হাতে রান্না ছাড়া কিছু খাবেন না। আর সকালে কাজু-কিসমিস-পেস্তার ব্যবস্থা করে রাখিস।"

সহকারী অণিমা চট্টোপাধ্যায়কে বললাম, "রান্নার দায়িত্বটা তুমি নাও।" উনি সঙ্গে আরও দু'জনকে চাইলেন। আমি বললাম, "দাঁড়াও, বুড়োকে একটু জব্দ করি। এক কাজ করো। আমাদের দুই অ-ব্রাহ্মণ সহকর্মীকে দিয়ে রান্না করাও। আর তুমি পরিবেশন করে দাও। তাতে সাপও মরবে। লাঠিও ভাঙবে না।"

কাজটা হয়তো অন্যায়ই হয়েছিল। ত্রিপাঠীজি এখন আর বেঁচে নেই। তা হলে হয়তো আমায় 'তংখাইয়া' ঘোষণা করে বসতেন। শুনেছিলাম, ওঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না-করলে উনি নাকি কারও দিকে তাকিয়েও দেখেন না। মনে হত, এখনকার এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নততর যুগে এটা মানায়? ছোটবেলায় বাবা তো শিখিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নয়, মানুষের মতো করে মানুষকে দেখাই আসল মানসিকতা।

ছোটবেলায় কথা এখন খুব মনে পড়ে। বাবাকে দেখতাম, রিকশা-ভর্তি বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োচ্ছে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। বাড়ির জন্য একটা ব্যাগ। বাদবাকির কোনওটায় আম, কোনওটায় কমলালেবু, কোনওটায় জামরুল বা লজেন্স অথবা বিস্কুটের প্যাকেট। বাবা সেগুলো সব আমার হাতে দিয়ে বাচ্চাগুলোকে দেখিয়ে বলতেন, "সব ওদের মধ্যে ভাগ করে দাও।" আমিও মহানন্দে সেগুলো দিয়ে দিতাম। হয়তো কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারও সংসার চলছে না, কারও ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে বাকি পড়েছে—বাবা তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করতেন।

মা অনুযোগ করতেন, "এত যে বিলিয়ে দিচ্ছো, তোমার ছেলেমেয়েরাও তো বড় হচ্ছে। ভেবে দেখেছো, ওদের কী হবে?"

বাবা বলতেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। যার কেউ নেই, তার জন্য ভগবান আছেন।"

তখন থেকেই ভাবতাম, যদি সুযোগ আসে, তা হলে বাবার আদর্শকে সামনে রেখে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত, যাদের দেখার কেউ নেই তাদের পাশে দাঁড়াব।

বাবা জীবিত থাকাকালীন সংসারে অভাব কী বস্তু, তা বুঝিনি। বিল্ডিং মেটিরিয়ালের ব্যবসা করতেন বাবা। সচ্ছল ছিলেন। প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। জমি-বাড়ি-লরি সবই ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি ছিল সুনাম। এলাকার সকলে 'পণ্ডিতমশাই' বলে ডাকতেন। রোজ পুজো করতেন। গীতাপাঠ করতেন। সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। এতটাই যে, বন্ধুদের অভাব দেখে নিজের বাড়ি-লরি-জমি সবই তাদের দিয়ে দিয়েছিলেন।

আঘাতটা এল, যখন মাত্র ৪১ বছরে বাবা গ্যাসট্রিক আলসারে আক্রান্ত হলেন। সরকারি ঠিকাদার ছিলেন। সরকারের কাছে প্রচুর বকেয়া পাওনা ছিল। নিজে চিকিৎসার ব্যয় জোগাড় করার জন্য সেই টাকাটা পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন। যাদের প্রচুর উপকার করেছেন, সেই বন্ধুরাও বিপদের দিনে ছেড়ে গেল। প্রায় বিনা চিকিৎসায় ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পিজি হাসপাতালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন বাবা। দাদার বয়স তখন মাত্র ১৭। আমার ১৫। যে মানুষটা সারা জীবন অন্যের উপকার করে গেলেন, তিনি নিজের চিকিৎসা করার অর্থ জোগাড় করতে পারলেন না। সেই আফসোস আমি এবং আমার পরিবারের লোকজন সারাজীবন ধরেই বয়ে বেড়াব। অথচ কী আশ্চর্য। বাবার মৃত্যুর পরদিনই বাবার নামে একটা চেক আমাদের হাতে এল। ৬০ হাজার টাকার। মনে হয়েছিল, চেকটা দিয়ে কী করব? বাবাকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।

পরিবারে এতগুলো লোক। ছোটো ছোটো ভাইবোন। খুব অসহায় অবস্থা তখন আমাদের। ছোটো ভাইয়ের বয়স মাত্রই দুই। বাবার বন্ধুরাই চেষ্টা করেছিলেন, যাতে আমরা কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে চলে যাই। তখন পাড়ার সকলে এবং ব্লক কংগ্রেসের লোকজন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে মানসিক শক্তি জুগিয়েছিলেন।

রামপুরহাটে আমাদের দেশের বাড়িতে আমাদের প্রায় ১২ বিঘা মতো জমি ছিল। আমিই মা'কে জোর করে জমিটা বিক্রি করে টাকাটা দাদাকে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। যাতে দাদা ওই টাকায় বাবার ব্যবসাটা আবার শুরু করতে পারে। এখনও দাদার যে ব্যবসা, সেটা মায়ের সেই জমি বিক্রির টাকাতেই শুরু। অনেকেই তখন মা'কে বলেছিলেন, এক ছেলেকে সব টাকা দিয়ে দিচ্ছেন। অন্যরা কী পাবে? পরে ছেলেরা যদি মা'কে না-দেখে? আমি অবশ্য

মা'কে বলেছিলাম, "বিশ্বাস রাখো, দাদা সকলকে দেখবে।" এখনও গর্ব করে বলতে পারি, দাদা আমাদের সংসারের জন্য যা করেছেন, এককথায় নজিরবিহীন। বাবা মারা যাওয়ার পর দাদা মাথা পেতে সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এখন সব ভাইবোন বড় হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মতো প্রতিষ্ঠিত। দাদা কিন্তু সাহায্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি।

আমি সারাক্ষণ রাজনীতি নিয়েই থাকি। আমার জন্য বাড়ির অনেকে অনেক অসুবিধায়ও পড়েছে। তবুও আমার রাজনীতি করা নিয়ে কারও আপত্তি ছিল না। মা খুব শঙ্কায় থাকতেন আমায় প্রাণে মেরে ফেলা হতে পারে বলে। তারপর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর চিন্তায় থাকতেন মাওবাদীদের খুনের হুমকি নিয়ে। এখন তো মা-ও চলে গিয়েছেন। এখন আর অত দুশ্চিন্তা করার কেউ নেই। আমি অনেকটাই স্বাধীন।

রাজনীতির কথায় ফিরি।

১৯৮৪ সাল। ৩১ অক্টোবর। দুপুর প্রায় দেড়টা। মর্মান্তিক খবর এল রেডিওতে—গুলিবিদ্ধ ইন্দিরা গান্ধী।

সেদিন আমরা সকলেই রাজীবজি'র সঙ্গে মেদিনীপুরে। সফর কাটছাঁট করে রাজীব'জি ফিরে গেলেন। সন্ধ্যায় সরকারিভাবে ঘোষণা হল— ভারতরত্ন ইন্দিরা'জি আর নেই।

গোটা দেশের কাছে চরম দুর্দিন। কিন্তু কংগ্রেস বরাবরই দেশের সঙ্কটে ঐক্যবদ্ধ। সেদিন রাতেই সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে রাজীব'জি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। তার পরেই এসে গেল দেশ জুড়ে অষ্টম লোকসভা নির্বাচন।

যাদবপুর সিপিএমের 'লালদুর্গ'। আমাদের দলের তাবড় তাবড় নেতারাও সেখানে দাঁড়াতে রাজি ছিলেন না। প্রস্তাব এল আমার কাছে। কী করি-কী করি?

বিষ্ণুপুরের রশিদ গাজি বললেন, "আপনাকেই দাঁড়াতে হবে। আমরা অন্য কাউকে চাই না।"

শেষ পর্যন্ত আমি যাদবপুরের কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলাম। জিতব, এমনটা ভেবে নামিনি। কিন্তু এই জেদটা ছিল যে, বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। জিতলাম। আমার অগোচরেই। একটা রিকশায় মাইক বেঁধে

বৃদ্ধবয়সে প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর স্নেহের পাত্রী খুকুদি'কে নিয়ে আমার হয়ে রাস্তায়-রাস্তায় প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন। ভোটে জেতার পর প্রফুল্লদা'র আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য তাঁর মিডলটন রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা হল। মনে হল, তিনি এক আশ্চর্য মানুষ। যিনি পরের মুখাপেক্ষী হয়ে, পরের ফ্ল্যাটে থাকতেন। জীবনে নিজের জন্য কিছু করেননি। ইনিই তো আদর্শ মানুষ। রাজনীতিরও আদর্শ।

দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। প্রফুল্ল'দা প্রাণভরে আমায় আশীর্বাদ করলেন। বললেন, "মমতা, আমি ৯০ পেরিয়ে গিয়েছি। আমার বয়স কম হলে নতুন করে আরও একবার সুযোগ নিয়ে দেখতাম। তোমায় দেখে আশার আলো পাচ্ছি।"

প্রফুল্ল'দা জোর করেই আমায় খাওয়ালেন। তারপর একটা সিল্কের শাড়ি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে খুকুদি'কে বললেন, "মমতাকে বলো এই শাড়িটা পরে আমায় দেখাতে।"

প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়েছিলাম সেদিন। গুরুজনের কথা অমান্য করার সাধ্য নেই। প্রফুল্ল'দা জানতেন না, ছোটবেলায় কখনও সখনও সিল্কের শাড়ি পরে থাকলেও সক্রিয় রাজনীতিতে আসার পর থেকে আমি আর সিল্কের কাপড় পরতাম না। কিছুতেই প্রফুল্লদা'কে বোঝাতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে খুকুদি'কে বললাম, "প্লিজ। তুমি দাদাকে বোঝাও। আমি পরে পরব। এখনকার মতো আমায় বাঁচাও।"

খুকুদি'র বুদ্ধিমত্তায় সেদিন রেহাই পেয়েছিলাম। তারপর থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্রফুল্লদা'র কাছে যেতাম। তাঁর উপদেশ শুনতাম। উনি প্রায়ই আক্ষেপ করে বলতেন, "মমতা, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিপিএমকে মাথায় করে ক্ষমতায় নিয়ে-আসা। আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। এ যে আমার কী মানসিক যন্ত্রণা, বলে বোঝাতে পারা কঠিন। জানি না, আমার জীবদ্দশায় ওদের পতন দেখতে পারব কি না।"

১৯৯০ সালের ষষ্ঠীর দিন চলে গেলেন প্রফুল্ল'দা। হঠাৎ। ভেবেছিলাম, প্রফুল্ল'দা শতবর্ষে পৌঁছোবেন। খুব স্নেহ করতেন আমায়। তাঁকে আমি শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, এক সহৃদয় মানুষ হিসেবে দেখেছি। ১৯৮৯ সালে হুগলির আরামবাগে একটা সভা করতে গিয়েছিলাম। সেদিন প্রফুল্ল'দা তাঁর

আরামবাগের বাড়িতেই। কোনোভাবে জানতে পেরেছিলেন, সেদিন আমার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ছিল। ছোটবেলা থেকেই আমি জ্যৈষ্ঠমাসের মঙ্গলবার দিনটা পালন করি। আমাদের পরিবারের সব মেয়েরাই করে। দেখলাম, প্রফুল্ল'দা একজনের হাতে আমার জন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা, 'মমতা, আজ তোমার মঙ্গলচণ্ডী আমি জানি। বাইরে তো খাওয়া হবে না। আমি শশা-মুড়ি রেখে দেব। ফেরার পথে আমার বাড়িতে একটু খেয়ে তারপর বাড়ি যাবে'।

সেদিন মনে হয়েছিল, এই প্রফুল্লদা'কে 'অমানবিক' আখ্যা দিয়েছিলেন বামপন্থী বন্ধুরা। শুধু ক্ষমতা দখলের জন্য তাঁর বাস্তব কথাগুলোরও বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বরূপ কাউকে বুঝতেই দেওয়া হয়নি। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন স্বর্গীয় প্রফুল্লদা'র কথা বারবার মনে পড়বে। তাঁর জীবনের শেষ স্বপ্ন ছিল, সিপিএমকে সরে যেতে দেখা। তিনি দেখে যেতে না-পারলেও আমাদের অন্তরের শপথ দিয়ে প্রফুল্লদা'র সেই বাসনা আমরা পূর্ণ করতে পেরেছি। এতদিনে নিশ্চয়ই প্রফুল্লদা'র আত্মা খানিকটা শান্তি পেয়েছে। আজ নিশ্চয়ই তিনি আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

সাংসদ হওয়ার পর শুরু হল আমার জন্য লড়াই। সিপিএম তো বটেই কংগ্রেসেরও কিছু ঈর্ষাকাতর লোক সেদিন বলেছিলেন, "মমতা এমপি হয়েছে ঠিক আছে। কিন্তু রাজীব গান্ধী পাঁচবছরেও ওকে চিনে উঠতে পারবে না।"

তাঁরা হয়তো জানতেন না, নিজের মধ্যে কিছু না-থাকলে সবকিছুই 'প্রচার' দিয়ে হয় না। কারও ১০ ভাগ যোগ্যতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে-চড়িয়ে ১২ করা যেতে পারে। কিন্তু শূন্য থেকে একেবারে একডজন করে দেওয়া যায় না। সংসদীয় জীবন শুরু করেছিলাম একেবারে ছাত্রী হিসেবে। আমার ডিগ্রি নিয়ে এমন সমস্ত অভিযোগ তোলা হল, যেন আমি স্কুলের ইনফ্যান্টেও পড়িনি। নিজের নামটাও ঠিক করে লিখতে জানি না। ষড়যন্ত্রে কারা জড়িত ছিলেন, সে সব আমি জানি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই বাম বা অ-বাম কোনও পক্ষেরই কারও নাম উল্লেখ করলাম না। অনেকে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে আমার সাংসদ পদটাই খারিজ হয়ে যায়।

তখন বড় ভাইয়ের মতো আমার আগলে রেখেছিলেন রাজীব'জি।

একদিন মন খারাপ করে সংসদে চুপচাপ বসে আছি। একজন বেয়ারা এসে

বললেন, "পিএম (প্রাইম মিনিস্টার) আপনাকে এখনই ডাকছেন।"

আমি তো অবাক। তখন তো একেবারেই নতুন। তা হলে কি আমি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি? আমায় প্রধানমন্ত্রী কেন ডাকবেন? প্রচুর প্রশ্ন মাথায় নিয়ে গেলাম রাজীবজি'র কাছে। উনি আমায় অবাক করে দিয়ে বললেন, "কিছু ঈর্ষাকাতর লোক তোমার চরিত্রহনন করতে চাইছে। ভয় পেও না। আমি আছি। যা সাহায্যের প্রয়োজন হবে, বলবে। আর শোনো, তোমায় আমি সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক করছি।"

আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। কারণ আমি ছাত্র রাজনীতি দিয়ে শুরু করে কংগ্রেসের সম্পাদক পর্যন্ত হয়েছি। কিন্তু যুব কংগ্রেস কোনোদিন করিনি। রাজীবজি'র কথা শুনলাম। আর যাঁরা ভেবেছিলেন, এ বার আমার সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাবে, তাঁরা আরও বেশি ঈর্ষায় জ্বলতে লাগলেন।

বিভিন্ন বিষয়ে লোকসভায় সিপিএমের বিরুদ্ধে বলতে লাগলাম। বন্ধ কলকারখানা, নারী নির্যাতন, বেকার সমস্যা...। একবার তো ক্রুদ্ধ সিপিএম সাংসদরা বলেই ফেললেন, "পরের বার তোমায় আর জিততে দেব না!"

কখনও ভেজাল তেল খেয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া মানুষদের নিয়ে আন্দোলন, কখনও সুদূর হিমাচল প্রদেশ থেকে পর্বতারোহীদের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে-আসা। সমস্ত বিষয়েই রাজীবজি'র থেকে সাহায্য পেয়েছিলাম। যাঁরা রাজীবজি'র সমালোচক, তাঁরা সম্ভবত জানেন না, মানুষটি কত সরল, নিষ্পাপ এবং পরিশ্রমী ছিলেন। অন্তর থেকে ভালোবাসতেন নতুন প্রজন্মকে।

একটা ঘটনার কথা এখনও মনে আছে। হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের নাতবৌ সুপ্রিয়া রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন। আমি কী একটা জরুরি কাজে কলকাতায় আটকে পড়ায় সোমবার দিল্লি যেতে পারিনি। পরদিন ট্রেন থেকে নেমেই সোজা দৌড় সংসদে। যাওয়া মাত্রই অনেকে বলতে লাগলেন, "কাল কিঁউ নহি আয়ি?" আমি জানতে চাওয়ায় কংগ্রেস সাংসদরা বললেন, "দেবীলালের নাতবৌকে খুন করা হয়েছে। কাল কেউ জোরগলায় লোকসভায় বিষয়টা নিয়ে বলতে পারেনি। তুমি আজ বলো।"

আমি জিরো আওয়ারে ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুললাম। বামপন্থী-সহ বিরোধীরা আমায় সমর্থন করা তো দূরস্থান, ক্রমাগত আমায় বাধা দিয়ে যেতে থাকলেন। আমি তখন হাতে একটা রুপোর বালা পরতাম। সেটা

খুলে মধু দণ্ডবতের টেবিলে রেখে বললাম, "যদি কারও কিছু করার ক্ষমতা না-থাকে, তা হলে এই চুড়ি পরে বসে থাকুন!"

তেলুগু দেশমের এক সাংসদ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আমার সিটে তাঁর জুতো রেখে চলে গেলেন। ব্যাপক হইচই হল সংসদে। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয় ঘুমিয়ে পড়লাম। আচমকাই রাত তিনটে নাগাদ ফোন— রাজীব'জির। বললেন, "তুমি আজ মহিলাদের ইজ্জৎ রক্ষা করেছো। যারা তোমার আসনে জুতো রেখে গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আরও সোচ্চার হও।"

প্রিয়'দা তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু আমার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ব্লকগুলো নিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। ফলে ব্লক কমিটি তৈরি হচ্ছে না। কাজ করতেও খুব অসুবিধে হচ্ছে। সটান চলে গেলাম রাজীব'জির কাছে। তখন তিনি লোকসভায়। বেলা প্রায় সাড়ে ১২টা। খানিক পরেই নিজের কেন্দ্র অমেঠিতে চলে যাবেন। দেখা হলেও রাজীব'জি সব খোঁজখবর নিতেন। কখনও বলতেন, "মমতা এত ওজন কমাচ্ছো কেন?" কখনও বলতেন, "তুমি কিন্তু মোটা হয়ে যাচ্ছো।"

সেদিন আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "ক্যায়া হুয়া? কুছ গড়বড় হ্যায়?" বললাম, "আমার ব্লকগুলো প্রিয়দা'কে দিয়ে দিতে বলুন। কোনো কাজ করতে পারছি না।" বলেই ভাবলাম, তখন তো অমেঠিতে চলে যাচ্ছেন। বোধহয় ফিরে এসে কোনো ব্যবস্থা নেবেন। ওমা! বেলা ১টা নাগাদ সেন্ট্রাল হলে প্রিয়দা'র সঙ্গে দেখা হতেই উনি বললেন, "কি রে! আমার বিরুদ্ধে রাজীব'জির কাছে অভিযোগ করেছিস? বল, তোর কোন কোন ব্লক দরকার।" তারপর আর কোনো অসুবিধা হয়নি। আমার কথামতোই কাজ হয়েছে।

রাজীব'জি যতদিন বেঁচে ছিলেন, বটবৃক্ষের মতো আমার মাথার উপর তাঁর ছায়া অনুভব করেছি। প্রতি পদক্ষেপে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৮৭-৮৮ সালে রাজীব'জি আমায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও বাধা এসেছিল।

রাজীব'জি তখন পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি-রাজ প্রকল্পের উদ্বোধন করতে এসেছেন। সঙ্গে এসেছি আমরাও। আবার ওঁর সঙ্গেই দিল্লি ফিরব। প্লেনে উঠেই ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। দেখলাম, বাংলার কিছু নেতা রাজীব'জির কেবিনে ঢুকে আলোচনা করছেন। তাঁরা কথা বলে বেরিয়ে আসার পর আমার ডাক

পড়ল। ঢুকে দেখি, রাজীব'জি তৎকালীন এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক অস্কার ফার্নান্ডেজের সঙ্গে কথা বলছেন। আমায় দেখেই বললেন, "মমতা, তুমি এত ভালো কাজ করছো। এত পরিশ্রম করছো। আমি তোমাকে একটা ভালো দায়িত্ব দিতে চাই।" আমি সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, "রাজীব'জি, আমি কিছু চাই না। আপনি যে বলেছেন, তাতেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মহিলা কংগ্রেস আমি করব না।" রাজীব'জি বুঝতে পারলেন, আমার যুব কংগ্রেসের সভাপতিত্ব আটকানোর জন্য খানিক আগেই যে তাঁর পায়ে ধরা হয়েছে, সেটা আমার কানে পৌঁছে গিয়েছে। বললেন, "ঠিক আছে। তুমি চাও না, এমন কোনো দায়িত্ব তোমায় দেব না।"

১৯৮৯ সালে লোকসভা ভোটে হেরে গেলাম যাদবপুর থেকে। রাজীব'জি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। আমিও আর দিল্লি যেতাম না। বাসভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে এখানে তখন আন্দোলন তুঙ্গে। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হল তিনজনের। চারদিক উত্তাল। পুলিশ আর সিপিএমের ক্যাডার যৌথভাবে আমায় মেরে ফেলার ছক কষছে। আমায় প্রায় নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে। রাজীব'জির কাছেও পৌঁছেছিল খবরগুলো। ১৯৯০ সালের ১২ আগস্ট দুপুরে হঠাৎ ফোন পেলাম রাজীব'জির ব্যক্তিগত সচিব ভিনসেন্ট জর্জের, "তুমি কি কাল একবার দিল্লি আসতে পারো? রাজীব'জি তোমায় নিয়ে খুবই চিন্তিত। একবার কথা বলতে চান।" বললাম, "১৬ আগস্ট কংগ্রেস বাংলা বন্‌ধ ডেকেছে। ফলে দিল্লি গেলেও আমায় রাতেই ফিরে আসতে হবে।" জর্জ বললেন, তাই হবে।

দিল্লি পৌঁছেই রাজীব'জির কাছে গেলাম। বললেন, "শুনছি, ওরা তোমায় মারতে চায়। বলো, আমি কী করে তোমায় সাহায্য করতে পারি।" বললাম, "রাজীব'জি আমি সত্যিই অভিভূত। কিন্তু আমি শুধু আপনার আশীর্বাদ চাই।" তারপর উনিই পুরনো প্রসঙ্গ তুলে বললেন, "অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। আর নয়। তুমিই এ বার পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব নাও।"

ফিরে এলাম কলকাতা।

৩

জনতার দরবারে

যে ঘটনার কথা লিখে এই পরিচ্ছেদ শুরু করছি, সেটা আমার রাজনৈতিক জীবনের 'মাইলস্টোন' বলে অনেকে মনে করেন। সংবাদপত্রে বহুলপঠিত ও বহুলচর্চিত হওয়ায় সকলে সে ঘটনা বিস্তারিত ভাবে জানেনও।

দিনটাও সকলে জানেন—১৬ অগস্ট, ১৯৯০।

রাজীব গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতায় চলে এলাম। ১৬ তারিখের আগে পর্যন্ত আমি কালীঘাটের বাড়ি থেকে বাইরে বেরোলেই পুলিশের গাড়ি আমার উপর বিশেষ নজর রাখত। আমি কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, কার সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে যাচ্ছি—সমস্ত নজর রাখা হত। যেন জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে।

সম্ভবত ১১ অগস্ট আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের আমতলায় গিয়েছিলাম। তার আগেই ঠিক করেছিলাম, আমার গন্তব্যস্থল কোথায়, কিছুতেই পুলিশকে জানতে দেব না। ফলে যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে না-গিয়ে ঠিক করলাম, হরিদেবপুরের দলীয় কার্যালয়ে যাব শুভাশিস চক্রবর্তীদের কাছে। আমাদের জিপটা বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে বহুক্ষণ বসলাম। কিন্তু পুলিশ কিছুতেই যাচ্ছিল না। তখন বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের একটা বাড়িতে জল খেতে ঢুকলাম। পরিষ্কার শুনলাম, পুলিশ ওয়াকিটকিতে খবর দিচ্ছে, "মমতা ব্যানার্জি এখনই একটা বাড়িতে ঢুকলেন। এখনই দেখা গেল, জল খাচ্ছেন।" যেন খেলার মাঠের ধারাবিবরণী হচ্ছে।

ঠিক করলাম, যে করেই হোক, পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে এখান থেকে বেরোতে হবে। আমার এক সহকর্মীকে বললাম, ঠিক আমার কায়দায় শাড়ি পরে, দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়-করানো জিপে উঠে চলে যেতে। যাতে পুলিশ

ভাবে, আমি চলে গিয়েছি। কিন্তু আমি রয়ে যাব ভিতরেই। পুলিশ বোকার মতো ফাঁদে পা-ও দিল। জিপের পিছন পিছন ছুটল। আর আমি সেই সুযোগে শুভাশিসকে সঙ্গে নিয়ে একটা অটোয় করে আমার গন্তব্যে পৌঁছোলাম।

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পুলিশ ওইভাবে আমার উপর নজর রাখত। কিন্তু আমাদের প্ল্যান অফ অ্যাকশন কখনওই ধরতে পারত না। স্বভাবতই পুলিশ-সিপিএমের আমার উপর যৌথ ক্রোধ বাড়ছিল। তখনও মাঝেমধ্যে হুমকি দেওয়া হত। প্রশাসনের একাংশ ১৬ অগস্টের আগে আমায় জানিয়েওছিলেন যে, আমায় মেরে ফেলার চক্রান্ত হচ্ছে। আমি যেন সাবধানে থাকি। কিন্তু আমি ভয় পাইনি। ভয়ডর বলে কোনও বস্তু আমায় ছুঁতে পারে না কখনও। ১৬ অগস্টের আগে খবরের কাগজে একটা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েও দিয়েছিলাম, আমায় সিপিএম-পুলিশ যৌথভাবে খুনের চক্রান্ত করছে।

ক্রমে ১৬ তারিখ এসে গেল। পুলিশের গুলিতে নিহত রঘুনন্দন তেওয়ারি, মানস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিমলা দে-র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল। মা খুব ভয়ে ছিলেন। ১৫ তারিখ রাত থেকেই বলছিলেন, "তুই কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবি না। তোকে ওরা মেরে ফেলবে!" আমি মা-কে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বাড়ি থেকে বেরোব না। কিন্তু আমি নিজেই যে কংগ্রেসের মিছিল ডেকে রেখেছি। আমি নিজে না-গেলে তো সেখানেই হেরে গেলাম।

খানিকটা ছলের আশ্রয় নিতে হল। আমি যেখানেই বেরোতাম, মায়ের মুখ না-দেখে বেরোতাম না। কিন্তু সেদিন তো তার উপায় নেই। স্নান করে শাড়ি পরতেই মা বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস?" কোনওদিন মা-কে মিথ্যে কথা বলি না। কিন্তু সেদিন অগত্যা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বললাম, "কোথাও না। এই তো একটু অফিসে বসব।"

মা বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেতেই দিলীপ মজুমদার আর অনিল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মিছিল করে বেরিয়ে পড়লাম। বহু রাস্তা পরিক্রমা করে যখন হাজরা মোড়ে এসে পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ দেখলাম, সিপিএমের কিছু লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমায় লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে এতটা বুঝতে পারিনি। পরে প্রত্যক্ষদর্শী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এখন সাংসদ) মুখে শুনেছিলাম, ওরা হাজরার দিকে আসতে আসতে গোলমাল দেখে একটা দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়ে সব দেখেছিল। ও-ই বলেছিল, আমার উপর

হামলা করার আগে প্রথমে বলিউডের ফিল্মের কায়দায় চার-পাঁচজন যুবক ট্যাক্সি করে এসে নেমে রিভলভার দেখিয়ে এবং লোহার চেন ঘুরিয়ে লোকজনকে তাড়া করে হটিয়ে এলাকার দখল নেয়। প্রথমত, যাতে কেউ ঘটনার সাক্ষী না-থাকে। দ্বিতীয়ত, যাতে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে না-পারে। তার পর সামনের দিক থেকে সরাসরি মিছিলের উপর হামলা করে।

আক্রমণ শুরুর পর সহকর্মীরা আমায় হাজরা মোড়ের কাছে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সামনে বাটা-র দোকানে টেনে নিয়ে আসে। আমি দেখলাম, লালু আলম (তখনও নামটা ঠিকঠাক জানতাম না) সহ কয়েকজন আগ্নেয়াস্ত্র আর লাঠি নিয়ে আমার দিকেই আসছে। আমি অবশ্য মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম। ফলে একটুও নার্ভাস না-হয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। প্রথমেই লালু আলম আমার মাথায় সজোরে একটা লাঠির বাড়ি মারল। দেখলাম, মাথা ফেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। ভিজে যাচ্ছে আমার পরনের কাপড়। কিন্তু কী জানেন? মাথায় অতজোরে আঘাত পেয়েও আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল না। আমি তখনও লক্ষ্য করছিলাম, লোকটার হাতে পুলিশের মতো লাঠি। মাথায় পুলিশের মতোই হেলমেট। তা হলে কি এটাই সিপিএম-পুলিশের আঁতাত? ভাবতে ভাবতেই আবার ডাণ্ডার বাড়ি। মাথার ডানদিকে। আবার ফাটল মাথা। আবার গলগল করে রক্ত পড়তে শুরু করল। কিন্তু তখনও আমি দমে যাইনি। দেখছিলাম, ওরা শেষপর্যন্ত কী করে। কিন্তু তার পর যেই দেখলাম, একটা লোহার রড বার করে আমার মাথায় মারার জন্য তুলেছে, তখন দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললাম। রডটা তা-ও নামল। এত প্রচণ্ড জোরে যে, হাতের কব্জির হাড় ভেঙে, গুঁড়িয়ে গেল। তার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না।

পরে খবরের কাগজে দেখেছিলাম, আমায় সেদিন গুলি করার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা পুলিশের এক অফিসার, গুরুপদ সোমের হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত আমি প্রাণে বেঁচে যাই। মানুষের ভালোবাসাও ছিল। পরে এক বামপন্থী নেতা (সিপিএম নন অবশ্যই) বলেছিলেন, আমার দলের এবং বাড়ির লোকেরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার পিজি হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিয়ে না-গেলে আমায় মেরে ফেলার নকশা তৈরিই ছিল। অথবা আমায় পাকাপাকি ভাবে উন্মাদ বানিয়ে দেওয়ার।

লালু আলমের হাতে আমার মার খাওয়ার ছবি তুলতে গিয়ে একাধিক

ফটোগ্রাফারও সেদিন প্রবল মার খেয়েছিলেন। হাজরা মোড়ে পুলিশের সামনেই গোটা ঘটনা ঘটেছিল। অথচ, লোকে পথনাটিকা দেখার মতো দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন। ওপরতলার নির্দেশ না-থাকলে প্রকাশ্য দিবালোকে এমন ঘটনা ঘটতে পারে? সেদিন ভয় পেয়ে গেলে অত মার খাওয়ার পর আমি বেঁচেই থাকতে পারতাম না। কিন্তু মানুষের ভালোবাসাই আমায় ফিরিয়ে এনেছিল।

চিকিৎসার ব্যয় বহন করেছিলেন রাজীব'জি। লোক পাঠিয়েছিলেন এটা জানতে যে, চিকিৎসার জন্য আমি আমেরিকায় যেতে রাজি কি না। অনেকদিন পর যখন দিল্লিতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, শিশুর মতো আকুল হয়ে হাত আর মাথার কোথায় কোথায় আঘাত লেগেছিল, দেখতে চেয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই জেনেছিলাম, রাজীব'জি আমায় পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেসের সভাপতি করেছেন। তখন সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেস সভাপতি রমেশ চেন্নিথালা। তিনি বাংলার অনেকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমায় সেই দায়িত্ব দিতে রাজি ছিলেন না। শুনেছি, ২০ আগস্ট রাজীব'জির জন্মদিনে ফুল নিয়ে চেন্নিথালা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে রাজীব'জি তাঁকে বলেছিলেন, "আগে যাও। মমতার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা তৈরি করো। তারপর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো।"

চক্রান্ত অবশ্য তার পরেও থামেনি। আমার প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন আটকানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা চলছিল। আবার গেলাম রাজীব'জির কাছে। কমিটির তালিকাটা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে তাতে নিজেই সই করে দিলেন। তারপর ভিনসেন্ট জর্জকে ডেকে বললেন, "এই তালিকাটা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দিয়ে দাও।"

রাজীব'জি যে কী ভাবে একটার পর একটা ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমায় বাঁচিয়েছিলেন, তা কী করে ভুলব?

এলটিটিই-র মানববোমায় নিহত হওয়ার দিনপনেরো আগে ১৯৯১ সালের ৬ মে বাংলার নির্বাচনী সভা করতে এসেছিলেন রাজীব'জি। এয়ারপোর্ট হোটেল থেকে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক। সকলেই চেষ্টা করেছেন তাঁর সভায় রাজীবজিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সাংবাদিক বৈঠক শেষে রাজীব'জি প্রথমেই সভার তালিকা দেখতে চাইলেন। দেখে বললেন, "প্রথমে মমতার সভায় যাব। তারপর অন্য সভা।" সেদিনই দেখেছিলাম, অসম্ভব ক্লান্ত। গলা

ভেঙে গিয়েছে ভাষণ দিতে দিতে। নিজের নিরাপত্তা বলতে কিছু নেই। শুধু জনতার স্রোতে ভাসতে-ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

দেশপ্রিয় পার্কে যখন আমার সভায় এলেন, তখন রাত সাড়ে ৯টা। অত রাতেও জনসমুদ্র। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে যান চলাচল। জনতার কাঁধে চেপে মঞ্চে উঠলেন রাজীব'জি। মানুষ তাঁকে একবার দেখতে চায়। ছুঁতে চায় একবার। সামনে গরম জলের গ্লাস। একটু করে চুমুক দিয়ে গলাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন। তারপর আবার বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতা শেষ হতেই আমার নাম ধরে আলাদা করে ডেকে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছো?" মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আবার প্রায় জনস্রোতে ভাসতে-আসতেই চলে গেলেন পরের সভায়।

তাঁর যাওয়ার পথের দিকে অপলকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। কিছু একটা হয়ে না-যায়। মনে হচ্ছিল, এই দেখাটাই শেষবারের মতো রাজীব'জিকে দেখলাম না তো?

২১ মে। রাত ১০টা ২০। তামিলনাড়ুর শ্রীপেরামদপুদুরে মানববোমায় ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়লেন রাজীব'জি। বাবার মৃত্যুর পর আমি আবার অভিভাবক-হীন হলাম। সাতদিন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। খেতে পারিনি। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুধু চোখের জল ফেলেছি। আজও প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অনুভব করি। কোনো সমস্যায় পড়লে আনমনেই দৃষ্টি চলে যায় দেওয়ালে টাঙানো রাজীব'জির ছবির দিকে। মনে হয়, স্মিত হাসিটা হেসে বলছেন, "মমতা, কেমন আছো? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

মনে আছে, ১৯৮২ সালের পর থেকে আমি প্রায়ই বিধানসভায় যেতাম। বিধায়করা কী ভাবে বক্তৃতা করেন, নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন, সব দর্শক গ্যালারিতে বসে লক্ষ করতাম। কিন্তু লোকসভা বা সংসদ সম্পর্কে কোনো ধ্যানধারণাই ছিল না। শুধু শুনতাম, সংসদটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার। একেবারে গোলকধাঁধার মতো। একবার ঢুকলে নাকি রাস্তা চিনে বেরোন কঠিন। সাংসদ হওয়ার আগে সেই 'জনতার দরবার'কে চাক্ষুস করিনি কখনও। দিল্লিতে অনেকবার গেলেও তা সংসদের বাইরে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। যাদবপুরের মানুষ যখন তাঁদের স্নেহাশিস দিয়ে আমায় নির্বাচিত করলেন, তখন সংসদে যেতে হবে জেনে প্রথমে খুব ভয় পেয়েছিলাম। যাদবপুরের অসংখ্য মানুষ,

আমার সহকর্মীরা তখন আনন্দে আত্মহারা। আর আমি কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিলাম। যেন এক অজানা-অচেনা রাস্তায় আমায় পাঠানো হচ্ছে। কোথা দিয়ে যে গন্তব্যে পৌঁছোব, তা-ই জানি না!

১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট ১৬ জন কংগ্রেসের সাংসদ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। দিল্লিতে সকলে একই বিমানে গেলাম। একসঙ্গে। প্রণব'দা তখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। আমাদের সকলের দায়িত্ব তাঁর উপর। অফিসের বিশ্বস্ত সহকর্মী এম কে মুখোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন আমাদের দেখভালের জন্য। দিল্লিতে আমার তখন কোনো ঠিকানা নেই। ফলে আমার এবং স্বর্গীয়া ইন্দুমতী ভট্টাচার্যের একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হল। পরদিন সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন। প্রণব'দাই নিয়ে গেলেন সংসদের সেন্ট্রাল হল-এ। কোনো অসুবিধা হল না কিন্তু। এর পর গিয়ে পড়লাম সেই গোলকধাঁধায়। পরের কয়েকটা দিন রতন'দা (রতন মুখোপাধ্যায়) এবং তাঁর স্ত্রী মলয়া'দি আমায় খুব সাহায্য করেছিলেন। শুরু হল 'জনতার দরবারে' প্রত্যক্ষ অংশ নেওয়া। বিধানসভার দর্শক গ্যালারি থেকে একেবারে নির্বাচিত সাংসদের আসনে!

প্রথমদিকে তো কিছু বুঝতেই পারতাম না! মনে হত, এ কোথায় এলাম! সাহায্য করারও কেউ নেই। একেবারেই আনকোরাদের দলে আমি।

প্রথম প্রথম ধারণা ছিল, এটা বোধহয় একটা আদর্শ দেবালয়। যেখানে শুধুই জনতার স্বার্থে আওয়াজ তোলা হয়। কেউ গড়গড় করে ইংরেজি বলছেন। কেউ সংবিধান আউড়ে যাচ্ছেন। সব কেউকেটা একেকজন। জনগণের পরিত্রাতা। মনে হত, ইস্! যদি ওঁদের মতো হতে পারতাম! যে দায়িত্ব সাধারণ মানুষ দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে পারব তো?

ক্রমশ সংসদকে জানতে শিখলাম। আর আইনকানুন লক্ষ্য রাখতে শিখলাম। পাশাপাশি নিজেকে তৈরি করছিলাম। প্রায় এক সপ্তাহ সে ভাবেই কেটে গেল। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোয় নতুন সাংসদকে তাঁর সহকর্মীরা সাহায্য করেন। নতুনদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করেন। আদবকায়দা শিখিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের দলের বৈশিষ্ট্যই ছিল, নিজের মতো করে তৈরি হওয়া।

যেমন হয়েছিল জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার সময়। ১৯৮৩ সালে কুয়ালা লামপুর গিয়েছিলাম আইএনটিউসি-র প্রতিনিধি হয়ে। প্লেনে চড়ার আগে মনকে তৈরি করে নিয়েছিলাম, পাশের যাত্রীকে দেখে সব শিখে নেব। কাউকে

বুঝতে দেওয়া যাবে না যে, আমি কিছু জানি না। কুয়ালা লামপুরে পৌঁছে আবার নতুন বিপদ। উদ্যোক্তাদের তরফে কেউ বিমানবন্দরে আসেনি আমাদের নিতে। রাত প্রায় ১২টা। ভরসা একটাই—আমার কাছে যে অনুষ্ঠানসূচি ছিল, তাতে লেখা ছিল 'সাউথ ইস্ট এশিয়া হোটেল'। এয়ারপোর্টে ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে একটা ট্যাক্সি করে একাই রওনা দিলাম হোটেলের দিকে। একটু যে ভয় করছিল না, তা নয়। তবে পৌঁছে গেলাম হোটেলে। রিসেপশনে যখন খোঁজখবর করছি, উদ্যোক্তারা তখন দৌড়ে এলেন। ক্ষমা-টমাও টাইলেন। আসলে বিমানের সময়টা ওঁদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমিও আর কিছু মনে করলাম না। উতরে তো গিয়েছি।

দিন সাতেক চুপচাপ লোকসভায় বসে থাকার পর ঠিক করলাম, যা-ই হোক, নিজের চেষ্টাতেই জনতার দরবারে আমায় নিজেকে মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে হবে। প্রশ্নোত্তর পর্বে হাত তুললাম। ডাক পেলাম না। প্রবল রাগ হল। পরদিনও হাত তুললাম। আবার অবজ্ঞা। কিন্তু আমি তো আর সেদিন ছাড়ার পাত্রী নই। উঠে বললাম, "অনারেব্‌ল স্পিকার স্যার, আই অ্যাম রাইজিং মাই হ্যান্ড। হোয়াই ডোন্ট ইউ অ্যালাউ মি টু আস্ক আ কোয়েশ্চেন?"

স্পিকার খানিকটা বিহ্বল হয়েই আমায় বলার সুযোগ দিলেন। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি 'উদ্বাস্তুদের নিঃশর্তে জমির দলিল' নিয়ে প্রশ্ন করলাম। স্পিকার পাল্টা বললেন, "আপনি নতুন তো। তাই বিষয়টা ভালো করে জানেন না। এই প্রশ্নটা এনিমি প্রপার্টি নিয়ে। এর সঙ্গে আপনার প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।" আমি পাল্টা বললাম, "সম্পর্ক না থাকলে সংসদীয় রীতিতে হাফ-অ্যান্ড আওয়ার ডিসকাশন বলে যেটা আছে, সেটার অনুমতি দিচ্ছেন না কেন?" হয়তো আবেগ দিয়ে, আন্তরিকভাবে স্পিকারকে অনুরোধ করেছিলাম বলেই তিনি কন্যাস্নেহে আমার আবেদন মেনে নিয়েছিলেন। আর আমার মনে হয়েছিল, স্বর্গজয় করে ফেলেছি।

আমার জানা ছিল না যে, আমার অনুরোধেই আধঘণ্টা আলোচনা হবে বলেই আমি বলার অনুমতি পাব, তা নয়। লোকসভায় প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে সবকিছুই ব্যালটে হয়। লটারির মতো অনেক নাম জমা পড়ে। যাঁর নাম প্রথম উঠবে, তিনি আলোচনা শুরু করবেন। ঈশ্বরকে প্রাণপণ ডাকছিলাম, সুযোগটা যেন চলে না-যায়। ঈশ্বর প্রার্থনা শুনেছিলেন। লটারিতে প্রথম নাম উঠেছিল আমার।

তারপর বহু তত্ত্ব-তথ্য-প্রয়াস-যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল মানুষের দাবির। তবে রাজীব'জির সহযোগিতা না-থাকলেও কিন্তু সেটাও হত না।

বুঝলাম, জনগণের টাকায় চলে জনতার দরবার। একেবারে সাজানো, পরিপাটি। সংযত ভাবে, আইনকানুন মেনে সকলকে চলতে হয়। বছরে অন্তত চার-পাঁচমাস চলে এই দরবার। থাকে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি। তাদের সভা। অনেক কমিটি আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করে। সেখানে কমিটির সদস্যদের থাকার এলাহি ব্যবস্থা হয়। পাঁচতারা হোটেল, আনুষঙ্গিক খাওয়াদাওয়া, ভ্রমণ ইত্যাদি। দেখলাম, কিছু সাংসদ আছেন, যাঁদের চেহারায় তত জৌলুস নেই। পশ্চিমী কেতায় ইংরেজি বলতে পারেন না। কিন্তু প্রাণ আছে। হৃদয় আছে। মানুষের হয়ে কথা বলার সৎ চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁরা বলার সুযোগ প্রায় পান না।

কেন জানি না, বরাবরই আমার মনে হয়েছে, সাংসদদের মধ্যে দুটো শ্রেণি আছে। একশ্রেণির সাংসদ বক্তৃতা করার সময় স্পিকারের দিকে তাকিয়ে বললেও মূল লক্ষ্যটা কিন্তু থাকে লোকসভার প্রেস গ্যালারির দিকে। যেখানে সার দিয়ে বসে থাকেন সাংবাদিকরা। যেন খবরের কাগজের 'পাবলিসিটি' পাওয়ার জন্যই বক্তৃতা করা। আর দ্বিতীয় শ্রেণির গ্ল্যামার কম। তাঁদের গুরুত্বও কম। তাঁরা যেন আসেন শুধু সইটা করতে। এই সাংসদেরা সদিচ্ছা দেখালেও গুরুত্ব পান না। বলার সুযোগ পান না। ফলে তাঁদের নির্বাচনী এলাকার লোকেরা তাঁদের 'সক্রিয়' বলে মনে করেন না। তাই জিরো আওয়ার এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাড়া অধিকাংশ সাংসদই সভায় থাকেন না। লোকসভা প্রকৃত অর্থেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু সেখানে সংসদ বেশি থাকায় বার সুযোগ কম। আবার রাজ্যসভায় সাংসদ কম থাকায় আলোচনার সুযোগ বেশি। লোকসভায় সাধারণ একটা প্রশ্ন করতে চাইলেও সময়াভাবে তা অনেক সময়েই হয়ে ওঠে না।

পঁচিশ বছর কাটিয়েছি সংসদে। সেটা এক জনতার দরবার। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় অন্য জনতার দরবারও দেখেছেন মানুষ। আন্দোলনের জন্য প্রতিষ্ঠিত দরবার। মানবাধিকারের জন্য টানা একুশ দিনের ধরনা।

হঠাৎ কী এমন ঘটেছি, যার জন্য আমার সহকর্মীদের নিয়ে কলকাতার রাজপথে টানা একুশ দিন ধরনা দিতে হয়েছিল?

সামান্য কিছু লোকের টিপ্পনি, বিদ্রূপ, অভব্য আচরণ তো ছিলই। কিছু বামপন্থী নেতা এমন সব কথা বলতে শুরু করেছিলেন যে, মনে হত, মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা তোলাটাই মস্ত বড় মানবাধিকার লঙ্ঘন। অপরাধ না-করাটাই অপরাধ! আমি দেখেছিলাম, পুলিশ লক-আপে মৃত্যুর সংখ্যা বাংলায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সরকার বাহাদুরের তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রশাসনের সকলেই যে তেমন, তা নয়। কিন্তু প্রশাসনের একাংশকে নিজেদের স্বার্থে যখন সরকার ব্যবহার করে, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে ধৃত ব্যক্তিকে কেন পুলিশি হেফাজতে অকথ্য মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করা হবে, এ প্রশ্ন তোলা কি অন্যায়? পুলিশ আইনের রক্ষক হতে পারে। কিন্তু তারাও তো আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

নির্যাতন করার অধিকার না-থাকলেও পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারধর করে। তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ও ৩৩১ নম্বর ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারায় পুলিশেরও শাস্তির বিধান রয়েছে। অপরাধের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য শারীরিক আঘাত করা দণ্ডনীয় অপরাধ। সে ক্ষেত্রে পুলিশের সাতবছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান প্রথম। ধরনামঞ্চে বসে বারবার মনে হচ্ছিল, যাঁরা আমাদের কর্মসূচিকে কটূক্তি করছেন, তাঁদের আসল চেহারাটা কী। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা ভোটের সময় সিপিএম যে ৩৬ দফা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত পুলিশ লক-আপ, জেল হাজত এবং অন্যত্র সংঘটিত সব হত্যাকান্ড এবং অত্যাচারের তদন্ত করার কথা। সেই জন্যই গঠিত হয়েছিল হরতোষ চক্রবর্তী শর্মা কমিশন। কিন্তু একজনও দোষী পুলিশ অফিসারের শাস্তি হয়নি।

লক-আপে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনার পরেই মৃত ব্যক্তির বাড়িতে জানানো হয়, হয় আসামী আত্মহত্যা করেছে। নয়তো পুলিশের হাত থেকে পালাতে গিয়ে মারা গিয়েছে। কিম্বা কোনো কঠিন অসুখে মৃত্যু হয়েছে ধৃত ব্যক্তির। বাড়ির লোকেরা অসহায় হয়ে সেটাই মেনে নেন। তাঁদের কিছু করার থাকে না। এমন বহু অভিযোগ আমার কাছে আসত। নিজের বিশ্বস্ত লোকেদের দিয়ে খোঁজ নেওয়াতাম। ঘটনাটা সত্যি বুঝলে লড়ে যেতাম। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বা

প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য নয়। মানবিক মূল্যবোধের তাগিদে।

১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি পুলিশ লক-আপে মারা যান গার্ডেনরিচের শেখ আজাদ। ওঁর মা এবং স্ত্রীয়ের থেকে শুনেছিলাম ওঁর উপর অত্যাচারের বীভৎস ঘটনা। ২ জানুয়ারি ওঁরা যখন আমার বাড়ি এলেন, তার আগেই আমি অন্য কাজে বেরিয়ে পড়েছি। একটি প্রয়োজনে মানিক মজুমদারকে আমার অফিসে ফোন করে জানতে পারি, শেখ আজাদের বিধবা এবং অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী রুকসানা এবং আজাদের কিছু পরিজন আমার বাড়িতে এসেছেন। তাঁরা আমায় আজাদের মৃতদেহে পুলিশি অত্যাচারের চিহ্ন দেখানোর জন্য গার্ডেনরিচে নিয়ে যেতে চান। তার আগে ওঁরা আজাদকে গোর দিতে পারছেন না। আমি ওঁদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করে বলি, বিকেলেই আমি তাঁদের কাছে যাব।

আজাদের বাড়িতে রওনা দিই আইনজীবী (এখন বিধানসভার স্পিকার) বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে। সঙ্গে সহকর্মী (এখন ডেপুটি স্পিকার) সোনালি গুহ আর এক সাংবাদিক। পিছনের গাড়িতে আরও একজন সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী।

যে রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম, সেখানে সিপিএম একটা ছোট সভা করছিল। গাড়িতে আমায় দেখেই ওরা নিমেষে রাস্তায় নেমে এল। পুলিশের সামনেই ঘিরে ফেলল গাড়ি! ইট-পাথর ছুড়ে গাড়ির সমস্ত কাচ ভেঙে ফেলল। বিষাক্ত কিছু মেশানো ধুলো ঠোঙায় ভরে ছুড়ে দেওয়া হল আমাদের চোখেমুখে। তার পরেই আমায় গাড়ি থেকে নামানোর জন্য শুরু হল হাত ধরে টানাটানি। চোখে অন্ধকার দেখছি। ইটের ঘায়ে আর ভাঙা কাচ ঢুকে গিয়ে গাড়ির আরোহীরা সকলেই রক্তাক্ত। টানাহ্যাঁচড়ায় গাড়ির দরজাগুলো লক্ হয়ে গিয়েছে। গাড়ি থেকে আমায় টেনে নামাতে না পেরে ওরা ভাঙা কাচের মধ্য দিয়েই আমায় ক্রমাগত কিল-চড়-ঘুষি মারছিল। বৃষ্টির মতো ইটপাটকেল পড়ছিল। একটা বিশাল ইট এসে লাগল আমার বুকে। বিমান'দা চেষ্টা করেও গাড়ি স্টার্ট করতে পারছিলেন না। পুলিশ দাঁড়িয়ে দর্শক হয়ে। আর একটা ছোট মারুতি গাড়ি ঘিরে জনা পঞ্চাশেক সিপিএম গুণ্ডা।

তার মধ্যেই কানে এল পরপর কয়েকটা গুলির আওয়াজ। বাইরে থেকে তখনও চেষ্টা হচ্ছে গাড়িটাকে উল্টে দেওয়ার। আমার সারা শরীরে কাচের গুঁড়ো। চোখের মধ্যেও কাচের গুঁড়ো ঢুকে গিয়েছে। কিন্তু তখনও বিমান'দাকে

বলছিলাম, "গাড়ি স্টার্ট করবেন না! দেখি, ওরা কত মারতে পারে!"

তার পরেই আমায় লক্ষ্য করে গুলি চলল। কিন্তু ঈশ্বর অন্যরকম ভেবেছিলেন। সেই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পথচারী এক মুসলিম যুবক আখতারের হাতের তালু ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। বিমান'দা তখন গাড়ি স্টার্ট করতে মরিয়া। কোনোমতে গুলিবৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি স্টার্ট হল। সোজা হাসপাতালে।

পরে জেনেছি, প্রশাসনের মারফত আগেই আমার গার্ডেনরিচ যাওয়ার খবর পেয়ে গিয়েছিল ওরা। সেইমতো আমার উপর হামলার ব্লু-প্রিন্টও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রাণে বাঁচলাম। কিন্তু আমার আজাদের বাড়ি যাওয়া হল না। আজাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের চিহ্নগুলো দেখা হল না। আমাদের উপর হামলার বিষয়ে এফআইআরে যাকে একনম্বর অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হল, উল্টে তার বাড়িতেই বসল পুলিশি প্রহরা।

রাজারহাট থানায় পরপর তিনটে লক-আপে মৃত্যুর ঘটনা ঘটার পর আমি দলীয় কয়েকজন সহকর্মীর অনুরোধে রাজারহাটে সভা করতে যাই। মৃতদের মধ্যে একজন ছিল মানোয়ার আলি। ওর মৃতদেহের ছবি খুঁটিয়ে দেখে বুঝলাম, হাত-পায়ের নখ টেনে তুলে দেওয়ার স্পষ্ট চিহ্ন। হাত-পায়ের আঙুল এবং পায়ের চেটো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় অজস্র কালো কালো দাগ। পুলিশের বক্তব্য, মানোয়ারের দোকানে নাকি লক্ষ টাকার চোরাই মাল পাওয়া গিয়েছিল।

এমন একটার পর একটা ঘটনা আমায় ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু একটা করার তাগিদ অনুভব করছিলাম। সেই শুরু হল মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী—কেউ বলতে পারেননি, ওই আন্দোলন অসঙ্গত বা অযৌক্তিক ছিল। জানতাম, মুখ্যমন্ত্রীর তরফে কোনো সদর্থক জবাব মিলবে না। কিন্তু তা-ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে জানিয়ে রাখা হল। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন জ্ঞান সিংহ সোহনপাল সৌগত রায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ অধিকারী, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সহ বিধায়করা। আমাদের দাবি ছিল, সর্বস্বান্ত পরিবারগুলোর জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ। একটা চাকরি অথবা পরিবার পিছু দেড়হাজার টাকা করে মাসিক পেনশন।

আমাদের ধরনা যে টানা ২১ দিন চলবে, তা আমি নিজেও ভাবিনি। সুদীপদা'কে মঞ্চ বানিয়ে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। ধর্মতলায় তৈরি হল মঞ্চ।

অভিভাবকের মতো পাশে দাঁড়ালেন সুদীপ'দা। দলীয় সহকর্মীরা তো ছিলেনই, বহু অরাজনৈতিক সংগঠনও ছিল। ছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফুলরেণু গুহ, প্রবীণ বামপন্থী নেতা মনোরঞ্জন হাজরা। যাঁরা ধরনামঞ্চে এসে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সুব্রত'দাও বারবার আসতেন ধরনামঞ্চে। ঝড়-জল-বৃষ্টিও আমাদের ঠেকাতে পারেনি। প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ আসতেন সাহস জোগাতে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ, তফসিলি জাতি-উপজাতি ভুক্ত মানুষ। ১৯৯৫ সালের ৬ নভেম্বর থেকে ধরনা শুরু হল। ১১ তারিখে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিবসে আমরা 'মানবাধিকার দিবস' পালন করলাম। ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট চত্বরে জুড়ে কাতারে কাতারে মানুষের বন্ধন এক নয়া দিগ্‌নির্দেশ দিয়েছিল আমাদের। ১৫ তারিখে বাংলা জুড়ে মোট সাতলক্ষ মানুষ আমাদের আন্দোলনের সমর্থনে শান্তিপূর্ণ ভাবে কারাবরণ করেছিলেন। ধরনা চলাকালীন একদিন দু'ঘণ্টার প্রতীকী অবরোধে সারা রাজ্যের জনজীবনের গতি ব্যাহত হয়েছিল। তার জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে কোনো সাড়া দেওয়া হচ্ছিল না। আমাদের ধরনা চলছিল। আর ধরনামঞ্চেই চলছিল জনতার দরবার। ধরনামঞ্চের দু'পাশে দুটো কাঠের পার্টিশন দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রেস কর্নার আর জনতার দরবার। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে চিঠি জমা পড়ত। সাধারণ মানুষ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার কথা লিখতেন। জনতার দরবারের দায়িত্ব ছিলেন কাউন্সিলার মালা রায়, তখন রাজ্য যুব কংগ্রেসে সম্পাদক (এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) মুকুল রায় প্রমুখ। প্রতিদিন সকাল ১০টায় দরবার খুলে যেত সাধারণ মানুষের জন্য। চিঠিপত্র নেওয়া হত। সন্ধেবেলায় সেই চিঠিগুলো পড়তাম। তারপর প্রয়োজনীয় নোট দিয়ে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিতাম। ঠিক করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত কাজগুলো আমি নিজে দেখব। রাজ্য সরকার সংক্রান্ত কাজ দেখবেন সুদীপ'দা। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত সমস্যা দেখবেন সৌগত'দা এবং শোভন'দা। আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলো পাঠিয়ে দিতাম কল্যাণ, সৌমিত্র পাল, আশিস গুহ, রাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত রাজ্য যুব কংগ্রেসের আইনজীবী সেলের কাছে। বিনা পারিশ্রমিকে মানুষকে আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য। জনতার দরবার চলাকালীনই ৯৯ শতাংশ চিঠির জবাব সরাসরি মানুষের

কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সামান্য কয়েকটা জবাব ঠিকানার অভাবে দিতে পারিনি। তার জন্যও আমি ক্ষমা চাইছি।

জনতার ভালোবাসা-আশীর্বাদে কী করে যে ২১টা দিন কেটে গিয়েছিল, বুঝতেও পারিনি। একটা রাতও ঘুমোইনি। একদিনও ভাত মুখে দিতে পারিনি। স্নান করতে যেতাম মঞ্চের উল্টোদিকে এনটিসি অফিসের বাথরুমে। তা-ও ওদের কর্মচারীরা পৌঁছোনর আগে। সেই ভোর ৬টায় গিয়ে।

তখন বিদেশমন্ত্রী প্রণব'দা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে ধরনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছিলেন, আমাদের দাবি ন্যায্য। সে দাবি মর্যাদা দিয়ে বিচার করা হবে। আমরা যেন ধরনা তুলে নিই। প্রণবদা'কে কখনওই অসম্মান করিনি। ২০ নভেম্বর আগে থেকেই ধরনামঞ্চের পাশে কর্মসূচি নেওয়া ছিল। সকাল থেকেই প্রণবদা'কে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে তাঁর কাছেই প্রণবদা'র প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী সব শুনে বলেছিলেন, "বিস্তারিত সব আমায় পাঠাও। দু'তিনদিনের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য জানাচ্ছি।"

সেদিনের সভায় প্রণবদা'র চিঠি পড়ে শোনালাম জনতাকে। ধরনা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে মতামত চাইলাম জনতার কাছেই। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আপসহীন জনতা হাত তুলে ধরনা তোলার বিপক্ষে রায় দিল। জনতার রায়ের মূল্য দিতেই হত। ঠিক করলাম, প্রণব'দা বিদেশ থেকে ফিরে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।

ধরনা চলাকালীন প্রায়ই কলকাতা পুলিশের কিছু কর্তাভজা অফিসার নিয়মিত আমাদের ধরনাকে খাটো করে মহাকরণে রিপোর্ট পাঠাতেন। আমি সে সব জানতাম। ১৮ নভেম্বর ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআইয়ের সমাবেশ হল। দেশের বহু রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। তাঁদের অনেকে কিন্তু আমাদের ধরনামঞ্চে এসে দেখে গিয়েছিলেন, কী হচ্ছে। সেদিন আমরা ব্রিগেড সমাবেশের জন্যই 'সৌজন্য দিবস' পালন করছিলাম। ধরনামঞ্চে সেদিন সভা হয়নি। মাইক বাজেনি। অথচ এ রাজ্যের ডিওয়াইএফআইয়ের বীরপুরুষরা আমাদের মঞ্চে সামনে দিয়ে মিছিল নিয়ে যেতে যেতে আমাদের পতাকা ছিঁড়ে পায়ের তলায় মাড়ালেন। আমায় এবং আমার মহিলা সহকর্মীদের লক্ষ্য করে

অশ্লীল, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করলেন।

প্রশাসনের কাছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ রিপোর্ট দিয়েছিল, ২০ তারিখ ধরনা উঠে যাবে। তা হয়নি।

২৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভুবনেশ চতুর্বেদী আমায় ফোনে জানানে, প্রধানমন্ত্রী আমাদের আন্দোলনের ব্যাপারে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। তিনি সমস্ত রাজ্যের হেফাজতমৃত্যু নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রীকে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন। তার ভিত্তিতে আমাদের দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। ভুবনেশজি'কে বললাম, স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস অত্যন্ত সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বার্তা তিনি আমাদের ফ্যাক্স করে পাঠালে জনতার সামনে আমরা তা বলতে পারব। নিন্দুকেরা যাতে না-বলতে পারে, আমরা ছল করে ধরনা তুলে নিয়েছি। ইতিমধ্যেই টানা ২০ দিন চলছে। দরকারে আরও চলতে পারে। কিন্তু আমরা ন্যায্য অধিকারের ন্যায্য সম্মান চাই।

ফ্যাক্স মারফতক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পৌঁছোল ধরনামঞ্চে। ২৬ নভেম্বর কয়েকহাজার মানুষের সামনে বক্তৃতা করতে উঠে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত প্রতিশ্রুতি (সরকারি পরিভাষায়, কমিটমেন্ট অফ অ্যাশিওরেন্স) দেখালাম। তারপর ধরনা তোলার ব্যাপারে জনতার মতামত চাইলাম। উপস্থিত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত তুলে ধরনা তোলার পক্ষে রায় দিল। আমি বললাম, "যদি একজনও চান, ধরনা চলুক। তিনি হাত তুলুন।" কিন্তু দেখলাম, সকলেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাচ্ছেন।

টানা ২১ দিনের সত্যাগ্রহ শেষ হল। ঘড়িতে তখন রাত ১২টা।

৪

অমর একুশে জুলাই

বহুদিন ধরেই সহকর্মীদের ইচ্ছে ছিল একটা ব্রিগেড সমাবেশ করার। কিন্তু ইচ্ছেটা বাস্তবায়িত করা যায়নি। সম্ভবও হচ্ছিল না। কংগ্রেস দীর্ঘদিন এ রাজ্যে ক্ষমতায় নেই। ইন্দিরা'জি-রাজীব'জির মতো বিপুল জনপ্রিয় নেতানেত্রীও চলে গিয়েছেন। কার নামে লোক আসবে? একটা ব্রিগেড সংগঠন করার অন্যতম বড় ঝুঁকি হল অর্থ। কোথায় পাব টাকা?

অনেক অনিশ্চয়তায় বহুদিন ভুগেছি। ১৯৯২ সালে আচমকাই একদিন এসপ্ল্যানেড ইস্টের এক সভা থেকে ব্রিগেড সমাবেশের কথা ঘোষণা করে দিলাম। জনতা দুলে উঠল। উচ্ছ্বসিত হল। সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে সহকর্মীদের উন্মাদনা আর উৎসাহের উপর নির্ভর করে, সাধারণ মানুষের ভালোবাসা সম্বল করে নেমে পড়লাম।

যখনই ব্রিগেডের পাশ দিয়ে যেতাম, ভাবতাম, ঐতিহাসিক ব্রিগেড ভরাতে পারব তো? আমাদের সভা শেষপর্যন্ত রসিকতার লক্ষ্য হবে না তো? সিপিএম তো বটেই, আমাদের কংগ্রেসেরও অনেকে ভেবেছিলেন, সভা ব্যর্থ হবে।

তখন অবশ্য আমরা সমস্ত শ্রমিক সংগঠন, কংগ্রেসের শাখা সংগঠন এবং অবশ্যই সাধারণ মানুষের তুমুল সহযোগিতা পেয়েছিলাম। দিল্লি থেকে প্রণব'দা, সন্তোষ'দা (তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব) সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ব্রিগেডে একমাত্র সন্তোষ'দাই দিল্লি থেকে আসতে পেরেছিলেন। তা-ও মূল সভা শেষের পর তিনি পৌঁছেছিলেন সভার মিছিলে মাঝপথে আটকে পড়ে। সন্তোষদা'কে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়বার সভার কাজ শুরু হয়েছিল।

ব্রিগেড সমাবেশের আগে গোটা কর্মসূচি নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনা

করেছিলাম। সমস্ত স্থানীয় সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলাম যার যার এলাকায় নিজের খরচে 'তোরণ' তৈরি করতে। মঞ্চ এবং মাইকের খরচ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন প্রণব'দা-সন্তোষ'দা। অত কম খরচে ব্রিগেড সমাবেশ করার কথা কল্পনাতীত।

সভার সাতদিন আগে থেকেই নানা মহল থেকে বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশিই সারা বাংলা জুড়ে আওয়াজও উঠেছিল— ব্রিগেড চলো। চারদিকে গণ-উন্মাদনা। একদিকে মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে সারা ব্রিগেড গ্রাউন্ড-সহ গোটা ময়দান এলাকাকে তেরঙা পতাকা দিয়ে সাজানো চলছে। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা, পোস্টার-লিফলেট বিলি, বাইরের জেলা থেকে আসা লোকজনের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং সেইসঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরে ঘুরে ব্রিগেডে আসার আবেদন করা— সমস্ত কিছুই সামলাতে হচ্ছিল। উৎসাহে নিজেই ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটছিলাম। কিন্তু মিটিংয়ের আগের দিন থেকেই শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। উদ্বেগ নিয়ে ছুটলাম ব্রিগেডে। কিন্তু ভরসা হারাইনি।

২৫ নভেম্বর সকাল হতেই দেখলাম, ঝকঝক করছে রোদ। আগেরদিনের বৃষ্টি কোথায় উধাও! তখনো চিন্তা— ব্রিগেড ভরবে তো?

বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ ব্রিগেডে পৌঁছলাম। সঙ্গে সিপিএমের হাতে নিদারুণ অত্যাচারিত মানুষেরা। তখন লোক হাজার পঞ্চাশেক। আস্তে আস্তে ভিড় বাড়তে লাগল। সারা বাংলার সমস্ত রাস্তাই মনে হচ্ছিল ব্রিগেড-মুখী। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ব্রিগেড উপচে পড়ল। চারদিকে জনজোয়ার। যেদিকে তাকাচ্ছি, মানুষ আর মানুষ। সেই উত্তাল জনসমুদ্র থেকে আওয়াজ উঠছে— 'বন্দেমাতরম'।

আবেগে-উত্তেজনায় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। ভাবছিলাম, এত মানুষ এসেছেন কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে। সিপিএমের হাতে মার খেতে খেতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। হারানোর কিছু নেই। ওঁরা সমাবেশের পর ফিরে যাবেন যে যার এলাকায়। কিন্তু সঙ্গে করে কী নিয়ে যাবেন? ওঁদের তো কোনো একটা 'বার্তা' দিতে হবে। যা বুকে নিয়ে ওঁরা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সিপিএমের সঙ্গে নতুন করে লড়াই শুরু করতে পারবেন।

মন্ত্রিত্বে থাকার জন্য বিবেকদংশন একটা ছিলই। ব্রিগেডের মঞ্চে দাঁড়িয়ে

ভাবলাম, বাংলার এত মানুষ যখন আমায় এত ভালোবাসেন, তখন মন্ত্রিত্বের জন্য দিল্লিতে থাকা মানে তাঁদের বিশ্বাস-ভালোবাসাকে অমর্যাদা করা। অত্যাচার কোন পর্যায়ে পৌঁছলে মানুষ ওই ভাবে প্রাণের টানে সিপিএমের 'মৃত্যুঘণ্টা' বাজাতে আসেন! বাংলার মানুষের চোখের জল, তাঁদের আর্তি হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ঠিক করলাম, আর নয়। পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে লড়াইয়ের আওয়াজ। মন্ত্রিত্বের শিকলে বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। বাংলায় থাকতে হবে।

সকলকে স্তম্ভিত করে মঞ্চে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা।

অনেকে খুশি হয়েছিলেন। আবার অনেকের খারাপও লেগেছিল। সন্তোষ'দা তখনো ব্রিগেডে এসে পৌঁছননি। তিনি সময়মতো পৌঁছলে বা আগে থেকে জানতে পারলে কখনোই ওই সিদ্ধান্ত নিতে বা ঘোষণা করতে দিতেন না। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে ওইভাবে আচমকা আমার ইস্তফা দেওয়া নিয়ে পরেও অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্তটা ছিল একান্তই আমার। তাই কৈফিয়ত দেওয়ার দায়টাও আমারই।

আসলে, মানুষকে কিছু দেওয়ার ছিল। জীবনে যা কিছু পেয়েছি, তার মূল প্রেরণা তো মানুষই। ফলে তাদের ঋণও তো শোধ করা উচিত। একটা প্রবল আবেগের ঝোড়ো হাওয়া বিবেককে এসে যেন বলে যাচ্ছিল, মানুষের মধ্যে নিজেকে সঁপে দিতে হলে আগে নিজে কিছু দিতে শিখতে হয়। কিন্তু দেওয়ার মতো আমার তো কিছু ছিল না। যে ভালোবাসা, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ আমি পেয়েছিলাম, তার কি কোনো প্রতিদান হয়? আমার মন্ত্রিত্বও তো সেই মানুষেরই দান। সেই মুহূর্তে দেওয়ার মতো সেটুকুই ছিল। তাই আমার মন্ত্রিত্বকেই মানুষের দরবারে অর্পণ করেছিলাম।

পাশাপাশি, নিজেকে পরীক্ষা করারও একটা দরকার ছিল। মুকুট পরা সহজ হতে পারে। কিন্তু ত্যাগ করা কত কঠিন? সত্যিই কি কঠিন? শুধু ক্ষমতা ভোগ করলেই তো হবে না। প্রয়োজনে কিছু ছাড়তেও শিখতে হয়। কোনো ক্ষমতাই তো মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী নয়। নিজস্বতা এবং মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যে নীতি-আদর্শ তৈরি হয়, সেটাই তার সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকে। অন্যকিছু নয়। ক্ষমতার বিলাসিতা ত্যাগ করে একেবারে

সাধারণ এক মানুষ হিসেবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা যায় কি না, সেটাও পরখ করে নেওয়ার দরকার ছিল। তাছাড়াও, ক্ষমতায় থাকার সময় যারা সর্বক্ষণের সঙ্গী, ক্ষমতা চলে গেলে তাদের ক-জনকে পাশে পাওয়া যায়, সেটাও পরীক্ষা করে নেওয়ার দরকার ছিল।

একদিকে বাংলার অর্থনৈতিক অবক্ষয়। অন্যদিকে খুন-সন্ত্রাস-অত্যাচার-নির্যাতন। অথচ কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন একটা শোচনীয় অবস্থায় মানুষের পাশে থাকতে গেলে তাদের সব সময়ের জন্য একজন রক্ষক প্রয়োজন। প্রয়োজন একজন পাহারাদারের। বাংলার মানুষের টানে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে আমি সেই পাহারাদারের ভূমিকাই বেছে নিয়েছিলাম।

ব্রিগেড মানুষের ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছিল। মিছিলের পর মিছিল আসছে। আসছে তো আসছেই। ভিড়ের চাপে মঞ্চের একটা অংশ ভেঙেই পড়ল। অগণিত মানুষ। মহিলা এবং শিশুদের দমবন্ধ অবস্থা। মনে হল, কোনো অঘটনা না ঘটে যায়! প্রবীণ বামপন্থী নেতা যতীন চক্রবর্তী মঞ্চের উপর একটা চেয়ারে বসেছিলেন। অবস্থা এমন পর্যায়ে গেল যে, একটা সময়ে দেখলাম যতীন'দা হারিয়ে গিয়েছেন। তাঁর চেয়ারটাও নেই। ক্রমশ ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়তে লাগল সাংস্কৃতিক মঞ্চ, নির্যাতিত মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট মঞ্চও। তখনো পুলিশের ওয়্যারলেসে খবর আসছে, শিয়ালদহ, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে তখনো মিছিল আসছে একের পর এক।

মনে হল, সভা করার অনেক সময় পাব ভবিষ্যতে। কিন্তু সভা শুনতে এসে লোকে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা যাবে, তা হতে পারে না। দ্রুত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। তার মধ্যেই শোনা গেল হুটারের আওয়াজ। সন্তোষ'দা আসছেন। মিছিলে আটকে পড়েছিলেন। সন্তোষ'দা এসে পৌঁছনোর আবার সভার কাজ শুরু করতে হল। তখনো মানুষের ঢল একটুও কমেনি। সন্তোষ'দা বক্তৃতা করলেন। তাঁর ভাষণের পর পাকাপাকিভাবে সভা শেষ হল। কিন্তু আমি চিন্তায় রইলাম—যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা ঠিকমতো বাড়িতে পৌঁছতে পারলেন তো?

মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা দেখে প্রশাসনের কর্তারা যে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলেন! রাইটার্সের সামনে দিয়ে সেদিন গাড়িতে, পায়ে হেঁটে লাখো মানুষ সভায় এসেছিলেন। মহাকরণ পাহারা দেওয়ার মতো লোকও সেখানে সেদিন

ছিল না। অথচ মানুষ কত শান্তি! লাখে লাখে যেমন এসেছিলেন, তেমনই ফিরে গিয়েছিলেন নিঃশব্দে। মনে হয়েছিল, এইভাবেই কোনোদিন নিঃশব্দ মানুষের অন্তরের উত্তাল রূপ অত্যাচারীর ক্ষমতা কেড়ে নেবে।

ব্রিগেডে সেদিন সত্যিই বামফ্রন্টের মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল। ঠিক করলাম, ওই মৃত্যুঘণ্টা বাজাতে হবে বাংলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে। আর সেই অভিযান শুরু হবে খোদ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্বাচনী কেন্দ্র সাতগাছিয়া থেকে। ১৯৯২ সালের ৫ ডিসেম্বর সাতগাছিয়ায় যে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছিলাম, তার আওয়াজই পঞ্চায়েত ভোটে এবং পরে বিধানসভা ভোটেও সিপিএমকে অন্তিম শয্যায় পাঠিয়েছিল।

আমাদের ব্রিগেডকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সিপিএমও ব্রিগেডে সমাবেশ করল। সরকারি ব্যয়ে। সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হল। ঠেলাওয়ালা, রিকশাওয়ালাদের লাইসেন্স কেড়ে নিয়ে তাদের সমাবেশে যেতে বাধ্য করা হল। গরিব মানুষের রেশনকার্ড রেশনদোকান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে জমা করা হল সিপিএমের লোকাল কমিটি অফিসে। সিপিএমের তল্পিবাহক পুলিশ-প্রশাসনের কিছু অফিসারও সমাবেশ সফল করার জন্য ময়দানে নেমে পড়লেন। শুনেছিলাম, কিছু স্তাবক পুলিশ অফিসার রাস্তায় লরি থামিয়ে জোর করে গরিব মানুষদের সেই লরিতে তুলে ব্রিগেডে পাঠিয়েছিলেন।

আমার সেদিন প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করার কথা। গাড়িতে যাচ্ছি। পাশ দিয়ে যাচ্ছে সিপিএমের মিছিল। কিছু মানুষ আমায় চিনতে পেরেছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, "দিদি, আমাদের জোর করে মিছিলে নিয়ে এসেছে। প্রাণের ভয়ে, পেটের দায়ে এসেছি। না গেলে আমাদের লাইসেন্স ফেরত দেবে না।"

বুঝলাম সিপিএমের সময় সত্যিই ফুরিয়ে এসেছে।

৬ ডিসেম্বর। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িকতার আগুন। শুরু হয়ে গেল ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। ৭ তারিখে বাংলা বন্‌ধ ডাকল কংগ্রেস এবং সিপিএম। সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে আমাদের মিছিল বেরোল। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে এসে আমরা শান্তিরক্ষার শপথ নিলাম। সভা শেষ করে কোনোক্রমে বাড়ি ফিরলাম। তখন একের পর এক ফোন আসতে শুরু করেছে। কখনও

গার্ডেনরিচ-মেটিয়াবুরুজ, কখনও তপসিয়া-ট্যাংরা, কখনও তিলজলা-বেকবাগান, কখনও পার্ক সার্কাস। মিনিটে মিনিটে ফোন আসছে। আর তাতে মানুষের আর্তনাদ। অফিসে আমি আর আমার দীর্ঘদিনের সাথী এবং সহকর্মী মানিক মজুমদার। মানিকের মতো এমন সৎ, বিশ্বাসী মানুষ মেলা ভার। অফিসের সমস্ত ভার ওর উপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এমনিতেই এখনও আমি রাতে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত মানিক বাড়ি ফেরে না। দাঙ্গার ক'দিন আমি সারারাত জেগে অফিসেই বসে থাকতাম। মানিকেরও বাড়ি যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না।

প্রতি সন্ধেবেলায় এলাকা এলাকায় টহল দিয়ে সমস্যা জানার চেষ্টা করতাম। দেখতাম, প্রশাসন কত অসহায়। কত মানুষ মরছে। আগুন লাগছে, লুঠ হচ্ছে। অথচ রাজ্যে যে একটা সরকার আছে, বোঝার উপায় নেই। যখন দেখলাম, রাজ্য প্রশাসনের কোনো ক্ষমতাই নেই দাঙ্গা থামানোর, সরাসরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শরদ পাওয়ারকে ফোন করে বললাম কলকাতায় সেনা নামাতে। আমার অফিসে তখন প্রিয়দা, দিলীপ বসে। প্রধানমন্ত্রীকেও সব ঘটনা জানালাম। যদি সেদিন কলকাতায় সেনা না-নামত, তা হলে বোধহয় শহরের দাঙ্গায় আগুন আদৌ নিভত না।

এর মধ্যেই একদিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। অনুরোধ করলাম, যাতে ওই সঙ্কটের সময় মতপার্থক্য ভুলে সকলে একসঙ্গে কাজ করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি। ওঁর কাছেই শুনলাম, দাঙ্গার ব্যাপারে লালবাজার এবং মহাকরণে বিশেষ 'সেল' খোলা হয়েছে। কোনো খবর থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জানাতে হবে। তারপর যখনই কোথাও কোনো গোলমালের খবর পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে জানিয়েছি। এখনও মনে আছে, একদিন লালবাজারে তিন-চারবার ধরে ফোন করে যাচ্ছি। কোনো একটা এলাকায় দারুণ গণ্ডগোল হচ্ছিল। সেই 'সেল' থেকে কী জবাব পেয়েছিলাম জানেন? বিরক্ত গলায় ডিউটি অফিসার বলেছিলেন, "আরে দাঙ্গায় তো লোক মরেই। আপনি অযথা আমাদের বারবার বিরক্ত করছেন কেন?"

দাঙ্গার সময় কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন। কত পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। ঘুরে ঘুরে সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করে দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের জন্য স্টোভ-ত্রিপল-

হ্যারিকেন-বাসন-জামাকাপড়-শুকনো খাবার-ওষুধের ব্যবস্থা করেছিলাম। যদিও জানতাম, প্রয়োজনের তুলনায় সেটা খুব সামান্যই ছিল। কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারিনি। কিন্তু কলকাতায় যারা দাঙ্গা করল, সাম্প্রদায়িকতায় বিষবাষ্পে ভরিয়ে দিল আকাশবাতাস, তাদের কোনো শাস্তি হল না।

আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবন ফিরে এল শহরে। সম্প্রীতির জন্য বিভিন্ন সংগঠনের অক্লান্ত প্রয়াস জারি থাকতে থাকতেই এসে পড়ল ৭ জানুয়ারি। যেদিনের পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জ্যোতি বসু যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন মহাকরণে ঢুকব না। ওঁর মুখদর্শনও করব না। মনে মনে বলেছিলাম, জনতার রায়ে যেদিন পারব, সেদিনই মহাকরণে ঢুকব।

নদীয়া থেকে বেশ কিছুদিন ধরেই ফেলানি বসাক নামে এক মহিলা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। তাঁর ১৪ বছরের মূক-বধির কন্যা দীপালির নারীত্ব লুণ্ঠিত হয়েছে সিপিএমের এক কমরেডের হাতে। যার পরিণতিতে দীপালি তখন অন্তঃসত্ত্বা। মূক মেয়েটি কাউকে বলতে পারেনি তার দুর্ভাগ্যের কথা। মা যখন বুঝেছেন, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কালক্ষেপ না-করে তিনি ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তখন সপরিবারে গঙ্গাসাগরে ছুটি কাটাচ্ছেন। ফিরবেন ৭ জানুয়ারি।

তার আগে অন্তত বারদশেক তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম, সমস্ত ঘটনা গিয়ে ওঁকে জানিয়ে অপরাধীর শাস্তি চাইব। তখনও আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মাত্রই দু'মিনিট সময় চেয়েছিলাম। মহাকরণ থেকে কষ্টেসৃষ্টে বলা হয়েছিল, "আপনি আসুন। যদি মুখ্যমন্ত্রী আসেন, তা হলে দেখা করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।"

ভাবলাম, যদি সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মহাকরণে না-আসেন, তা হলে বিধায়ক শোভনদেব'দা অসহায় মা এবং মেয়েকে নিয়ে মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করে সবকিছু জানিয়ে বিহিত চাইবেন। বেলা তিনটে নাগাদ মহাকরণে পৌঁছোলাম। শোভন'দাকে বললাম, "আমি প্রেস কর্নারে বসছি। আপনি মুখ্যমন্ত্রীর পিএ অথবা সিএ-কে জানান, আমরা এসেছি। তাঁরা যেন দয়া করে একটু সময় দেন।" শোভন'দা ফিরে এসে বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত অভব্য ব্যবহার করেছেন। ভাবা যায়, একজন বিধায়ক মহাকরণে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে অপমানিত হচ্ছেন। শোভন'দাকে বললাম,

"আমরা তো নিজেদের প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আসিনি। একটি অসহায় মেয়েকে নিয়ে বিচার চাইতে এসেছি। আমি প্রেস কর্নারে বসছি। আপনি হতভাগ্য মা-মেয়েকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনে বসে প্রতিবাদ জানান।"

তখনও পর্যন্ত ভাবিনি, পরিস্থিতি এমনদিকে যাবে যে, আমাকেই বাধ্য হতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের দিকে যেতে। হঠাৎ খবর এল, বিশাল পুলিশবাহিনী এসেছে মা এবং মেয়েকে ওখান থেকে জোর করে সরিয়ে দিতে। কারণ সত্যিটা তো ধামাচাপা দিতে হবে। শুনে আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বোবা, নিরপরাধ, অন্তঃসত্ত্বা একটি মেয়ে বিচার চাইতে এসে খোদ মহাকরণে লাঞ্ছিতা হবে, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? ছুটে গেলাম। পুলিশকে বললাম, "আপনাদের কি সামান্য লজ্জা, আত্মসম্মান বোধ বলে কিছু নেই? আমি তো আপনাদের জানিয়েই এখানে এসেছি। কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী আমাদের স্রেফ দুটো মিনিট সময় দিতে পারছেন না? ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁর কাছে 'বাজে মেয়ে' হতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে মানবিকতা বলেও তো একটা জিনিস আছে!"

তখনই দেখলাম, একজন পুলিশ অফিসার ছুটতে ছুটতে আসছেন। তিনি বললেন, "ম্যাডাম, আপনি অপেক্ষা করুন। সিএম এসে গিয়েছেন। আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

বলতে বলতেই দেখলাম, আমাদের সামনে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সটান হেঁটে ঘরে ঢুকলেন। সেদিন যদি মহাকরণের অলিন্দে তাঁর পথ আটকাতে চাইতাম, অনায়াসে পারতাম। কিন্তু আমরা তা চাইনি। বরং ভেবেছিলাম, এত বড় একটা ঘটনা। মহাকরণ উত্তাল। আমায় সময় না-দিলেও মুখ্যমন্ত্রী মেয়েটি এবং তার মা'কে ডেকে নিয়ে তাদের অভিযোগ শুনবেন।

ভুল ভেবেছিলাম।

মুখ্যমন্ত্রীর পিছু পিছু তাঁর ঘরে ঢুকলেন আরও কয়েকজন। সেই বুদ্ধিজীবীরা গোটা বিষয়টা একটু অন্যভাবে সাজিয়ে ফেললেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে নির্দেশ এল, আমাদের যেন মহাকরণ থেকে বাইরে বার করে দেওয়া হয়। শুরু হল পুলিশি অ্যাকশন। মহাকরণে কর্তব্যরত পুলিশবাহিনী আর কলকাতা পুলিশের গুণ্ডাদমন শাখার কিছু স্তাবক অফিসার একযোগে আমাদের মারতে মারতে, টেনেহিঁচড়ে দোতলা থেকে একতলায় নামিয়ে আনলেন। ঘটনার ছবি এবং

খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচণ্ড মার খেলেন সাংবাদিক-আলোকচিত্রীরা। কয়েকজনের ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হল। অনেক সরকারি কর্মচারীও আহত হলেন। আমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে।

সেন্ট্রাল লক-আপে এসে টের পেলাম, হাতে আর পেটে প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছে। পুলিশরা আমার হাতটা মুচড়ে দিয়েছিল। লাথি মেরেছিল পেটে। অসহায় দীপালি তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর চিকিৎসার জন্য লক-আপ থেকেই যোগাযোগ করলাম রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। সেখানকার মহারাজরা ওকে নিয়ে গেলেন। যাঁরা বিনা অর্থে সেবা করে ওকে সারিয়ে তুলেছিলেন। আমরা রয়ে গেলাম লালবাজারে। তখনও সেখানে আমাদের সঙ্গে কেউ কিন্তু খারাপ ব্যবহার করেনি। যদিও ঘটনার প্রতিবাদে আমরা লক-আপের মধ্যেই অনশন শুরু করেছিলাম। ওইভাবে রাত ১২টা বাজল। ভাবলাম, অত রাতে আর কেউ বিরক্ত করবে না। আমি তিন-চারজন সহকর্মীকে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

সাড়ে ১২টা নাগাদ শুনলাম দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। বললাম, "এত রাতে বিরক্ত করছেন কেন? আমরা আপনাদের বিশ্বাস করি না। দরজা খোলা হবে না।"

শেষপর্যন্ত এক অফিসারের গলা পেলাম, যিনি বিবেকবান। মূল্যবোধ আছে এবং আপাদমস্তক ভদ্রলোক। বাধ্য হয়ে দরজা খুলতে হল। সেই অফিসার হাত জোড় করে বললেন, "দিদি, আমায় ক্ষমা করবেন। কথা দিয়েছিলাম, রাতে আপনাকে আর বিরক্ত করব না। কিন্তু আমি অপারগ। উপর থেকে নির্দেশ এসেছে, যেমন করেই হোক, রাতের মধ্যেই আপনাদের লালবাজার থেকে বার করে দিতে হবে। এই অন্যায় আমার দ্বারা হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।"

তার পরেই একদল পুলিশ এল। মদ্যপ অবস্থায়। আমাদের হাত ধরে টানাটানি শুরু করল তারা। সম্মান বাঁচাতে কোনোক্রমে লক-আপ থেকে বেরিয়ে লালবাজারের গেটের সামনেই বসে পড়লাম প্রতিবাদ জানাতে। রাত তখন প্রায় ১টা। উঁচুতলার পুলিশ অফিসাররা অবস্থান ভাঙতে লাঠি-গুলি চালানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নিচুতলার পুলিশের একটা অংশ বলল, তারা তা করতে পারবে না। ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে সিপিএমের নন-গেজেটেড

পুলিশরা। তারা নেমে পড়ল আসরে। প্রচণ্ড মার শুরু হল। মহিলা সহকর্মীদের মাথা ফাটল। ওরা জানত, আমার মাথায় বড় চোট। তাই আমার মাথাও টার্গেট করা হল। দুই সহকর্মী সেদিন ওদের লাঠির সামনে শরীর এগিয়ে দিয়ে আমায় রক্ষা না করলে বড় বিপদ ঘটতে পারত। কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী পুলিশ তার মধ্যেও খবর পাঠাল, "দিদি, আপনাকে ওরা মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে। এখান থেকে এখনই চলে যান প্লিজ।"

বাইরে অপেক্ষমান সংবাদমাধ্যম তখন চরম উৎকণ্ঠায়। ভেবে দেখলাম, একদল মদ্যপ পুলিশের কাছে ভদ্রতা আশা করা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে লালবাজার থেকে বেরিয়ে এলাম। মেয়ো রোড পর্যন্ত তাড়া করে এল পুলিশ। মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম—জ্যোতি বসুর মতো দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী যতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন, ততদিন তাঁর মুখদর্শন করব না। মহাকরণেও ঢুকব না।

এই ঘটনার পরদিন অনেকেই চেয়েছিলেন বাংলা বন্‌ধ ডেকে জনজীবন স্তব্ধ করে দিতে। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে আমিই তাঁদের বারণ করেছিলাম। ৭ জানুয়ারির ঘটনা বিস্তারিতভাবে কাগজে বেরোনর পর রাইটার্সের পুরনো প্রেস কর্নারটা ভেঙে, গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। সাংবাদিকদের অবাধ গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেন বাম সরকারের তৎকালীন 'মেজোবাবু'। তিনি তখন তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী।

ওই ঘটনায় আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। তখন আমাদের সরকার কেন্দ্রে সংখ্যালঘু। কিন্তু দলের তরফে একটা ন্যূনতম প্রতীকী প্রতিবাদের দরকার ছিল। হয়তো সরকার বাঁচাতে গিয়ে সেটা করা হয়নি। আমি নিজেও বেশি কিছু আশা করিনি অবশ্য। কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফোন করে আমার খোঁজ নিয়েছিলেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সদস্য আমায় দেখতে আসতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলাম, "অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।" ১৮ জানুয়ারি মন্ত্রিত্ব থেকে আমার ইস্তফা আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়ে গেল। আমিও বন্ধন-মুক্ত হয়ে গেলাম। আন্দোলনের ফসল আমি। পথেই নামলাম আবার।

প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি চালু, নতুন শিল্পস্থাপন, বেকার সমস্যার, সমাধান, নিরপেক্ষ প্রশাসনের দাবি ছিলই। ঠিক হল, যুব কংগ্রেসের তরফে

'মহাকরণ অবরোধ' হবে। ইস্যু—সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া ভোট হবে না. নো আইডেন্টিটি কার্ড, নো ভোট! প্রথম ঠিক ছিল, কর্মসূচি হবে ১৪ জুলাই। তার পর প্রাক্তন রাজ্যপাল নুরুল হাসানের মৃত্যুর জন্য তা পিছিয়ে করা হল ২১ জুলাই।

ঠিক হল, আমরা মোট পাঁচটা জায়গা থেকে মহাকরণ অবরোধ করব। তার অনেক আগে থেকেই জেলা জেলায় ঘুরে ঘুরে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলাম। সহকর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য তাদের সঙ্গে বারবার আলোচনা করেছিলাম। জেলাগুলো থেকে কর্মসূচি নিয়ে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম। কিন্তু সরকারের কাছেও জেলা প্রশাসন থেকে সেই খবর পৌঁছেছিল। আমাদের আন্দোলন বানচাল করার জন্য ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হল। ১৯ জুলাই সমস্ত জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশসুপারদের ডেকে পাঠানো হল মহাকরণে। তাঁদের হাতে গোপন সার্কুলার ধরিয়ে বলা হল, কোনো অবস্থাতেই যেন লাখ লাখ মানুষ সেদিন কলকাতায় ঢুকতে না-পারেন। কোনো গাড়ি বা লরি নিয়ে যাতে মানুষ আসতে পারেন, তার দিকেও নজর রাখতে বলা হল।

কিন্তু খবরটা আমাদের কানেও পৌঁছোল। শুনেই ফোনে ধরলাম রাজ্যপুলিশের ডিজি এবং মুখ্যসচিবকে বললাম, "আপনারা জানেন আমাদের এই আন্দোলন মানুষের স্বার্থে। আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েও আমরা সে কথা আপনাদের জানিয়েছি। মহাকরণ অবরোধ মানে তো আর জোর করে রাইটার্স দখল করা নয়। আমরা পাঁচটা জায়গায় জমায়েত হয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাব। কোন অধিকারে আপনারা এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন?"

উত্তরে দু'জনেই বললেন; "ম্যাডাম, আমাদের কিছু করার নেই। সরকারের নির্দেশ। আমাদের সেটা মানতেই হবে।"

২০ তারিখ সকাল থেকেই বিভিন্ন এলাকায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-কর্মীদের ভয় দেখানো শুরু হল। কর্মসূচি ঘিরে যাতে কোনো অশান্তি না-হয়, সে জন্য আমার তরফে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই দিনটা যে ভাবে শেষ হয়েছিল, তার করুণ সুর আমি আমৃত্যু বয়ে বেড়াব নিজের বুকে।

বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গিয়েছিলাম মেয়ো রোডের মোড়ে। তখনই সেখানে লাখো মানুষের ভিড়। ছেলেরা অত্যন্ত

উত্তেজিত। কী হয়েছে, জানতে চাওয়ায় বলল, তার খনিকক্ষণ আগেই পুলিশ মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনে হল, বিস্ফোরণের আকার নেওয়ার আগে ওই উত্তেজনা সামলাতে হবে। সকলকে শান্ত হয়ে বসে পড়তে বললাম। একটা ম্যাটাডরের উপর পতাকা আর মাইক বেঁধে সভার কাজ চলছিল। পুলিশকে অনুরোধ করলাম, একটু সরে দাঁড়াতে। যাতে ছেলেরা রাস্তায় বসার জায়গাটুকু পায়। কেন জানি না, সেদিন সকাল থেকেই পুলিশ একটু অন্যরকম মেজাজে ছিল। তারা আমার অনুরোধে কান দিল না। শোভন'দাকে বললাম, "আপনি শান্তিপূর্ণভাবে সভা চালিয়ে যান। আমি ব্রেবোর্ন রোড থেকে ঘুরে আসছি।" স্কুটারে চেপে চললাম ব্রেবোর্ন রোডের দিকে।

মহাকরণের সামনে দেখা হল সৌগত'দার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গেই একদল কর্মী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে হেঁটে আসছেন। সৌগতদা'র থেকেই শুনলাম, ব্রেবোর্ন রোডে লক্ষাধিক মানুষ রয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাদের উপর যথেচ্ছ লাঠি চালিয়েছে। মঞ্চে উঠে আমাদের নেতাদেরও পিটিয়েছে। আমাদের বক্তব্য যাতে জনতার কাছে না পৌঁছোয়, তার জন্য মাইকের তারও কেটে দিয়েছে। মহাকরণের পাশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন ব্রেবোর্ন রোডে পৌঁছোলাম, চারদিকে শুধু মানুষ। বিভিন্ন রাস্তায় কংগ্রেসকর্মীদের গতিরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু ওই জনসমুদ্র কি ওই ভাবে আটকানো যায়?

আমায় পৌঁছোতে দেখেই মঞ্চের ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির ছাদ থেকে সিপিএমের ক্যাডাররা ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করল। পুলিশ সেদিক ভ্রূক্ষেপ না-করে উল্টে আমাদের ছেলেদের দিকেই লাঠি উঁচিয়ে, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে তেড়ে এল। মাইক ছাড়া খালি গলায় কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। তার মধ্যেই পুলিশ দৌড়ে মঞ্চে উঠল। তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল আমার কোমরে। অন্য একদল পুলিশ তখন মঞ্চ লক্ষ্য করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া শুরু করেছে। আমার সহকর্মীরা আমায় প্রায় জোর করেই মঞ্চ থেকে নামিয়ে আনল। কোনোমতে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোমরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। কাউন্সিলার হৃদয়ানন্দ গুপ্ত চেষ্টা করছিলেন আমায় সরিয়ে নিয়ে যেতে। আচমকাই দুটো কাঁদানে গ্যাসের শেল এসে ফাটল আমার ঠিক পায়ের সামনে। পুলিশ তখন গুলি চালাতে তৈরি।

রাইফেলের নল সরাসরি আমার দিকে তাক করা। চিৎকার করে বললাম, "আমায় মেরে শান্তি পেলে মারুন! কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালাবেন না!"

রাইফেলের উদ্যত নল আমার দিকে দেখে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী মাইতিবাবু তাঁর সার্ভিস রিভলভার বার করে, চিৎকার করতে শুরু করলেন, "বাড়াবাড়ি হচ্ছে! এ বার কিন্তু আমি বাধ্য হব গুলি চালাতে!"

আশ্চর্য লেগেছিল সেদিন। এমনিতেই আমি বেশিরভাগ সময়েই কোনো নিরাপত্তা নিতাম না। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একটা পাঁচ-ছ'জনের টিম আমার পিছনে গাড়িতে ছিল। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মিস্টার বিশ্বাস। দেখলাম, পুলিশেরই লাঠিতে তাঁর চশমা ভেঙে চোখ আর কপালের কাছে কেটে গিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তিনি নির্বিকার। ক্রমাগত কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটছে। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়া। কিছু দেখা যাচ্ছে না। চোখে অন্ধকার দেখছি। শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। সেই অবস্থায় কোনোমতে একটা ট্রাফিক স্ট্যান্ডের উপর বসে পড়লাম।

সিপিএমের বাছাই ক্যাডারদের সেদিন আমাদের পেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা আমার চারপাশে ঘিরে-থাকা সহকর্মীদের বেধড়ক পেটাতে শুরু করল। মারের চোটে সৌগত'দার কাঁধের হাড়ে কালশিটে পড়ে গেল। পুলিশ আবার তেড়ে এল আমাদের মারতে। তখন জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ চলছে চারদিকে। কিন্তু পুলিশকে বাধা দিলেন কয়েকজন মহিলা পুলিশ। তাঁদের বাধায় পুলিশবাহিনী হটে গেল খানিকটা।

খবর এল, স্ট্র্যান্ড রোডে অসংখ্য মানুষের জমায়েতে সভা চলছে। বউবাজারেও সভা চলছে। ধর্মতলায়ও প্রচুর জমায়েত। কিন্তু মেয়ো রোডে নাকি পুলিশ গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে মেরে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম, মেয়ো রোডে পৌঁছোতে হবে। ওখানকার ঘটনা ব্রেবোর্ন রোডে চাউর হয়ে গেলে এখানেও উত্তেজনা মাত্রা ছাড়াবে। রক্তগঙ্গা বইবে। তার চেয়ে আমি চলে গেলে যদি মানুষ বাঁচে।

কোমরের চোটের জন্য ভালো করে দাঁড়াতেও পারছিলাম না। কোনোমতে একটা গাড়িতে সহকর্মীদের কোলে শুয়ে রওনা হলাম। মেয়ো রোডের কাছাকাছি আসতেই দেখলাম পুলিশের একটা অ্যাম্বাসেডর। অনবরত গুলি

চলছে। কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটছে। মানুষ কিন্তু পালায়নি। অনুরোধ করলাম, আমায় ওখানে নামিয়ে দিতে। কিন্তু পুলিশের গাড়িটা আমায় অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। সহকর্মী গৌতম বসু স্টিয়ারিং চেপে ধরে গাড়িটা দাঁড় করায়। ঠিক তখনই পিছন থেকে অন্য একটা পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের গাড়িতে প্রচণ্ড জোরে একটা ধাক্কা মারল। আমাদের গাড়ির দরজাটা খুলে গেল এক ঝটকায়। আর ওই গাড়ির দরজাটা এসে সোজা ধাক্কা মারল আমার এলিয়ে-পড়া শরীরে। তারপর আর কিছু দেখতে পেলাম না। চোখের সামনে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে গেল।

জ্ঞান এল হাসপাতালে। চারদিকে অক্সিজেন, স্যালাইন, ডাক্তার। জানতেও পারিনি, কত রাউন্ড গুলি চলেছিল। কত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরে সহকর্মীদের থেকে যা শুনেছিলাম, বীভৎসতায় তা সমস্ত ঘটনাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। লাঠি-পাইপগান-রাইফেল-ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশ-সিপিএমের যৌথ সন্ত্রাস চলেছিল সেদিন। আনুমানিক ৫০০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের উপর বিনা প্ররোচনায় ঘোড়সওয়ার পুলিশের বাহিনী উঠে এসেছিল। আমি কৃতজ্ঞ ময়দানের ক্লাবগুলোর কাছে। তারা তখন আর্ত মানুষগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল। তৃষ্ণার্ত মানুষকে খাওয়ার জল দিয়েছিল। বিপন্ন মানুষগুলোর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহায্যের হাত।

কলকাতার রাস্তায় তখন নিহত-আহতের সংখ্যা বাড়ছে। কলকাতা পুলিশের বড়কর্তা তাঁর বাহিনীর কৃতিত্বে গর্বিত। আমাদের সহকর্মীরাই এক এক করে আক্রান্তদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন। শুধু কলকাতার হাসপাতালগুলোতেই ২০০-র বেশি মানুষ ভর্তি হয়েছিলেন। আর জেলা হাসপাতালগুলোয় যে কত মানুষ ভর্তি হয়েছিলেন, তার তো কোনো লেখাজোখা ছিল না। কিন্তু যুব কংগ্রেসের সংগ্রামী বন্ধুরা ওই বিপদের মধ্যেও নিহত-আহত সহকর্মীদের ফেলে পালাননি। রক্তের দরকারে তাঁরা রক্ত দিয়েছেন। রাতের পর রাত হাসপাতালে জেগে কাটিয়েছেন। আহত সহকর্মীদের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য, আশ্বাস আর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সেদিন অনেকেই ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছিলেন। তিন-চারজন মারা যান হাসপাতালে। পুলিশের গুলিতে মোট ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল কলকাতার রাজপথে। কিন্তু এতবড় ঘঠনার পরেও নির্লজ্জ বামফ্রন্ট সরকারের বিবেক

দংশন হল না। মৌখিক শোকপ্রকাশটুকুও করল না সরকার। নস্যাৎ করে দেওয়া হল বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি।

আমাদের আন্দোলন ছিল মানুষের হয়ে। মানুষের কথা বলার জন্য। প্রতিবাদের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তোলার চেষ্টায় সেদিন আহুতি হয়েছিল বাংলার যৌবনের। কিন্তু তারা বিচার পায়নি। মানবিক দিক থেকে সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরস্থান, যাঁরা নির্মমভাবে ১৩টি প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলেন, তাঁরাই বড় গলা করে প্রকাশ্য জনসভায় বলে বেড়াতে লাগলেন, ওই ১৩ জনের মৃত্যুর জন্য নাকি আমরাই দায়ী। তৎকালীন শাসকদলের এক তাত্ত্বিক নেতা ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলেন, "শহিদ পরিবারের লোকজন গিয়ে মমতার বাড়ি ঘেরাও করুন!"

আমি কৃতজ্ঞ সমাজের সেইসব বিশিষ্ট এবং প্রণম্য ব্যক্তিত্বের কাছে, যাঁরা সেই চরম দুঃসময়েও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মাথায় রেখেছিলেন আশীর্বাদের হাত। চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থাতেই তাঁদের অনুপ্রেরণায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সরকারি সাহায্য নয়, সাধারণ মানুষের থেকে সাহায্য নিয়েই শহিদদের অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়াব। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই '২১ জুলাই শহিদ স্মারক তহবিল' গঠনের খসড়া তৈরি করেছিলাম।

বিপদে-আপদে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যাঁর স্বভাব, সেই বরেণ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান করে ছ'জনের একটা কমিটিও তৈরি করলাম। যদিও তখনই সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ভয়ে বা ব্যক্তিগত স্বার্থে পিছিয়ে গেলেন। বাংলার সমস্ত সংবাদপত্রের মারফৎ সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করলাম—ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা চেক-এ তাঁদের সাহায্য একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা দিতে।

মানুষের সাড়া পেয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। ওই ছ'জনের কমিটিতে আমি ছিলাম না কোথাও। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি পরিবারের জন্য একলক্ষ করে মোট ১৩ লক্ষ টাকা তোলা। মানুষের আশীর্বাদে অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়াল ২০ লক্ষে। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বহু ড্রাফট এবং চেক এসেছিল। কিন্তু আমার সেগুলো গ্রহণ করতে পারিনি। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফেরত দিয়ে দিয়েছিলাম।

স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চার তাদের টিফিনের পয়সা জমিয়ে, বহু গৃহবধূ

তাঁদের সংসার-খরচের টাকা বাঁচিয়ে সেই তহবিলে দান করেছিলেন। বহু চাকুরিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা তাঁদের একদিনের রোজগার ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে শহিদদের স্মৃতি তর্পণ করেছিলেন।

একুশে জুলাই এখনও আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর দুঃখের দিন। শোকের দিন। কিন্তু পাশাপাশিই সমাজ এবং মানুষের সহমর্মী স্বরূপ জানারও দিন। যতদিন বাঁচব, মনে রাখব একুশে জুলাই। 'অমর একুশে'। এই বাংলার।

৫

জনসংযোগের পথে

একুশে জুলাইয়ের পর মাঝেমাঝেই স্বামী বিবেকানন্দের 'কল টু দ্য নেশন' পড়তাম। নতুন করে মনে জোর আনার জন্য। ভাবতাম, থেমে গেলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। কোনো পাওয়া বা না-পাওয়ার হিসেব কষলে চলবে না।

ঈশ্বরকে ডাকতাম আঘাত দাও আমায়। যত পারো আঘাত দাও। আঘাতে আঘাতে আমার মনটা দুমড়ে-মুচড়ে দাও। কিন্তু পাশাপাশিই দাও সমস্ত আঘাত জয় করার শক্তি। দুর্গাপুজো কেটে গেল। কেটে গেল কালীপুজো। তারপর সংসদের অধিবেশন। দিন বদলায়। মন পাল্টায়। নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। আমিও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। ঠিক করলাম, কলকাতা থেকে দূরে দূরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সেখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচিত হব। শুরু করব 'জনসংযোগ যাত্রা'। যাত্রা শুরু ১২ জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে।

১৯৯৪ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ি থেকে শুরু হল আমাদের যাত্রা। ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যার প্রথম পর্যায় শেষ। গান্ধীজির মৃত্যুদিন ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়।

জনসংযোগ যাত্রার অভিজ্ঞতা আমার রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে একটা বড় পাওয়া। কলকাতায় বসে যা কোনোদিনও সম্ভব হত না। সেই কর্মসূচির মাধ্যমেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলাম। তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাদের সমস্যার কথা জানতে পেরেছিলাম।

বেলপাহাড়ি জায়গাটা প্রায় বাংলা-ওড়িশার সীমান্তে। পুরো আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল। তখনও সেখানে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়নি। শুধুই সিপিএমের রাজত্ব। গরিব মানুষগুলোকে শোষণ করে যারা নিজেদের গদি ধরে রেখেছিল দিনের পর দিন। ১১ জানুয়ারি রাতেই সৌগত রায়, সাধন পান্ডে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং যুব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পৌঁছে গেলাম। পরদিন সকালে শুরু হবে যাত্রা। রাতেই যোগাযোগ করলাম স্থানীয় কংগ্রেস নেতা সুব্রত ভট্টাচার্যকে। বললাম, "কাল সকালে আমরা একটা আদিবাসী গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করতে চাই। দেখতে চাই, সেখানকার মানুষ কী ভাবে জীবনযাপন করেন। কোনো সরকারি সাহায্য পান কি না।" সুব্রতবাবু বললেন, একটা গ্রাম আছে দু'কিলোমিটার দূরে। কিন্তু একেবারে বনজঙ্গলে ঘেরা। দুর্গম। পাহাড়ের কোলে। সিদ্ধান্ত নিলাম, গাড়ি না-হলেও স্কুটারে করেই যতটা সম্ভব যাব। তারপর দরকারে পায়ে হেঁটে। পুলিশও তখন জানত না, আমরা কোথায় যাব। তারা আমাদের পিছন পিছনই আসছিল। তাদের চোখে ধুলো দিয়েই পৌঁছোলাম জোগ্রামে। প্রায় প্রতিটি ঘরের মা-ভাই-বোনেদের সঙ্গে কথা বললাম। সরকারি সাহায্য পান কি না, প্রশ্ন করায় তাঁরা বললেন, সরকারি সাহায্য বস্তুটা কী, তা-ই তাঁরা জানেন না।

মাটির দাওয়ায় বসে একজন কিছু একটা খাচ্ছিলেন। প্রশ্ন করায় জানালেন, বছরে ১২ মাস তাঁরা ভাত খেতে পান না। জঙ্গল থেকে গাছের মূল তুলে আনেন। আর আনেন পিঁপড়ে। তারপর সেগুলোকে সিদ্ধ করে গাছের মূল আর পিঁপড়ে দিয়ে একটা টক বানিয়ে খান।

দেখলাম, অনেকের গায়ে চাকা চাকা দাগ। কীসের দাগ ওগুলো?

বাসিন্দারা বললেন, "জঙ্গল থেকে আমরা যখন পিঁপড়ে ধরে আনতে যাই, তখন পিঁপড়ের কামড়ে এই দাগ হয়।"

হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের সরকার বাহাদুর কালাহান্ডি নিয়ে কত চিন্তিত! কিন্তু এই বাংলায় এখনও এমন মানুষ বাস করেন, যাঁরা গাছের মূল আর জংলি পিঁপড়ে সিদ্ধ খেয়ে বেঁচে থাকেন। পাছে কেউ ব্যাপারটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাই আমি গোটা অভিজ্ঞতাটা ডিভিওতে তুলে এনেছিলাম। পরে খবর পেয়েছিলাম ওখানকার জেলাশাসক গিয়ে গ্রামবাসীদের শাসিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা কেন আমার কাছে মন খুলে কথা বলেছেন। তার ফল

ভালো হবে না।

আমি যাওয়ার পর প্রশাসনের টনক হয়তো কিছুটা নড়েছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন তো থেকেই গিয়েছিল—ইন্দিরা আবাস যোজনা, জওহর রোজগার যোজনার মতো আদিবাসী কল্যাণমূলক প্রকল্পের টাকা থেকে কেন এইসব মানুষেরা বঞ্চিত? এঁরা কি রাজ্য সরকারের তরফে সামান্য সহানুভূতিও আশা করতে পারেন না? ফিরে এসে তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম গোটা ঘটনা।

জোগ্রাম থেকে ফিরে এসেছিলাম বেলপাহাড়ি। সেখানকার আদিবাসী মানুষ মাদল, ধামসা বাজিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মনপ্রাণ দিয়ে আমাদের সভায় উপস্থিত হয়ে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বেলপাহাড়ি থেকে শিলদা—গোটা রাস্তা জনসমুদ্র। স্কুলের বাচ্চা থেকে গৃহবধূ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। তাঁরা আমার বক্তব্য শুনতে চান সাগ্রহে। বললাম। ঝাড়গ্রাম মহকুমার আদিবাসী মানুষদের দীর্ঘদিনের দাবি, নির্বাচিত স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে এলাকার কল্যাণমূলক কাজ আদিবাসীদের দিয়েই করাতে হবে। আমরা সেই দাবিকে জোরাল সমর্থন জানালাম।

শিলদা থেকে গেলাম বিনপুর। শুনলাম, তৎকালীন শাসকদলের মদতপুষ্ট লোকেরা পুলিশের পোশাক পরে 'সমান্তরাল প্রশাসন' চালায়। অত্যাচারিত মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না। খুনোখুনি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিবাদ করতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত। সেই অত্যাচারের কাহিনি শুনে পা বাড়ালাম ঝাড়গ্রামের পথে। শহরে ঢোকার আগে গাড়ির গতি ক্রমশই কমে আসছিল জনজোয়ারে। অসংখ্য মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাদের কর্মসূচিকে আশীর্বাদ জানাতে। সমর্থন করতে। পনেরো মিনিটের রাস্তা পার হতে লেগে গেল প্রায় দেড়ঘণ্টা। পৌঁছোলাম ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির মাঠের জনসভায়। আদিবাসী মেয়েরা আমাদের বরণ করে নিলেন তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তায়। ভিড় ঠেলে কোনোক্রমে মঞ্চে উঠলাম।

অনেক সভায় বক্তৃতা করেছি। কিন্তু সেদিন মনে হচ্ছিল শালবন-পরিবেষ্টিত মাঠটায় আর তিলধারণের জায়গা নেই। মানুষ আর মানুষ। শুধু কালো কালো মাথার ভিড়। সভা হল। সকাল থেকে মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে ঝাড়গ্রামে এসে শুধু এককাপ চা খেয়েছিলাম।

ঝাড়গ্রাম থেকে বেরিয়ে বহু দুর্গম, ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে গেলাম রোহিণীতে। রোহিণী থেকে কেশিয়াড়ি। যেখানে সিপিএমের অত্যাচার মানুষের নিত্যসঙ্গী। সভা ছিল সন্ধে ৬টায়। পথের ভিড় ঠেলে আমরা গিয়ে পৌঁছোলাম রাত ১১টায়। কিন্তু একজন মানুষও নড়েননি। দেরির জন্য খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছিলাম মানুষের ধৈর্য দেখে। জনসংযোগ যাত্রা বেরিয়ে কখনও সভা করেছি রাত ১টায়। কখনও রাত দুটোয়। কিন্তু মানুষ কখনও আমাদের বিমুখ করেননি। দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। অজস্র সভা। অসংখ্য মানুষ।

গড়বেতা, চন্দ্রকোনা, শালবনি, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, উত্তর কাঁথি, এগরা, খেজুরি, মুগবেড়িয়া, ভগবানপুর, পটাশপুর পেরিয়ে পৌঁছোলাম পিংলা। যেখানে তৎকালীন শাসকদলের অত্যাচার সভ্যতার সীমাটুকুও লঙ্ঘন করে গিয়েছিল। নির্যাতিতা মা-ভাই-বোনেরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শোনালেন অত্যাচারের কাহিনি। জায়গাগুলো ঘুরে দেখেছিলাম। আমাদের সঙ্গে একটা জিপ ছিল। সভার দিকে এগোচ্ছি আর জিপে লাগানো মাইক থেকে ভেসে আসছে, 'আমার সোনার বাংলা...'। দেখলাম, লক্ষাধিক মানুষ সেই গানের সুরে আবেগবিহ্বল হয়ে চলেছেন সভার দিকে। আমাদের সঙ্গেই। ময়নায় বিশাল জনসভা হল। পথে আরও কয়েকটা সভা সেরে ফিরে এলাম কোলাঘাটে। পরদিন আবার সভা করলাম ডেবরা, খড়গপুর, বেলদা, নারায়ণগড়, নন্দনপুর ঘাটাল, চন্দ্রকোনায়।

জেলার নেতারা আমাকে না-জানিয়েই তাঁদের খুশিমতো নির্দিষ্ট কর্মসূচির বাইরেও বাড়তি অনেক সভার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই সর্বত্র সময়মতো গিয়ে উঠতেও পারিনি। অনেক জায়গায় হয়তো পারিনি। আমি যদি কখনও কোনো বিশেষ কাজে আটকে পড়ি, তা হলে আগে থেকেই উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দিই সে কথা। কথা দিয়ে না-রাখতে পারাটা আমি বরাবর অপছন্দ করি। যাঁরা আমার নাম প্রচার করে সভার আয়োজন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, তাঁদেরও পছন্দ করি না। অথচ পথের মাঝে মঞ্চ বেঁধে, মাইক লাগিয়ে আমায় অনেকবার বাধ্য করা হয়েছে বক্তৃতা দিতে।

টানা ছ'দিন মেদিনীপুরে জনসংযোগ যাত্রা শেষ করে কামারপুকুর দিয়ে ছুটলাম হুগলিতে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর এক পবিত্র

পীঠস্থান। আমাদের কর্মসূচি শুরু হয়েছিল হুগলির সবচেয়ে অত্যাচারিত অঞ্চল গোঘাট থেকে। যেখানে সিপিএম বিরোধীদের সভাই করতে দেয় না। বিরোধীদের সভায় কারা আসছে, লক্ষ্য রাখে। পরে তাদের উপর অত্যাচার করে।

কিন্তু আমার কাজ তো মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা জোগানো। তাই গোঘাট, আরামবাগ, খানাকুল, পুরশুড়া, ধনেখালি, বলাগড়, পান্ডুয়া, পোলবা, নালিকুল, জাঙ্গীপাড়া, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা সহ বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ যাত্রা করে হাওড়ায় ঢুকলাম। তার আগে অবশ্য ফুরফুরা শরিফে গিয়েছিলাম। সেখানকার ইমাম সাহেব আমায় তাঁর ঘরে ডেকে নিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানালাম। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মা-ভাই-বোনেদের সঙ্গে প্রাণভরে কথা বলেছিলাম। তাঁরাও আমার জন্য প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন। খুব ভালো লেগেছিল ফুরফুরা শরিফে গিয়ে।

হাওড়ার বড়গাছিয়া থেকে শুরু করে খেজুটি, বাগনান, শ্যামপুর, আন্দুল, দাশনগর, কদমতলা, আমতার কান্দুয়া ইত্যাদি অঞ্চল পরিক্রমা করে বড়বাজার হয়ে কলকাতায় ঢুকলাম। ২৩ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার নানা পথ অতিক্রম করে পৌঁছোলাম শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। বিশাল জনসভা হল। পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করলাম জনসংযোগ যাত্রায় প্রথম পর্যায়।

বেলপাহাড়ি থেকে মানুষের সমর্থন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। একটার পর একটা সভা হয়েছে। যাত্রার পথ ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। কিন্তু মানুষ আমাদের কখনও ছেড়ে যাননি। কংগ্রেসের সমর্থকরা তো ছিলেনই। কিন্তু অনেক বামপন্থী মানুষকেও সেই যাত্রায় শামিল হয়ে আমাদের আশীর্বাদ জানাতে দেখেছি। মেদিনীপুরের কোলাঘাট থেকে ফিরছি। যথারীতি রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ। এক জায়গায় বহু মানুষ গাড়ি থামালেন। বললেন, "দিদি, আমরা সকলে সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য। কিন্তু পরের নির্বাচনে ভোটটা আপনাকেই দেব।" কৃতজ্ঞতা জানালাম।

দ্বিতীয়দফার যাত্রা শুরু করলাম উত্তরবঙ্গ থেকে। বাংলার উত্তরভাগের দিকে সকলের নজর বরাবরই কম। সেখানকার মানুষ তাই নিজেদের বরাবর বঞ্চিত মনে করেন। অবহেলিত মনে করেন। অনেককেই বলতে শুনতাম, কলকাতার

নেতারা তাঁদের অবহেলা করেন।

২৮ জানুয়ারি কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেল-এ রওনা দিয়ে পরদিন পৌঁছোলাম শিলিগুড়ি। সেখান থেকেই শুরু হল যাত্রা। শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সীমান্তের দু'একটা এলাকা বাদ দিলে ধূপগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত চলল আমাদের যাত্রা। কাতারে কাতারে মানুষ। তাদের মুখ চেয়ে এক একটা রাস্তায় একটার জায়গায় দশটা করে সভা! তখন আলিপুরদুয়ারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন মানুষ। আমিও ভাবছি, কখন আলিপুরদুয়ার পৌঁছোব। যখন পৌঁছোলাম, মনে হল, গোটা শহরটাই রাস্তায় নেমে এসেছে। অগণিত মানুষ। ছোট শিশু থেকে শুরু করে চা-বাগানের শ্রমিকরা। কে নেই। বিধ্বংসী বন্যায় তার একবছর আগেই অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কিন্তু প্রাণের স্পন্দনটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

আলিপুরদুয়ার থেকে রওনা দিলাম কোচবিহারের পথে। পথে জলপাইগুড়ির কিছু এলাকায় আরও কয়েকটা সভা করতে হল। রাতেই পৌঁছোলাম কোচবিহারে। পরদিন গান্ধীজির মূর্তিতে মালা দিয়ে শুরু হল আমাদের পথচলা। তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, তিনবিঘা, চ্যাংড়াবান্ধা যেখানেই গিয়েছি, দলে দলে মানুষ ছুটে এসেছেন কথা বলতে। তাঁদের সমস্যার কথা শুনেছি। গ্রামের চাষিরা মাঠ থেকে ছুটে এসেছেন আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। শ্রমজীবী মানুষ মাটি-মাখা হাতেই হাত মিলিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমরাও তাঁদের দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করেছি, "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।"

কখনও স্কুলের বাচ্চারা গাড়ি থামিয়েছে। ওদের জন্য গাড়ির ড্যাশবোর্ডে লজেন্স রাখা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ডেকে এনে সেই লজেন্স দিয়েছি। শিশুরা তো কোনো রাজনীতি জানে না। ওরা শুধু ভালোবাসা বোঝে। স্নেহ বোঝে। শীতকাল হওয়ায় দুস্থদের জন্য কিছু গরম চাদর নিয়ে গিয়েছিলাম। কোনো শীতার্ত মানুষকে খালি গায়ে দেখলেই তাকে ডেকে এনে একটা করে চাদর দিয়েছি। জানতাম, তারা কোনো দলের সমর্থক। কিন্তু তাতে আমার দেওয়া আটকায়নি।

'তিনবিঘা' যাওয়ার একটা সুপ্ত বাসনা ছিল বহুদিন ধরেই। কিন্তু কতগুলো ব্যাপার মেনে নিতে পারিনি বলেই আগে যাইনি। এবার মেখলিগঞ্জে গিয়ে

হঠাৎই তিনবিঘা হয়ে কুচলিবাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাওয়ার পথে প্রচুর মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনবিঘা আন্দোলনের শহিদের মা তাঁদের শহিদবেদির সামনে দাঁড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন। তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাইনি। আমার তরফে যৎসামান্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পেরেছিলাম শুধু।

তিনবিঘা করিডরে শহিদবেদিতে মালা দিলাম। পাশেই বাংলাদেশের করিডর। বহু মানুষ তখন সেখানে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অনুমতি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। আমাদের সঙ্গের চাদর ও-পার বাংলার মানুষের গায়ে জড়িয়ে দিলাম। বারবার ওঁরা আমন্ত্রণ জানালেন বাংলাদেশে যেতে। ওঁদের সঙ্গে কথা বলে রওনা দিলাম কুচলিবাড়ির পথে। সেখানকারও মানুষও আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন।

ওঁদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছি চ্যাংড়াবান্ধার দিকে, কিছু দুঃস্থ মানুষ আমার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "দিদি, আমরা বড় গরিব। আমাদের একটা করে চাদর দেবেন?" আমার কাছে যা চাদর ছিল, সব দিয়ে দিলাম। হঠাৎই দেখি, একজন অন্ধ মানুষ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা চাদর পাওয়ার আশায়। ভিড় ঠেলে সামনে এসে পৌঁছোতে পারেননি। কিন্তু তখন আমাদের কাছে আর একটাও চাদর নেই। কী করি। শীতকাল। শেষপর্যন্ত আমার গায়ের চাদরটাই সেই অন্ধ মানুষটির হাতে তুলে দিলাম।

চ্যাংড়াবান্ধা থেকে শিলিগুড়ি। সেখানে জনসভা করে শেষ হল যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব।

তৃতীয় দফার যাত্রা শুরু হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি। শিলিগুড়ি থেকেই শহরাঞ্চলে কয়েকটা সভা করে চললাম নকশালবাড়ির পথে। পথে একটা চায়ের দোকান। নেমে পড়লাম। পাহাড়ি ছেলেরা আড্ডা মারছিল। চা খেতে খেতে ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। রাস্তায় ততক্ষণে ব্যাপক ভিড় জমে গিয়েছে। ভিড়ের চাপে পুঁচকে দোকানটার প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থা। দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। নকশালবাড়ির রাস্তায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে মানুষ আর মানুষ। জায়গায় জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে বাচ্চাদের সঙ্গে হাত মেলালাম। স্বভাবতই নকশালবাড়ি পৌঁছোতে প্রচুর দেরি হয়ে গেল। তপন সিন্‌হার নেতৃত্বে সেখানে তখন হাজার হাজার মানুষের জমায়েত। শুভেচ্ছা বিনিময়ের

পালা সেরে চললাম ফাঁসিদেওয়া। সেখান থেকে ইসলামপুর। সঙ্গে করিম চৌধুরি, প্রশান্ত নন্দী, মিহির ভট্টাচার্যরা।

পরদিন যাত্রা শুরু করলাম ডালখোলা থেকে। রাত থেকে শুরু হল প্রবল বৃষ্টি। সভা প্রায় ভেস্তে যাওয়ার জোগাড়। আমি ঠিক করলাম, বৃষ্টি পড়ুক। সভা হবে। সভা হল। আস্তে আস্তে মেঘও কেটে গেল। তারপর ঘুরলাম পুরো রায়গঞ্জ শহর। কুমারগঞ্জের নিহত শিক্ষক কমলেশ সরকারের স্ত্রীয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলাম তাঁর বাড়িতে। সেখান থেকে ইটাহার। বিরাট জনসভা সেরে বালুরঘাটে। গঙ্গারামপুরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সহায়তা না-পাওয়ায় রাত দুটোয় গঙ্গারামপুরে পৌঁছে দেখলাম, থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। অগত্যা চলে গেলাম তিলকের বাড়ি। তখন ভোর ৫টা। সারাদিন একটার পর একটা সভা। পরদিন রায়গঞ্জ বন্‌ধ ছিল। কিন্তু আমাদের তো যেতেই হবে বালুরঘাট। কুমারগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্র পার্থ সিংহরায়ের বাড়ি। রওনা হয়ে পড়লাম।

কুমারগঞ্জে গিয়ে বলে এসেছিলাম, দোষী পুলিশের শাস্তি চাই। আর শিক্ষক-হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছাত্রদের গ্রেফতার করে রাখা চলবে না। অবিলম্বে তাদের মুক্তি না-দিলে আবার ১০ অগস্ট আসব বালুরঘাটে। সেদিন বালুরঘাটে আইন-অমান্য হবে।

৯ অগস্ট তাই মালদহ হয়ে বুনিয়াদপুরে সভা করে আবার চললাম বালুরঘাটে। আমাদের হিলিতে থাকার কথা ছিল। সেখানকার স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সংবর্ধনা দেওয়ার কর্মসূচি ছিল। গাড়িতে যেতে যেতেই একটা পরিকল্পনা এল মাথায়। এক সহকর্মীকে প্রশ্ন করে জানলাম, স্কুলের ছাত্ররা তখনও ছাড়া পায়নি। বরং সরকারের 'চাপ' রয়েছে ওদের না-ছাড়ার জন্য। কিন্তু আমাদের যেদিন বালুরঘাটে যাওয়ার কথা, সেদিনই আবার বিজেপি 'ভারত বন্‌ধ' ডেকে বসে আছে! দলীয় সতীর্থ তথা আইনজীবী বিপ্লব মিত্রকে বললাম, "আপনারা এত লড়াই করছেন। কিন্তু পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের কেন জেল থেকে ছাড়া হচ্ছে না?" ওখানে সিনিয়র অ্যাডভোকেট কে আছেন, খোঁজ নিলাম। বিপ্লব'দা বললেন শঙ্কর চক্রবর্তীর নাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। তখনই শঙ্করবাবুর বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সফর-সঙ্গীদের পাঠিয়ে দিলাম হিলির পথে।

আমার সঙ্গে রয়ে গেলেন বিপ্লব'দা, বিপ্লব খাঁ আর সোনালি গুহ। শঙ্করবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম, দরজা বন্ধ। বিপ্লব'দার এক সহকর্মী বাড়ির পাঁচিল টপকে গিয়ে গৃহস্বামীকে খবর দিলেন। অত রাতেও উনি সাদরে আমাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। ওঁকে বললাম, ছাত্রদের জামিনের ব্যাপারে পরদিনই বালুরঘাট আদালতে 'মুভ' করতে হবে। শঙ্করবাবু বললেন, বিজেপি-র বন্‌ধের সুযোগে সরকার আদালত বন্ধ রাখবে। আমি বললাম, "আদালত খোলানোর দায়িত্ব আমাদের।" সেই রাতেই পরিকল্পনা ঠিক হয়ে গেল। রাত দুটোয় হিলি পৌঁছোলাম। ঠিক করলাম, পরদিন স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সংবর্ধনা সকাল ১০টার পরিবর্তে সকাল ৮টায় করতে হবে। সভা সেরে ১০টার মধ্যে বালুরঘাট পৌঁছোতে হবে আমাদের।

পরদিন সকালে কর্মসূচি শেষ হতেই রওনা দিলাম বালুরঘাটের পথে। আগেই বলা ছিল, ওই মামলায় আমি একজন আইনজীবী হিসেব আদালতে দাঁড়াব। আমার জন্য যেন কালো গাউন রাখা থাকে। সকালে গাউন হাজির। প্রশাসনের কোনো ধারণাই ছিল না, কী হতে চলেছে। আদালতে ঢোকার আগে গাউনটা পরে নিলাম। ঢুকতে গিয়ে দেখি, বিজেপি-র নাম করে তৎকালীন শাসকদলের কয়েকজন আদালতের প্রধান ফটক বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি গাড়ি থেকে নামার আগেই সাধারণ মানুষ দড়ি দিয়ে বাঁধা বিজেপি-র ঝান্ডা আটকানো ফটক খুলে দিলেন।

আদালতে তো ঢুকলাম। কিন্তু আদালতকক্ষের দরজা বন্ধ! কেউ খুলছে না। আমরাও মরিয়া। সেদিন মামলা 'মুভ' করতেই হবে। প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করে বিচারককে অনুরোধ করলাম আদালত খুলতে। আদালতে চত্বরে তখন হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন। বারবার অনুরোধ করার পর বিচারকের তরফে খবর এল, মানুষের ভিড় সরে গেলে তিনি আদালতকক্ষে আসতে পারেন।

সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করতে কাজ হল। প্রশাসনও তখন খানিকটা নড়েচড়ে বসেছে। তারা জানত, কিছুক্ষণের মধ্যে জনস্রোত আরও বাড়বে। তা রোখার ক্ষমতা তাদের নেই। আদালত খুলল। অথচ প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল, কলকাতা হাইকোর্ট বা মহাকরণ থেকে নির্দেশ না পেলে আদালত খোলা যাবে না।

সমস্ত আইনজীবী সমেত আমরা মামলা 'মুভ' করলাম। ছাত্ররা জামিন পেয়ে গেল। খুশিমনে এলাম মানুষের জমায়েতে। সেখানে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়। আমাদের কথা ছিল খুব সরল এবং সহজ—যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রশাসন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির কথা ঘোষণা করছে, ততক্ষণ শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সভা চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর এল, প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার কথা ঘোষণা করতে আমাদেরই মঞ্চে আসতে চান। মাইকে সে কথা ঘোষণা করে জনতাকে শান্ত থাকার জন্য আবেদন করলাম। মানুষ সাড়া দিলেন। প্রশাসন আমাদের মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করল, গুলি চালানোর জন্য দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি হবে। এবং ওই আইন-অমান্য লক্ষাধিক মানুষকে গ্রেফতার করা হল। সকলকে ছেড়েও দেওয়া হল। প্রশাসন আমাদের দাবি মেনে নেওয়ার পর সভা শেষ করলাম।

নোংরামি অবশ্য চালু ছিল। আমি কী ভাবে আইনজীবী হয়ে আদালতে দাঁড়িয়েছিলাম, আইনজীবী হিসেবে হাইকোর্টের রেজিস্টারে আমার নাম আদৌ নথিভুক্ত আছে কি না, জানতে রাজ্য সরকার পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চকে নির্দেশ দিল। ওরা জানত না, ১৯৮৫ সালেই আমার নাম নথিভুক্ত করা হয়ে গিয়েছিল আইনজীবী হিসেবে। তার ফটোকপিটা তুলে এনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপহার দিয়েছিলাম।

আসলে আমাদের জনসংযোগ যাত্রায় অত মানুষের সাড়া দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল রাজ্য সরকার এবং সিপিএম। ১২ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পরেও সবকিছু খুব শান্তিপূর্ণভাবে এগোচ্ছে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। তাই আমাকে বিপাকে ফেলার চক্রান্ত শুরু করতেই হল!

বালুরঘাট থেকে গেলাম মালদহে। সভা শুরুর কথা ছিল বেলা ১টায়। গিয়ে শুনলাম, ঠিক ওইসময়েই সিপিএম-ও আমাদের সভার পাশেই সভা ডেকেছে। প্রশাসনকে বললাম, ওরা সভা করুক। আমরা বিকেলে তিনটেয় সভা শুরু করব। তার পরেও সময় দিয়ে বিকেল চারটেয় আমি সভায় গেলাম। সিপিএম ভেবেছিল, ওদের সভার পর আমাদের সভা। ভয়ে মালদহের মানুষ আমাদের সভায় আসবেন না। কিন্তু সমস্ত ভয় জয় করে ৫০ হাজারেরও উপর মানুষ এসেছিলেন আমাদের সভায়।

সকলের বক্তৃতা শেষের পর আমি বলতে উঠলাম। হঠাৎ শুনলাম, 'গুলি-গুলি'! মানুষ তখন প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারেন ছুটছেন। অনেকে মঞ্চের নীচে এসে আশ্রয় নিলেন। পরে জেনেছিলাম, আমাদের সভা পণ্ড করার জন্য একটা গরুর লেজে কাপড় জড়িয়ে, কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে সভার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পরিকল্পনা করে। আর চার-পাঁচজন ছেলে 'গুলি-গুলি' বলে চিৎকার করছিল। যাতে মানুষ ভয় পেয়ে সভা ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু মানুষ যাননি। সকলকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করে আবার বক্তৃতা শুরু করলাম। যাঁরা চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে এলেন। বক্তৃতা শেষ করে স্লোগান শুরু করব, হঠাৎ মঞ্চে একটা তর্কাতর্কির আওয়াজ কানে এল। কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, বালু (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক), অলোক দাস, সোনালিদের বকুনি দিলাম মঞ্চে গোলমাল করার জন্য। ওরা বলল, "তুমি আগে গাড়িতে ওঠো। পরে বলছি।"

গাড়িতে উঠে শুনলাম, মাঠের মধ্যে যখন গোমাল চলছে, তখন প্রাণভয়ে অনেকেই মঞ্চে উঠে এসেছিলেন। সেই সুযোগেই একটি ছেলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার কোমরে রিভলভার ছিল। তার আগে আমার উপর বহুবার আক্রমণ হওয়ায় সহকর্মীরা সকলেই সতর্ক ছিল। সোনালির সন্দেহ হওয়ায় ও জেলা নেতৃত্বের কাছে ছেলেটির সম্পর্কে জানতে চায়। আগন্তুক আমাদের দলের কেউ নয় জেনে ও ছেলেটিকে মঞ্চ থেকে নেমে যেতে বলে। কথা না শোনায় সোনালি ছেলেটিকে চ্যালেঞ্জ করে। এবং ধাক্কা দিয়ে ওকে সরানোর সময়েই বুঝতে পারে, ওর কোমরে রিভলভার গোঁজা। পাছে আমার বক্তৃতায় বাধা পড়ে, তাই সোনালিরা ছেলেটিকে মঞ্চ থেকে ধরে নামিয়ে আনে। কিন্তু সেখান থেকে আরও কিছু ছেলে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ঘটনাটা সম্পর্কে মালদহ থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছিল।

আমি সভা শেষ করে গৌড় এক্সপ্রেস ধরে ফিরে এলাম কলকাতায়। শেষ হল জনসংযোগ যাত্রায় তৃতীয় পর্যায়।

জনসংযোগ যাত্রার সময় অনেক বিবেকবান মানুষের দেখা পেয়েছিলাম, যাঁদের কাছে বাম বা অ-বাম বড় কথা নয়, মনুষ্যত্বই বড়। পরিবর্তন যুগে যুগে কখন, কী ভাবে আসে, কেউ বুঝতে পারে না। সমাজব্যবস্থায় আচমকা

একটা জোর ধাক্কা বুঝিয়ে দেয় পরিবর্তনের পালা। সেই পরিবর্তনের গতিরোধ করার সাধ্য কারও নেই। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন কারও মুখ চেয়ে বসে থাকে না। প্রথম দফার জনসংযোগ যাত্রায় আমার সেটাই ছিল মৌলিক অভিজ্ঞতা।

৬

নবজন্ম

১৯৯১ সালে পাশ্চমবঙ্গে একইসঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট হয়েছিল। তখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। আমরা ১১ জন প্রদেশ নির্বাচনী কমিটির সদস্য। মানু'দার বাড়িতে রোজ মিটিং হত। সেখানে দেখতাম, আমি একা একদিকে। অন্য সকলে অন্যদিকে। একদিকে ১৯৭২-'৭৭ এর কংগ্রেসনেতারা, অন্যদিকে আমি একা। কারও ১৯৭৭ থেকে '৯০ পর্যন্ত নতুন প্রজন্মের নতুন কোনো নেতাকে উঠতেই দেওয়া হয়নি।

আমার আবার চিরকালই চাণক্যশাস্ত্রে জ্ঞান কম। নতুন চিন্তাধারায় মানুষ হওয়ার ফলে মনুষ্যজীবনের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম। অতশত বুঝতেও পারতাম না। কিন্তু লক্ষ্য করতাম, আমার সঙ্গে যখন কেউ একা কথা বলতেন, তখন একরকম বলতেন। আর মিটিংয়ে বসলেই সম্পূর্ণ অন্যরূপ।

শেষে একদিন ঘুম ভাঙল। একটি সম্ভ্রান্ত হোটেল আমাদের এক নেতা থাকতেন। তিনি এবং আমাদের অন্য একজন 'শ্রদ্ধেয় নেতা' আমায় একদিন ফোনে ডাকলেন 'বিশেষ আলোচনার' জন্য। কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে কথা বললাম। ওদের বললাম, "বড় নেতারা ডাকছেন। না-গেলে আবার বলবেন, মমতা সহযোগিতা করছে না। ও দলের ভালো চায় না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাম। দুই নেতা দু'পাশে। মাঝখানে আমি। কথা শুরু হল। এক নেতা বললেন, "শোন, সিপিএমের শ্যামল চক্রবর্তীর থেকে একটা প্রস্তাব এসেছে। তুই সেটা মেনে নিলে তোর দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে ওরা কোনো ডিস্টার্ব করবে না।"

কী প্রস্তাব?

মানিকতলায়, শ্যামলবাবুর এলাকায় আমার পছন্দসই প্রার্থীকে কংগ্রেসের টিকিট দেওয়া যাবে না। আমার মনোনীত প্রার্থী ওখানে ভোটে দাঁড়ালে আমায় নাকি দক্ষিণ কলকাতায় দাঁড়াতে দেওয়া হবে না।

দুই নেতার মুখের উপর বলে এসেছিলাম, "সিপিএমকে বলুন, আমায় যত খুশি ডিস্টার্ব করুক! আমার তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু শুনে রাখুন, মানিকতলায় আমার মনোনীত প্রার্থীই দাঁড়াবে। এমপি হওয়ার জন্য আদর্শ আর সত্যকে বিসর্জন দিতে পারব না।"

প্রথম যখন কংগ্রেসের ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে উচ্চারণ করতাম 'বন্দেমাতরম', তখন মনে হয়নি, বাম-দক্ষিণের এত সুন্দর সহাবস্থান হতে পারে। কিন্তু ওই ঘটনাটার পর থেকেই সতর্ক হতে শুরু করলাম। ফলে কিছু তথাকথিত নেতার বিষনজরেও পড়লাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, এ বার একটা সাঙ্ঘাতিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হবে। মনে পড়ছিল 'কল টু দ্য নেশন'-এ স্বামীজির কথা—'সকলেই ভাবে, সে সেরা। কিন্তু মনে রেখো, যেটা তোমার মতে ভালো, সেটাই সকলের পথ হতে পারে না।'

আমি বুঝলাম, বাম-ডানের যৌথ অবস্থান আমার দ্বারা হবে না। শুরু হল আদর্শের তীব্র সঙ্ঘাত।

সেবার আমি লোকসভায় প্রার্থী হতে রাজি ছিলাম না। রাজীব'জির কথায় প্রার্থী হয়েছিলাম। জিতলাম। রাজীব'জির প্রয়াণের পর নরসিংহ রাওয়ের নেতৃত্বে দিল্লিতে সরকার গঠিত হল। আমি মন্ত্রী হলাম। কিন্তু মন্ত্রী যে হব, কখনও ভাবিনি। দিল্লিতে এক সাংসদের বাড়িতে ছিলাম। তখন দেখেছি, মন্ত্রী হওয়ার জন্য তাঁর কী অক্লান্ত প্রয়াস। বয়োডাটা তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ছোটাছুটি, প্রধানমন্ত্রীকে না-পেয়ে তাঁর বেয়ারার হাতেই জীবনপঞ্জি রেখে আসা। ভাবেছিলাম, এত 'লবি' যখন করছেন, তখনই নিশ্চয়ই উনিই মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান দেখছিলাম রাজীব'জির ১০ নম্বর জনপথের বাড়িতে বসে। রাজীব'জির সহযোগী ভিনসেন্ট জর্জ-ও অনুষ্ঠান দেখছিল আমার সঙ্গে বসে। বারবার রাজীব'জির কথা মনে পড়ছিল। ওইভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? চলে এলাম সেই সাংসদের বাড়িতে। তখনও জানতাম না, পিএমও (প্রধানমন্ত্রীর অফিস) থেকে আমার খোঁজা হচ্ছে। ওই

সাংসদের বাড়িতে পৌঁছোতেই সহকর্মীরা বলল, আমার নাম ঘোষণা করা হয়েছে মন্ত্রিত্বের জন্য। আমায় তখনই রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে হবে।

কিন্তু আমার কোনো মানসিক প্রস্তুতিই নেই। কিন্তু অন্যদিকে সহকর্মীদের চাপ। ওদের বোঝানোর জন্য বললাম, "আমার কাছে তো কোনো কার্ড নেই। কী করে যাব? রাষ্ট্রপতি ভবনের তো একটা প্রোটোকল আছে। আমি নিয়ম ভাঙতে পারব না।"

নাছোড়বান্দা সহকর্মীরা বলল, "তুমি গেটে গিয়ে নাম বললেই ওরা তোমায় ভিতরে ডেকে নেবে।"

তখন আমি দোটানায়। যাব? নাকি যাব না? তারপর ভেবে দেখলাম, প্রধানমন্ত্রীর নিজের পছন্দের ব্যাপার। দিল্লিতে থেকেও যদি না-যাই, তা হলে হয়তো কেউ সেটাকেই প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাকে অমর্যাদা করা বলে ব্যাখ্যা করবেন। দলীয় শৃঙ্খলাকে মর্যাদা দিতেই গেলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে।

শপথ তো নিলাম। কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝুলি তো খালি! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই শাস্ত্রী ভবনে দফতরে গিয়ে দেখলাম, সবকিছুই বেশ সাজানোগোছানো। কয়েকজন অভিজ্ঞ মানুষকে সঙ্গে পেয়ে গেলাম। যাঁদের সঙ্গে আমার চিন্তাভাবনা, মানসিকতা মিলে যাচ্ছিল। সুপ্রিয় ধর'দা, রতন'দা আর অশোক সুব্রহ্মণ্যমের কথা তো বিশেষ করে বলব। সকলের থেকেই পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছিলাম। দফতরের অন্যদের সঙ্গে ভালো সম্পর্কের সুবাদে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

আমার দায়িত্বে ছিল ক্রীড়া-যুবকল্যাণ ও মহিলা-শিশুকল্যাণ। কিন্তু দফতরের কাজ করতে করতেই মন চলে আসত এই বাংলায়। মাত্রই ১ বছর ৫ মাস মন্ত্রিত্বে ছিলাম। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও কোনোদিন বাংলাকে উপেক্ষা করিনি।

এর মধ্যেই এসে গেল রাজনৈতিক পরিবর্তন। তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মানু'দা হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি আর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকবেন না। তা হলে তাঁর পর কে? জল্পনা শুরু হয়ে গেল। অনিবার্য হয়ে পড়ল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন। প্রথমদিকে কখনও ভাবিনি, ওই নির্বাচনে আমি দাঁড়াব। কিন্তু লক্ষ্য

করলাম, ওই নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে কিছু কংগ্রেসনেতা এক ধরনের 'রাজনৈতিক ছ্যাবলামি' শুরু করেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে এমন সমস্ত লোকের নাম বেরোতে লাগল যে, লজ্জায় মাথা হেঁটে হওয়ার যোগাড়।

একদিন নিজেই সোমেন মিত্রকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি ওই নির্বাচনে সভাপতি পদে দাঁড়াচ্ছেন কি না। বরকত'দা যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তখন বকলমে সোমেন'দাই সভাপতির কাজ চালাতেন। অনেকদিন ধরে প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে থাকার ফলে সোমেন'দা বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব একটা 'টিম' করে নিতে পেরেছিলেন। যুব কংগ্রেসের রাজ্য শাখার সভাপতি হিসেবে আমার কার্যকালের মেয়াদ তখন বড়জোর আর একটা বছর। যদিও জেলায় জেলায় যাওয়া এবং ঘোরার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু নিজস্ব 'টিম' করার মানসিকতা আমার কখনও ছিল না।

ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়ে গেল। নতুন ভূমিকায় নতুন নাটক শুরু হতেও বেশি দেরি হল না। প্রিয়'দা থেকে শুরু করে অনেকেই আমায় সভাপতি পদে দাঁড়ানোর জন্য বলতে শুরু করলেন। আমি তখনও কেন্দ্রে মন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনও অনুরোধ করলেন, "সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা দরকার। সেইজন্য আপনাকে দাঁড়াতে হবে।"

আমাদের প্রার্থী ছিলেন কিন্তু প্রণব'দা। তাঁর বিভিন্ন দুঃসময়ে তাঁর পাশে থেকেছি। এমনকী, উনি যখন কংগ্রেস ছেড়ে 'রাষ্ট্রীয় সমাজবাদী কংগ্রেস' গড়েছিলেন, তখনও দিনের পর দিন রাজীব'জিকে অনুরোধ করেছিলাম প্রণবদা'কে দলে ফেরানোর জন্য। কিন্তু প্রদেশ সভাপতি পদের জন্য ভোটে দাঁড়িয়ে সেই প্রণব'দাই আমায় ভুল বুঝতে শুরু করলেন। কেন? আমি জানতাম না।

ক্যামাক স্ট্রিটের স্টিল গেস্ট-হাউসে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে একটা মিটিং হচ্ছিল। সমস্ত নেতাই সেখানে হাজির। কিছু লোক সেদিন প্রণব'দাকে উত্তেজিত করলেন। উনি আমায় ভুল বুঝলেন। বকুনি দিলেন সকলের সামনে। আশা করিনি। গভীর বেদনা নিয়ে ফিরে এলাম। মনে পড়ছিল সেই সময়ের কথা, যখন সাংসদ হওয়ার আগে দিল্লিতে ওঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। কেন জানি না, সেদিন প্রণব'দাকে বলেছিলাম, "যখন আপনার ভালো সময় আসবে, তখন

হয়তো আপনার বাড়িতে আমার আসার রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে।”

সেই কথাটা যে ওইভাবে মিলে যাবে ভাবিনি। ভাবলাম, প্রণব’দা নিশ্চয়ই আমায় পছন্দ করছেন না কোনো কারণে।

দলে নির্বাচনের আগে ২০টা জোলায় ডিস্ট্রিক্ট রিটার্নিং অফিসার (ডিআরও) নিয়োগ করা হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের কথাই হবে শেষকথা। জেলা থেকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সদস্যদের তালিকা তাঁরাই তৈরি করবেন। কিন্তু ডিআরও-র তালিকা বেরোনর পর দেখা গেল, ২০ জনের মধ্যে আমাদের পছন্দের মাত্র চারজন রয়েছেন। প্রণবদার উপর পুরোপুরি নির্ভর করতাম। তাই অভিমানটা গিয়ে তাঁর উপরেই পড়ল। একটা অবিশ্বাসও জন্ম নিল। ভাবলাম, তা হলে কি প্রণব’দা নিজে সভাপতি না-হয়ে আসলে অন্য কাউকে ওই পদে চাইছেন? রাগ হল।

বরাবরই আমি একটু জেদি প্রকৃতির। কেউ আমায় বুঝিয়ে কোনো কথা বললে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে পারি। কিন্তু মানসিক আঘাত সহ্য করতে পারি না। আমি জানতাম, বাংলার তাবড় কংগ্রেসনেতারা সকলে একজোট হয়ে আমার বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও সিপিএমের সঙ্গে ‘হটলাইনে’ যোগাযোগ রাখছেন। সমস্তকিছু একটা ঝড়ের সঙ্কেত বয়ে নিয়ে এল। ঠিক করলাম, আর নয়। এ বার সত্যিটা সকলে জানুক। ভোটে হারজিতটাই বড় কথা নয়। আসল কথা হল বাস্তবের কাছে হেরে গিয়েও নৈতিক মূল্যবোধের কাছে জিতে-যাওয়া।

ভোটে দাঁড়িয়ে গেলাম। বাস্তব পরিস্থিতি আমায় ঠেলে দিল ক্ষমতার ইঁদুর দৌড়ে, যা আমি চিরকাল অন্তর থেকে ঘৃণা করে এসেছি।

চারশো মনোনীত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সদস্যের মধ্যে আমার নিজস্ব বলতে মাত্র ৩৭ জন। চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। তার চেয়েও বেশি ছিল মূল্যবোধের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অভিজ্ঞতার আলোয় বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা।

রাজীব’জি অনেককেই বলেছিলেন, তিনি আমাকেই দায়িত্ব দিতে চান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিং রাও-ও চেয়েছিলেন, আমিই জিতি। কিন্তু বাদ সেধেছিলেন দিল্লির কিছু ভুঁইফোড় নেতা। যাঁরা তৈরি করেছিলেন এ রাজ্যের নির্বাচনী প্যানেল। তাঁদের ‘প্রয়োজন’ আমার মতো সাধারণ ঘরের মেয়ের পক্ষে মেটানো সম্ভব ছিল না। অর্থের খেলায়, ছলনার খেলায়, ডান-বামের যৌথ চক্রব্যূহে আমি প্রবেশ করলাম অভিমন্যুর মতো। নদিয়া এবং দার্জিলিং জেলার

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সদস্যদের তালিকা বেরিয়ে গেলে আমি হারতাম না। কিন্তু হারটাই ছিল আমার ভবিতব্য।

পরে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে সেদিন হয়তো ওই ভোটের প্রহসন থেকে আমার সরে আসাই উচিত ছিল। আসিনি যে, সেটাকেও একটা বিরাট ভুল বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু যদি সরে আসতাম, তা হলে কি জানা যেত, কংগ্রেসের দলীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিএমের উৎসাহটা কোথায় এবং কেন? কার জন্য? কখনও তো জানতে পারতাম না, সিপিএম নেতাদের একই অঙ্গে কত রূপ! কারা বিধানসভায় জেতার জন্য, কারা সিপিএমের উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে নিজেদের পারিবারিক সমৃদ্ধির জন্য, কারা আমার প্রতি স্রেফ ব্যক্তিগত ঈর্ষায় আমার আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সিপিএমের রাজ্যপাট নিষ্কণ্টক করতে সাংগঠনিক নির্বাচনে আমায় হারানোর নকশা তৈরি করেছিলেন।

দলের ভোটে না-দাঁড়ালে সম্ভবত সেগুলো আমার অজানাই থেকে যেত। বিশ্বাস করেছিলাম, এমন অনেককেই মহারাষ্ট্র নিবাসের সেই ভোটে পিছন থেকে ছুরি মারতে দেখেছিলাম। হেরে যাওয়ার পর খারাপ তো লেগেইছিল। কিন্তু সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকিয়ে, বাংলার মানুষের ভালোবাসাকে সম্মান দিয়ে, তাঁদের উপ বিশ্বাস রেখে মনে জোর এনেছিলাম। ভেবেছিলাম, জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। জয়ে যেমন আনন্দ আছে, তেমনই পরাজয়ের মধ্যেও তো থেকে যায় আত্ম সমালোচনার অবকাশ।

সম্ভবত সেই ঘটনাতেই ভবিষ্যতের তৃণমূল কংগ্রেসের গর্ভাধান হয়েছিল।

একদিকে আমরা, চরমপন্থী কংগ্রেসকর্মীরা। যারা সাচ্চা সিপিএম-বিরোধী। অন্যদিকে নরমপন্থীরা। যাঁরা দিল্লির অঙ্গুলিহেলনে বাংলার রাজনীতি চালনা করতেন। নিজেদের আখের গোছাতে যাঁরা বাংলার ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিয়ে সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিয়ে চলতেন।

১৯৯৬ সালে লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের পটভূমিকা দেখলে বোঝা যাবে, কী ভাবে প্রার্থিতালিকা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও চরমপন্থীদের অনেকের নাম প্রার্থিতালিকা থেকে বাদ দিয়ে কিছু নরমপন্থীকে ঢোকানো হয়েছিল। ওই নামগুলো মেনে নিতে পারিনি। তাই আমার লোকসভা নির্বাচনের মনোনয়নপত্র ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত অবশ্য তা সম্ভব

হয়নি। হাজার হাজার সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। যাঁরা সেদিন প্রায় ব্যারিকেড করে রেখে আমায় ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলেন। পুলিশেও যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে জনতারই পক্ষ নিয়েছিল। ইতিমধ্যে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস নেতাদের থেকে দলের প্রতীকচিহ্ন নিয়ে এসেছিলেন আমায় না-জানিয়েই। কারণ সেদিনই ছিল প্রতীক জমা দেওয়ার শেষদিন। দিল্লির নেতাদের কথা দিয়ে কথা না-রাখাটা এমন এক বিড়ম্বনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সহকর্মীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সহকর্মী গৌতম বসুর বাড়িতে গিয়ে থাকছিলাম। গৌতম এবং ওর স্ত্রী অনিতা আমায় সাহায্য করেছিল। প্রায় লুকিয়েই থাকতাম। এমনকী, বাড়ির কাজের লোকও যাতে দেখতে না-পায়, তাই যে ঘরে আমি থাকতাম, সেই ঘর পরিষ্কার করার সময় টয়লেটে গিয়ে বসে থাকতাম!

ততদিনে দিল্লি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা শুরু করেছে। আমার বাড়িতে ফ্যাক্সবার্তায় জানানো হল, মমতা যাদের জন্য ভোটে দাঁড়াতে চাইছে না, তাদের মনোনয়ন দেওয়া হবে না। তাদের প্রতীকও দেওয়া হবে না। পরে অবশ্য দেখা গেল, তারা সকলেই প্রার্থী হয়েছে!

অনেক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কটূক্তি সয়ে দক্ষিণ কলকাতার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে সংসদে গেলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, কোনো বিষয়েই দল বক্তার তালিকায় আমার নাম রাখে না। সন্তোষমোহন দেব ছিলেন মুখ্যসচেতক। ব্যক্তিগতভাবে আমায় তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই খেলাখুলি বলতেন, "তুই আমায় অনুরোধ করিস না। আমি রাখতে পারব না।" তাঁর কথা শুনেই বুঝেছিলাম, উপরতলা থেকে সঙ্কেত রয়েছে। আমায় যেন সংসদে বলতে না-দেওয়ায় হয়। বলতে দেওয়া হত না অজিত পাঁজাকেও। মন উঠে যাচ্ছিল।

১৯৯২ সালে সাংগঠনিক নির্বাচনে হেরে গিয়েও হার মানিনি। নির্বাচন নিয়ে প্রহসনের খেলাটা তখন বুঝতে পারলেও জনসমক্ষে আনিনি। আমরা চরমপন্থীরা হেরে গিয়েছিলাম। জিতেছিলেন নরমপন্থীরা। ঠিক করেছিলাম, পাঁচবছর পর ১৯৯৭ সালের সাংগঠনিক নির্বাচন আরও কাছ থেকে দেখব। হাতেনাতে ধরব প্রহসন। দেখলাম, আমাদের সঙ্গে যারা দীর্ঘদিন রাজনীতি করে আসছে, তাদের কোনো সদস্যপদই দেওয়া হচ্ছে না। বারবার প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয়নি। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী এবং সনিয়া গান্ধীর সঙ্গেও একাধিকবার কথা বলা হয়েছিল। আমাদের অনেকে

দিল্লির নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই নেতারা তখন সায় দিলেও পরে নরমপন্থীদের কথায় ঘুরে গিয়েছিলেন।

আমাদের কর্মীদের ধূমায়িত ক্ষোভ আমাদের চরমপন্থীদের রাস্তায় নামতে বাধ্য করল। প্রথম প্রথম অনেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ছিলেন। ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। সকলেই প্রতিবাদ করছিলেন। আমরা ঠিক করলাম, তৃণমূল স্তরের কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে আমরা একটা প্রতিবাদ সভা করব দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে। সভা কী নামে হবে? বললাম, "সভা যখন তৃণমূল কর্মীদের, সেই নামেই সভা হোক।" সকলেই মেনে নিলেন। সেই সভায় অনেকেই গিয়ে বক্তৃতা করে বললেন, তাঁরা তৃণমূল কর্মীদের পাশে থাকবেন। আমরা ঠিক করলাম, পরবর্তী পর্যায়ে ওইভাবেই জেলায় জেলায় গিয়ে তৃণমূল কর্মীদের সংগঠিত করব।

একদিন আমার সতীর্থ বিধায়কের কাছে শুনলাম, কংগ্রেসের এক প্রথমসারির নেতার বাড়িতে আলোচনা চলাকালীন তিনটি ফোন এসেছে। প্রথমটি এক সিপিএম নেতার। পরের দু'টি প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলকারী দু'জনের। আলোচনায় এটা বোঝা গিয়েছিল যে, মমতাদের একলা করে দিতে হবে। বদলে সেই নেতার লোকজনদের জায়গা করে দেওয়া হবে।

খবরটা পেয়ে আমরা ঠিক করলাম, নজরুল মঞ্চের সিদ্ধান্ত থেকে নড়ব না। কংগ্রেসের সদস্যপদ সংগ্রহ নিয়ে প্রকৃত কংগ্রেসকর্মীদের বঞ্চনা করা, নির্বাচনের নামে জালিয়াতি আর প্রহসনের বিরুদ্ধে দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্বকে আমরা বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো বিচার পাইনি। নাকে খত দিয়ে রাজনীতি করার মানসিকতা আমাদের ছিল না। ঠিক করলাম, মুচলেকা দিয়ে রাজনীতি করা যাবে না। জেলায় যেতে হবে।

আরও একটা একুশে জুলাই আসছিল। তার প্রস্তুতিও শুরু হল। তখনই শুনলাম, নরমপন্থীরা সব দল বেঁধে দিল্লি যাচ্ছেন আমাদের মঞ্চকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করতে। আমাদের জেহাদ দিল্লির বিরুদ্ধে। তাই তাঁরা চান, দিল্লিকেই কলকাতায় নিয়ে আসতে। যাতে দিল্লির উপস্থিতিতে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। বামপন্থী নেতারাও দিল্লিকে বোঝালেন, অতিথি বরণ থেকে শুরু করে আপ্যায়ন যথাবিহিত হবে। কেশরী তো আসবেনই। সনিয়া গান্ধীও (আমরা এখন থেকে তাঁকে 'রাজমাতা' বলব) যেন আসেন। তা হলেই চরমপন্থীদের জোরাল ধাক্কা

দেওয়া যাবে। কলকাতায় খবর এল, ৯ অগস্ট নেতাজি ইন্ডোরের পাল্টা একটা আউটডোরও করতে হবে।

আমি একটু চিন্তিত ছিলাম বটে। কিন্তু কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত দাবি ঠেকাই কী করে? যে জেলাতেই যাই, কর্মীরা বলেন, "দিল্লিকে মানি না। আগে বাংলা। দিল্লি পরে। কার কত ক্ষমতা দেখব। নেতারা আপনার সঙ্গে না-থাকতে পারে। আমরা আছি!"

সেই দাবির কাছে মাথা নত করে ময়দানে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ৯ অগস্ট পাল্টা সমাবেশ ডেকে দিলাম।

ঘোষণা হল: ৯ তারিখ নেতারা থাকবেন ইন্ডোরে আর কর্মীরা আউটডোরে। দিল্লির নেতারা নড়েচড়ে বসলেন। আমার রাজনৈতিক জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঝুঁকি নিয়ে জিতলে দিল্লির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে। হারলে ইতিহাস আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দেবে। সেই উদ্বেগ ছিল। কিন্তু সঙ্গে পেয়েছিলাম নিঃস্বার্থ একদল নতুন প্রজন্মকে। স্বার্থপর বিধায়করা যেমন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তেমনই পাশে পেয়েছিলাম অনেক বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিকেই।

আউটডোরের প্রস্তুতি চলতে চলতেই আমি একটা সংসদীয় কমিটির মিটিংয়ে যোগ দিতে দিল্লি গেলাম। একের পর এক নেতার ফোন। বক্তব্য একটাই— ইন্ডোর হবে। আউটডোর করা যাবে না। কিন্তু সভার সিদ্ধান্ত তো আর আমার একার ছিল না। সেই সিদ্ধান্ত ছিল সকল তৃণমূল স্তরের কর্মীর। তারা তো কিছুর কাছেই মাথা নিচু করবেন না। ফলে একদিকে আমরা অনড়। অন্যদিকে নরমপন্থীরা দিল্লিকে বুঝিয়ে চলেছেন, "ওদের সঙ্গে কেউ নেই। ওদের সমাবেশে কোনো লোক হবে না।"

৯ অগস্ট যখন ইন্ডোর-আউটডোর জমজমাট, তখন দিল্লির কিছু হেভিওয়েট নেতা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দিল্লির দূত জিতেন্দ্র প্রসাদ এবং সন্তোষ'দাকে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছিলাম। তাঁরা আমাদের অভিযোগের যৌক্তিকতা সমর্থন করছিলেন। কিন্তু কলকাতার মাটি ছাড়তে না-ছাড়তেই যে কে সেই। বার্তা এল—রাজমাতা ইন্ডোরে থাকাকালীন বাইরে সমাবেশ হলে রাজমাতার সম্মানহানি হবে। জবাবে বলেছিলাম, রাজমাতার কাছে গিয়ে তো আমি নিজে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের শুভেচ্ছা-আশীর্বাদ দেওয়ার

অনুরোধ করেছি। উনি আমাদের সমাবেশে এলে নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা সমাদর করেই বরণ করে নেব।

কিছুতেই বোঝাতে না পারায় আবার অগস্টের ৩/৪ তারিখ থেকে কলকাতায় আগমন ঘটল বড়মাপের নেতাদের। চুপি চুপি আমাদের প্রলোভন দেখানো শুরু হল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ততদিনে প্রতিনিধিরা আসতে শুরু করেছেন কলকাতায়। তাঁরা আগেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। বক্তব্য : তাঁরা ইন্ডোরে গেলে আমাদের কি কোনো আপত্তি আছে? তাঁদের বলে ছিলাম, আমাদের কোনো অসুবিধাই হবে না। নির্দ্বিধায় আসতে পারেন ইন্ডোরে। তাঁরা অবশ্য বলতেন, "ইন্ডোরে গেলেও তোমাদের আউটডোর সমাবেশকেও সমর্থন করি। তাই তোমাদের দফতরেও যাব।"

ঘটনাও তেমনই ঘটল। যাঁরা ইন্ডোরের সমাবেশের জন্য এসেছিলেন, তাঁরা প্রথমেই আমার দফতরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। সেই অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য আমার দফতরের সামনে একটা অস্থায়ী ক্যাম্পও খুলতে হয়েছিল আমায়। সকলের দৃষ্টি তখন ইন্ডোর নয়। আউটডোরে।

আউটডোরের সভায় দু'টি আবেদন করেছিলাম। প্রথমত, সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে আমাদের আপত্তি থাকায় প্রকাশ্যেই কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে তৃণমূল কর্মীদের মঞ্চ থেকে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মঞ্চের চেয়ারম্যান এবং সুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বীরভূম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করা হোক। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্ত হোক, এবার থেকে আমাদের লড়াই চলবে তৃণমূল কর্মীদের প্ল্যাটফর্ম থেকেই।

সেই সমাবেশের সাক্ষী রইল গোটা কলকাতা। গোটা বাংলা। গোটা দেশ। একদিকে অর্থবল, পেশিবল, কাট-আউট আর নেতাদের ছড়াছড়ি। অন্যদিকে বাংলার মাটিতে দিল্লির ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে মানুষের পায়ে পায়ে তীর্থযাত্রা। কিন্তু সেই যাত্রার শেষে তৃণমূল যে একটি আলাদা রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি পাবে, তা আমরা তখনও ভাবতে পারিনি।

৯ অগস্টের সমাবেশ এমন এক আশ্চর্য আবেগের জন্ম দিয়েছিল যে, আমাদের কর্মীরা বীরদর্পে জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন। ইন্ডোরের বিরুদ্ধে আউটডোরের জয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল তৃণমূলের জয়ের পূর্বাভাস। যা সারা দেশের আসল কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। দিল্লির

নেতারা যার সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিলেন।

এরপর নির্বাচনে যাওয়ার পালা। কিন্তু কংগ্রেসের ঘর ভাঙতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরে সনিয়া গান্ধীকে অনুরোধ করেছিলাম, দলের দায়িত্ব নিতে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। তার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোটের দিন ঘোষণা করে দিল—২২ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচনী নির্ঘন্টের আইন ঘোষণা হয়েছিল ১ জানুয়ারি, ১৯৯৮। সকলেই আলোচনা করছিলাম, কী ভাবে মাত্র দেড় বছরের মাথায় কী ভাবে আবার একটা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। তখনই দিল্লি থেকে রাজমাতার বার্তাবাহক আমায় ডেকে পাঠালেন বাংলার বিষয়ে আলোচনার জন্য।

একটা আশঙ্কা ছিল। তাই আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনা করে নিয়েছিলাম দিল্লি যাওয়ার আগেই। আলোচ্য কী হবে, আলোচনা বিফল হলে কী করণীয়, সমস্ত। দলের চেয়ারম্যান হিসেবে পঙ্কজ'দা যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে তৃণমূলের তরফে প্রয়োজনীয় নথিপত্রও তৈরি করে দিয়েছিলেন। তৃণমূল কর্মীদের জন্য দলের সংবিধান তৈরির দায়িত্বও ছিল পঙ্কজ'দার উপরেই। আমরা যেহেতু নিজেদের প্রকৃত কংগ্রেস বলে মনে করতাম, তাই আমাদের সংবিধানও তৈরি হয়েছিল কংগ্রেসের অনুকরণেই।

আমায় দিল্লি একা ডেকে পাঠালেও সে বার আর একা যাইনি। সঙ্গে নিয়েছিলাম অজিত পাঁজা আর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যাতে তাঁরা সমস্ত ঘটনার সাক্ষী থাকতে পারেন। পরবর্তী সময়ে যেন কেউ বলতে না-পারেন, আমি কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১২ ডিসেম্বর রাতে রাজমাতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তিনজন।

সনিয়া'জি বললেন, "তোমাদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি জানি। তোমাদের সদস্যপদও দেওয়া হয়নি জানি। কিন্তু নির্বাচনের সময় সকলকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে।"

বললাম, "কাকে সামনে রেখে নির্বাচন করাবেন? বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি তো শুধু সাধারণ মানুষ নয়, দলের কর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নন। আপনি দায়িত্ব নিচ্ছেন না কেন?"

সনিয়া'জি বললেন, "আমি দায়িত্ব নিতে পারব না। কারণ, আমি বিদেশিনী। আমায় সকলে মানতে পারবেন না।"

আমি বলেছিলাম, "রাজীব'জির মৃত্যুর পর দলে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে। যা কারও পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়। তবে রাজীব'জির স্ত্রী হিসেবে আপনি দায়িত্ব নিন। গান্ধী পরিবারের প্রতি কর্মীদের একটা ভালোবাসা আছে। আপনি দায়িত্ব নিয়ে সকলকে একজোট করার চেষ্টা করুন। আমাদের ক্ষোভ থাকলেও দলের স্বার্থে সব ভুলে যাব।"

উনি রাজি হলেন না। তবে আমাদের মর্যাদা দিয়ে কাজ করানোর জন্য বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিস-র সাধারণ সম্পাদক অস্কার ফার্নান্ডেজকে ডেকে আমার এবং অজিত'দার কথা বলে একটা সম্মানজনক নোট তৈরির নির্দেশ দিলেন। ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর অস্কারের সঙ্গে বসে সেই নোট তৈরি হল।

কিন্তু তারপর অস্কার নিপাত্তা হয়ে গেলেন! কোনোরকম যোগাযোগ তো দূরস্থান। নতুন দল তৈরি করতে গেলে নির্বাচন কমিশনে রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ১৭ ডিসেম্বর। মাঝে দুটো দিন মাত্র সময়।

পরে খবর এল, বাংলার নেতারা বিশাল বাহিনী নিয়ে দিল্লি পৌঁছেছেন। সকলেই মাত্রাতিরিক্ত সক্রিয়। দিল্লি দোটানায় পড়ে গেল। পরিকল্পনা ছিল, সময় নেওয়ার অছিলায় ১৭ তারিখটা পার করিয়ে দাও। ১৬ তারিখ সংবিধানে চোখ বোলাতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় আর সুদীপ'দাকে বললাম, পরদিন নির্বাচন কমিশনে যাওয়ার আগে নথিপত্র ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিচ্ছি। দলীয় সংবিধানের তিনটে কপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সেগুলো মুকুল রায় আর রতন মুখোপাধ্যায়ের হাতে গোপনভাবে টাইপ করতে পাঠিয়ে দিলাম।

দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে গেল রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে— আমাদের নথি তৈরি। কমিশনের কাছেও সময় চেয়ে রাখা হয়েছে। ১৭ তারিখ সকাল থেকে নাটক তুঙ্গে উঠল। বেলা ১টায় কমিশনের সঙ্গে দেখা করার সময়। তৈরি হচ্ছি। ১০ নম্বর জনপথ থেকে অজিত'দাকে অনুরোধ করা হল আমায় আটকাতে। আরও একটা দিন সময় যেন দিল্লিকে দেওয়া হয়। সকাল ৯টার সময় অজিত'দা কথা বলবেন আমাদের সঙ্গে।

মনটা একটু খারাপ হল। কিন্তু অজিত'দাকে বললাম, "আমি যাতে কমিশনে না-যাই, সেজন্যই তো এত তৎপরতা। ঠিক আছে। সনিয়া'জিকে সৌজন্য দেখিয়ে আমার কমিশনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দিচ্ছি। কিন্তু তৃণমূল কর্মী এবং মানুষের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কয়েকঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর

নথিপত্রে একবার চোখ বুলিয়ে ভাবলাম, আমি নিজে না-ই বা গেলাম কমিশনে, সে ক্ষেত্রে তো কংগ্রেসও ছাড়ছি না। তা হলে তো এগুলোর আর কোনো দরকার থাকবে না। কিন্তু দিল্লির নেতাদের বিশ্বাস নেই। তাই আমার নাম না-থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের নামে একটা নথি জমা থাক। প্রয়োজন না-লাগলে তো হয়েই গেল। আর লাগলে ওটাই হবে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কিন্তু কাজটা করতে হবে অত্যন্ত সাবধানে এবং গোপনে।

হাতে সময় দু'ঘণ্টা। তার মধ্যেই 'সিল' বানাতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে নথি এফিডেবিট করাতে হবে। মুকুল-রতন'দা গোল মার্কেটে গিয়েছিল 'সিল' তৈরি করাতে। দোকানদার প্রথমে বলেছিল, দু'দিন পরে আসতে। তখন হাতে প্রচুর কাজ। মুকুল তাকে বলে, হাতে সময় মাত্র দু'ঘণ্টা। মমতা'জির নতুন দলের 'সিল' এটা। এখনই চাই! দোকানদার বলেছিল, আগে বলবেন তো! একঘণ্টায় করে দিচ্ছি। 'সিল' বানাতে দিয়ে ওরা গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। রতন'দার পরিচিতির সুবাদে অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ সেরে আবার ফিরে গিয়েছিল গোল মার্কেটে। সেই দোকানদার ততক্ষণে 'সিল' তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু তিনি তার জন্য কোনো মজুরি নিতে চাননি। বলেছিলেন, "মমতা'জির পার্টি জিতলে আমায় মিষ্টি খাওয়াবেন। তা হলেই হবে।"

ব্যাপারটা গোপনীয় রাখার জন্য দোকানদারকে অনুরোধ করে ওরা ফিরে এল আমার ফ্ল্যাটে। তখন হাতে সময় মাত্র আধঘণ্টা। চোখে চোখে ইশারায় কথা হয়ে গেল। নিশ্চিন্ত।

নির্দিষ্ট সময়ের দশমিনিট বাকি থাকতে ওরা কমিশনের 'রিসিভ' করা কপি এনে আমার হাতে দিল সাধারণ একটা বইয়ের মতো। আমিও নথিগুলোকে নিয়ে আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বিকেল চারটেয় বেরিয়ে দেখলাম, তখনও অনেকে বসে আছেন। তাঁরা আমায় ভিতরের ঘর থেকে বেরোতে দেখে স্বস্তি পেলেন খানিকটা। আমি তাঁদের সঙ্গে হাসিমুখে চা খেলাম।

সেদিন রাতে সনিয়া'জি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, অস্কার কি আলোচনায় বসেছিলেন? বসেননি, জানানোয় বললেন, অস্কার'জি যেন পরদিন, ১৮ তারিখ আমাদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টির ফয়সালা করেন। অস্কার'জি পরদিন কিন্তু একেবারে উল্টোসুরে গাইতে শুরু করলেন। অজিত'দা-সুদীপ'দা বহু বুঝিয়েও

কিছু করতে পারছিলেন না। বহুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা দেখতে দেখতে একটা তীব্র অপমানবোধ হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। দেখছিলাম, অস্কার'জি বারবার ভিতরে গিয়ে ১০ নম্বর জনপথের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তেমনই তিনি একবার ভিতরে যেতেই আমি উঠে পড়লাম। বাড়ি ফিরে জানিয়ে দিলাম, আর যাব না।

পরে শুনেছিলাম, সনিয়া'জির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে অস্কার সম্মানজনক শর্তে একটা রিপোর্ট তৈরি করেন। সেটা পরদিন ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছিল না। আমাদের আবার ২০ তারিখ কলকাতা ফেরার কথা। ফের ১০ নম্বর জনপথকে জানালাম, যা করণীয়, ১৯ তারিখের মধ্যেই করতে হবে। নচেৎ আমাদের অন্যরকম ভাবতে হবে। অনন্তকাল দিল্লির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না।

১৯ তারিখ রাত সাড়ে ১০টায় সনিয়া'জি ব্যক্তিগত সচিব ডাকলেন আমাদের। অস্কার'জি তো ছিলেনই, অজিত'দা আর আমি গেলাম। দু'পক্ষকেই সমমর্যাদা দিয়ে খসড়া চূড়ান্ত হয়ে গেল। আমরা বললাম, খসড়া চূড়ান্ত করতে সাতদিন সময় লাগল। প্রকাশ করতে কতদিন লাগবে?

কংগ্রেস সভাপতি কেশরী'জিকেও জানানো হল যে, সনিয়া'জির নির্দেশে খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে। তখন প্রায় রাত ১১টা। সনিয়া'জির ব্যক্তিগত সচিব ভিনসেন্ট জর্জ বললেন, যাওয়ার আগে সনিয়া'জি একবার আমায় দেখা করে যেতে বলেছেন। বলেছেন, যেন আমি একাই যাই। কারণ উনি রাতের পোশাক পরে ফেলেছেন। অন্য কোনো বহিরাগতের সঙ্গে দেখা করবেন না। দেখা করবেন না। দেখা করলাম। সনিয়া'জি বললেন, "ভালো করে কাজ করো।"

ভালো মন নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী দিল্লি কোনো ঘোষণা তো করলই না। উল্টে ২১ ডিসেম্বর কংগ্রেস সভাপতি হায়দরাবাদে গিয়ে ঠিক তার উল্টো ঘোষণা করে দিলেন—মমতা'কে নির্বাচনী প্রচার কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে।

সেদিন রাতেই অজিত'দা এবং মানু'দা ফ্যাক্স পাঠিয়ে ওই ঘোষণা প্রত্যাহার করার কথা বলেছিলেন। ক্রমে খবর পেলাম, আমায় দল থেকে তাড়ানোর নথিপত্র তৈরি হচ্ছে। ঘোষণা হবে ২২ ডিসেম্বর বিকেলে। আমরাও সাংবাদিক বৈঠক করে বললাম, "আমরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকেই নির্বাচনে লড়ব।"

সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীনই খবর এল, কংগ্রের আমায় ছ'বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করেছে।

প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভেঙে পড়িনি। তা হলে সহকর্মীরাও ভেঙে পড়ত। যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে মা'কে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতাম। সেদিনও গেলাম। যে মা ক'দিন আগেও আমায় বলেছিলেন, "কংগ্রেস ছাড়িস না", সেই মা আমায় আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আর তোকে কংগ্রেস করতে বলব না। তুই তৃণমূল কংগ্রেস কর। আমার মতো আরও সকলের আশীর্বাদ থাকবে তোর মাথায়। যে দলটা করতে গিয়ে তোর সারা শরীরে আঘাত, যে দলটার জন্য মাথায় আঘাত পেয়ে তুই রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিস না, এই তাদের ব্যবহার! প্রয়োজন নেই আর কোনো। নতুন করে লড়াই শুরু কর!"

মায়ের আশীর্বাদ পেয়ে মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না। মনে পড়ছিল, ভাগ্যিস নির্বাচন কমিশনে ১৭ তারিখ কাগজপত্র জমা দেওয়া ছিল। সাংবাদিকরা যখন আমায় প্রশ্ন করলেন, জানালাম সে কথা। বললাম, "সনিয়া'জির সম্মানরক্ষার্থে সেদিন আমি কমিশনে যাইনি ঠিকই। কিন্তু তৃণমূলের কর্মীরা আবেদনপত্র ১৭ তারিখেই কমিশনে জমা দিয়ে রেখেছেন।"

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আমাদের প্রধান কাজ ছিল নতুন দলের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য কমিশনে গিয়ে বাকি কাগজপত্রের তদারকি করা। ২৪ ডিসেম্বর কমিশনে এফিডেভিট জমা দিয়ে জানালাম, আর আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য। কিন্তু তখনও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাকি ছিল—নির্বাচনী প্রতীক। সকলকে একই প্রতীক নিতে হবে। নইলে এক একজনকে এক একটা প্রতীকে লড়তে হবে। তাতে জনগণের কাছে সঠিক বার্তা পৌঁছোবে না।

প্রতীক নিয়ে জল্পনা যখন তুঙ্গে, অজিত'দার সঙ্গে দিল্লি থেকে ফিরতে ফিরতে ছবি আঁকতে শুরু করলাম। প্রথম থেকেই মাথায় ছিল, তৃণমূল শব্দটার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'গ্রাসরুট'-কে নিয়ে আসা। ভাবতে ভাবতেই মাথা থেকে বেরিয়ে এল 'ঘাসফুল'। যা জোড়াফুল হিসেবে একই বৃন্তে ফুটে রয়েছে। রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলায় যে প্রতীক আমরা বেছে নিয়েছিলাম কৃষ্টি-সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে।

১ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র, দলের রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনী প্রতীক পাওয়ার কথা ছিল। ৩১ ডিসেম্বর রাতে অজিত'দাকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি পৌঁছোলাম। কমিশনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেদিন বিকেলে চারটেয় নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারির কথা ছিল। তার আগে বেলা ১২টা নাগাদ কমিশন থেকে আমাদের বহু প্রত্যাশিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত সম্মান পেয়ে গেলাম।

আমি, অজিত'দা, মুকুল, রতন'দা যখন কমিশন থেকে প্রতীক নিয়ে বেরোচ্ছি, তখন বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদমাধ্যম। তাদের আমাদের প্রতীকের ছবি চাই। জানতাম, ১ তারিখ প্রতীক পাব। তাই অজিত'দা আগে থেকেই গোপনে কতগুলো বড় ও ছোট সাইজের প্রতীক নিয়ে এসেছিলেন। আমরা সেগুলো হাতে উঁচু করে তুলে ধরে কমিশন থেকে বেরোলাম।

প্রতীক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে এল গুরুদায়িত্ব—যাতে ওই প্রতীক চিরস্থায়ী হয়।

১ জানুয়ারি ১৯৯৮। আমাদের কাছে এক পবিত্র দিন। সেদিন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কল্পতরু উৎসব এবং রমজান মাসের প্রথমদিন। সংহতির মেলবন্ধনে তৈরি হল ইতিহাস—একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।

রাজনৈতিক নবজন্ম হল আমার। আমাদের।

৭

এনডিএ এবং...

১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির মাত্র একমাস ২২ দিনের মাথায় সাতজন সাংসদ নিয়ে আমরা লোকসভায় গিয়েছিলাম। তখনও মন্ত্রিত্বে যাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ এসেছিল। কিন্তু তা সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, মানুষের কাছে 'জনাদেশ' নিয়েছিলাম, আমরা বাইরে থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারকে সমর্থন করব।

শেষপর্যন্ত তা-ই করেছিলাম। যেদিন মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে অটল'জির সরকার পড়ে গেল, সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। অকারণ, আবার ১৩ মাসের মধ্যে মানুষের কাছে ভোট চেয়ে তাঁদের বিরক্ত করতে হবে। তবুও মনকে শক্তিশালী করে আবার ময়দানে নেমেছিলাম।

১৯৯৯ সালে আমরা আটজন সাংসদ নিয়ে লোকসভায় গিয়েছিলাম। সাংসদের সংখ্যা যেমন একজন বেড়েছিল, তেমনই জনাদেশেও খানিকটা বদল হয়েছিল। এ বারের জনাদেশ ছিল সরকারে যোগ দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার।

ভোটের ফল বেরোনোর পর দিল্লি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন যশোবন্ত সিংহ। আমায় দেশের রেলমন্ত্রী হতে হবে। রাজি হলাম।

যে একবছর পাঁচমাস রেলমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিলাম, রেলের সমস্ত অফিসারদের থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম, ন্যায়নিষ্ঠভাবে অন্তত সকলের জন্য কাজ করতে। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে আসার পর অনেক দলেরই সাংসদরা আমায় বলতেন, ফিরে যেতে। আমার কাছে তাঁরা অনেক 'কাজ' পেয়েছেন। মনে হত, সেটাই আমার সবচেয়ে

বড় পাওনা।

তহলকা-কাণ্ডে ইস্তফা দিয়ে চলে আসা উচিত ছিল কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত শুনেছি পরবর্তীকালে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মতামত ব্যক্ত করাটাও স্বাভাবিক।

বাংলার মানুষ নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন, আমরা মন্ত্রিসভায় থাকি। কিন্তু তহলকা-দুর্নীতির প্রশ্নে একটা বিবেক দংশন হয়েছিল। তাই ওই বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল দলে। সেখানে সমস্ত সাংসদই উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভা বা এনডিএ ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত আমার একার ছিল না। সকলে মিলেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

দিন বদলেছে। চিন্তাধারাও বদলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এনডিএ বা মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে আসা যে ঠিক হয়নি তখন, তা আমি নিজেই পরবর্তীকালে একাধিক বার প্রকাশ্যে, জনসভায় বলেছি। কিন্তু সেইসময় যাঁরা আমায় স্বার্থপর, নীতিহান, আদর্শহীন-সহ বিভিন্ন বিভূষণে ভূষিত করেছিলেন, তাঁরা কি জানতেন না, ভোগবাদীদের কাছেই মন্ত্রিত্বটা বড় হয়ে দেখা দেয়? দুর্নীতির সঙ্গে আপস করব না বলে আমি এবং আমরা যে দেশের রেলমন্ত্রিত্বের মতো একটা পদ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিলাম, তার কোনো দাম রইল না?

গত পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ভেঙে বাংলার প্রাপ্য বাংলার জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। তার জন্য আমি কোনো কৃতিত্ব দাবি করি না। কারণ সেটা আমার পবিত্র কর্তব্য। আমি শুধু নীরবে একটার পর একটা প্রকল্পের কাজ করে গিয়েছি। কিন্তু তার জন্য তো সাধুবাদ দূরের কথা, একটার পর একটা কটূক্তি শুনেছি। বাংলার জন্য কাজ করতে গিয়ে একদিকে রাজ্যে তৎকালীন শাসকদলের অসহযোগিতা, অন্যদিকে দিল্লিতে পরিকল্পনা প্রসূত প্রচার—যেখানে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমি শুধুই বাংলার স্বার্থ দেখি—দু'টোর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে আমাকে।

প্রচার ছাড়া নিভৃতে কাজ করতাম আমি। ঘরশত্রু বিভীষণরা তো কিছু না কিছু বলবেই, কিন্তু নিজেদের লোকেরা তো অন্তত স্বীকৃতিটুকু দিতে পারত।

অন্য রাজ্যকে আমি কখনো তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিনি। তাদের জন্য কিছু করলে তারা মাথায় তুলে রাখত। ওদের দেখতাম আর ভাবতাম, তারা রাজ্যের স্বার্থে সকলে এককাট্টা। অথচ আমাদের রাজ্যে এমনটা হয় না!

মনে আছে, রেলভবনে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটা 'মউ' সাক্ষরের অনুষ্ঠান ছিল। কর্নাটকের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, "এর আগে আমাদের রাজ্য থেকে ছ-জন রেলমন্ত্রী হয়েছেন। আমরা মনে করি, মমতা'দিদি আমাদের রাজ্যের সপ্তম রেলমন্ত্রী।" সেই আন্তরিকতা আর ভালোবাসা দেখে মন ভরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কর্নাটকের জন্য আরও কিছু করি।

রেলভবনে দু-বার থাকাকালীন কারও পয়সায় কোনোদিন এক কাপ চা-ও খেতাম না। আমার ব্যক্তিগত সরকারি সহকর্মীর মধ্যে বাংলার ক্যাডারের আইএএস অফিসার সুনীল চতুর্বেদী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। ছিলেন গৌতম সান্যাল। এখন যিনি আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। রতন'দা তো আমি যেদিন থেকে সাংসদ হয়েছি, সেদিন থেকেই আমার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে কাজ করে আসছেন। তিনি এখনো আমার সঙ্গে কাজ করেন।

এনডিএ আমলে রেলমন্ত্রী থাকার সময় আমি রেলভবনে থাকলে আমার কাছে দিল্লির বাড়ি থেকে মুড়ি আর বিউলির ডালের বড়া পাঠানো হত। আমি এবং আমার সহকর্মীরা মিলে ১০ মিনিট সময় বার করে নিয়ে সেটা ভাগ করে খেতাম। সারাদিনের কাজের ক্লান্তি ভুলিয়ে দিত ওই ১০টা মিনিট। অনেকেরই ধারণা, রেল দফতর হাতে থাকা মানেই এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী। রেল ক্যান্টিনের মুখরোচক খাবার থেকে শুরু করে হাসপাতাল, জেনারেল ম্যানেজারের আরামদায়ক সেলুন-কারে ভ্রমণ—সব হাতের মুঠোয়। কিন্তু আমি কখনো সে সবের দিকে ফিরে তাকাইনি। কারণ আমি জানি, লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু। তাই মন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে রেলভবন ও রেল দফতরে ছিলাম। তাই কখনো রেলের পয়সায় অতিথিদের ভূরিভোজে আপ্যায়ন করিনি। ফলে মন্ত্রী হিসেবে আমার বেতনের প্রায় পুরোটাই খরচ হয়ে যেত। সাংসদ থাকাকালীনও কখনো বিমানের এগজিকিউটিভ ক্লাসে যাতায়াত করিনি। সবসময় যাতায়াত করেছি ইকনমি ক্লাসে। সরকারের খরচ বাঁচাতে। অথচ যে কোনো সাংসদই বিমানের আরামদায়ক এগজিকিউটিভ ক্লাসে ভ্রমণের অধিকারী। পদাধিকার বলেই।

মন্ত্রী হওয়ার সময় ব্যাংকে কিছু টাকা ছিল। সবটাই সাংসদের বেতন থেকে বেঁচে-যাওয়া। কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার পর বেতন এবং দৈনিক ভাতা বাবদে যা

পেতাম, তার পুরোটাই খরচ হয়ে গিয়েছিল। গুজরাতে বিশাল ভূমিকম্পের সময় প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে সমস্ত মন্ত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছিল, তাঁদের একমাসের বেতন ত্রাণ তহবিলে জমা দিতে। আমি দিয়েছিলাম ছ-মাসের বেতন। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে যার ফলে আবার জানতে চাওয়া হল—আমি এত টাকা দিয়ে দিচ্ছি কেন? মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছি না তো? আমি বলেছিলাম, মন্ত্রিত্ব ছাড়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা আমার একেবারেই নিজস্ব বিষয়। নিজেরই সিদ্ধান্ত।

মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে আসার কিছুদিন আগে রতন'দা বলেছিলেন, "আপনি কিন্তু আর ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন না। মাত্র দেড়হাজার টাকা পড়ে আছে আপনার অ্যাকাউন্টে!"

রেল বাজেটের একমাস আগে থেকে আমরা প্রায় ভোট চারটে-পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করতাম। তখন রেলভবন একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। ভূতের বাড়ির মতো। শুধু থাকতাম আমি, গৌতম'দা, রতন'দা। তাঁদের কিছু স্টাফ এবং বাজেট সেকশনের অফিসার-স্টাফরা। তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। মাঝেমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে গিয়ে চা খেয়ে আড্ডা দিয়ে আসতাম। স্রেফ তাঁদের মনোবল বাড়ানোর জন্য।

রেলমন্ত্রিত্ব করতাম দিল্লিতে বসে। কিন্তু মন পড়ে থাকত বাংলায়। পুরুলিয়ায় গিয়েছিলাম 'রূপসী বাংলা' ট্রেনের শুভারম্ভ করতে। সেখানেই খবর পেলাম, আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী বিকাশ বসু খুন হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কর্মসূচি শেষ করে বিকাশের মরদেহের কাছে ফিরে এসেছিলাম। একইভাবে, উত্তরবঙ্গে 'ময়নাগুড়ি-যোগীঘোপা' নতুন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করতে গিয়ে খবর পেয়েছিলাম, কেশপুরে আমার ছ-জন সহকর্মী নিহত। সেখান থেকে মালদহে এসে, সড়কপথে হাওড়া এসে আবার হাওড়া থেকে মেদিনীপুর পৌঁছেছিলাম। সেদিনই মনে হয়েছিল, দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিশেষ রেল যোগাযোগ নেই। বিশেষ করে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার। দ্বিতীয় রেলবাজেটে সেদিকে নজর দিয়েছিলাম।

রেল দফতরে অবশ্য একটা গোষ্ঠী বরাবরই আমার বিরুদ্ধে সরব ছিল। তারা চাইত, আমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে চলে যাই। তাদের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে সচেষ্ট হয়েছিলাম আমি। কিন্তু সমস্ত ইউনিয়ন থেকে শুরু করে রেলের অফিসার

এবং শ্রমিকরা আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা ছিলেন।

রেলে কাজ যেমন সবচেয়ে বেশি, ঝামেলাও সবচেয়ে বেশি! দুর্ঘটনা ঘটলেই মন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করতে এক মুহূর্তও দেরি করেন না কেউ। যেন ট্রেন চালান চালক নন, রেলমন্ত্রী। তবে বড় দুর্ঘটনা ঘটলে মন্ত্রী থেকে শুরু ক.রে সকলেরই একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকে। সেটা অনস্বীকার্য। রাতে ফোন বাজলেই শঙ্কিত হতাম। বাড়িতে বা দফতরে—'পিঙ্ক স্লিপ' দেখলেই বুঝতাম, দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই আগে জেনে নিতাম, কোনো হতাহত আছে কি না। নিহত হলে তার সংখ্যা কত। আহতদের সংখ্যা কত। সাধারণত রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়েই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটত।

কিন্তু হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পরেও রেল দফতরে ষড়যন্ত্রকারীদের কমতি ছিল না। অবশ্য কেউ সৎভাবে কাজ করতে চাইলে তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা তো হয়েই থাকে। আশ্চর্য কী যে, কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা তাকে ফাঁদে ফেলে তাকে সরাতে চাইবে! লিখতে বসে অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির শপথ রয়েছে বলে লিখতে পারছি না। কোনোদিন সময়সুযোগ পেলে, তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে নিশ্চয়ই বলব।

২০০১ সালের ১৫ মার্চ তহলকা কেলেঙ্কারিতে আবেগাপ্লুত হয়ে আমরা মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। দলীয় সাংসদরা সকলে সাংসদ আকবর আলি খোন্দকারের বাড়িতে বসে একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

অনেকদিন ধরেই মনে হচ্ছিল, নিজের স্বাধীন চিন্তাভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে পারছি না। সহযোগিতারও অভাব হচ্ছিল। মানসিক অশান্তিতে নিজের অগোচরেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। ইস্তফা দিয়ে যখন দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরে এলাম, সাংবাদিকরা তখন প্রশ্ন করেছিলেন—কেমন লাগছে?

বলেছিলাম, "মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আমি মুক্তবিহঙ্গ হয়ে গিয়েছি। এতদিন মনে হচ্ছিল, খাঁচায় বন্দি ছিলাম। হাতে-পায়ে বাধ্যবাধকতার শিকল পরানো ছিল। এখন আমি মুক্ত। হাসতে হাসতে চলে এসেছি বাংলা মায়ের কোলে। একটু আশ্রয়ের জন্য।"

কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছেড়ে চলে আসার পরেই ষড়যন্ত্র আরও বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা এনডিএ সম্পর্কে আমরা একটিও কটূমন্তব্য করিনি। ইস্তফা দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী এক দূত এসেছিলেন আমার

কাছে। আমায় বুঝিয়ে বিরত করার জন্য। আমি তাঁকে বলে দিয়েছিলাম, "আমরা আপনাদের শত্রু নই। কিন্তু একেবারেই রাজনৈতিক কারণে এনডিএ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। কখনো যদি মনে করেন, সরকারের অনিশ্চয়তা এসেছে, আমাদের জানাবেন। আমরা বিনা দ্বিধায় আপনাদের পাশে দাঁড়াব। আমাদের যেন প্রধানমন্ত্রী ভুল না-বোঝেন।"

প্রথম থেকেই আমরা অটল'জির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তিনি এক প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং ভালো মানুষ। আমাদের প্রতিও তিনি বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলেন। এমনকী, আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের টালির চালের বাড়িতেও এসেছিলেন। ফলে আমার তো বটেই, আমার পরিবারেরও একটা কৃতজ্ঞতা তাঁর প্রতি আছে। তা মা বারবার বলতেন, "যতই যা হোক, অটল'জিকে ভুল বুঝিস না। উনি তোকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলেও হয়তো সাহায্য করে উঠতে পারেন না। ওঁর কোনো অসুবিধার জন্য।"

এটা ঠিক যে, বাংলার মানুষ মন্ত্রিসভা থেকে চলে-আসাটা ভালো ভাবে নেননি। কারণ, আমরা মন্ত্রিসভার থাকায় বাংলার জন্য কিছু কাজ হচ্ছিল। তাঁরা দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্যে তখন বিধানসভা নির্বাচন এসে গিয়েছে। তাই পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছিল ওই সিদ্ধান্ত নিতে।

ফিরে এসে নির্বাচনী ময়দানে নামার পালা। তাদের ছেড়ে আসায় এনডিএ আমাদের ভুল বুঝল। সেই সুযোগে আমাদের সঙ্গে জোট বাঁধতে এল কংগ্রেস।

নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের এক নেতা শুধু মহাজোটের কথা বলতেন। নির্বাচনের সময় তাঁদের শর্ত ছিল : বিজেপি-কে সঙ্গে নেওয়া যাবে না। যিনি মহাজোটের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ওকালতি করতেন, ভোটের আগে দেখলাম, শুধু মহাজোটের বিরোধিতা করাই নয়, নিজের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য তিনি তাঁর পরিবারের কোনো কোনো সদস্যকে দিয়ে আমার কাছে বার্তা পাঠাতে লাগলেন, যাতে তাঁর প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আমি প্রার্থী না-দিই। এমনকী, সেইসব কেন্দ্রে বিজেপি-ও যাতে প্রার্থী না-দেয়, তার জন্যই তিনি কোমর বেঁধে নেমেছিলেন।

এনডিএ আমাদের ভুল বোঝার পর আমি আমাদের দলের অনেক নেতাকে বলেছিলাম, কারও সঙ্গেই জোট গড়ার দরকার নেই। আমরা একাই সিপিএমের

বিরুদ্ধে লড়তে পারব। কিন্তু যাঁরা ভোটে লড়বেন, তাঁদের অনেকেই মনে করছিলেন, সিপিএম সহ বেশকিছু দলের যৌথ সংগঠন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য একটা জোট দরকার।

প্রার্থী-সহ বিভিন্ন আলোচনা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি পরিচালনার জন্য আমি তখন নিজাম প্যালেসে সাময়িক আস্তানা নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে কোনো এসটিডি-যুক্ত ফোন আমার ঘরে ছিল না। তাই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট চূড়ান্ত করার আগে আমি আমাদের দলের এক সিনিয়র সাংসদকে বলেছিলাম, তাঁর বাড়ি থেকে যেন তিনি প্রধানমন্ত্রী অটল'জিকে বলে দেন, বিজেপি-র জন্য রাজ্যে আমরা ৩৯টা আসন ছেড়ে রাখছি। প্রধানমন্ত্রী কাউকে দিল্লি থেকে পাঠালে তাঁর হাতে আমরা আসনগুলোর তালিকা দিয়ে দিতে পারি।

উনি আমায় আশ্বস্ত করে উধাও হয়ে গেলেন! তারপর খবরের কাগজে দেখলাম তাঁর বিদ্রোহের খবর। তখন আমি মুর্শিদাবাদ থেকে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে প্রচার সেরে বীরভূমে পৌঁছেছি। সন্দেহ হয়েছিল, ওই চক্রান্ত সিপিএম ঠিক করে দেয়নি তো? কারণ সংশ্লিষ্ট সাংসদকে অনুরোধ করার আগে প্রধানমন্ত্রীর এক দূতের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। সেই দূত আমায় বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দিলে তিনি কলকাতায় আসবেন। আমি যেন আমার দলের কোনো সাংসদকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দেন। আমার ঘরের ফোন থেকে এসটিডি করা যাচ্ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর দূতের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম এক সহকর্মীর সেলফোন থেকে।

নির্বাচনের পর যখন প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাটা বলেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, তাঁর দূত তাঁকে আসার আসন ছাড়ার ইচ্ছের বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি-র স্থানীয় নেতারা আসন নিতে চাননি।

কেন সেদিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার 'সদিচ্ছা'র কথা না-জানিয়ে নিজে মন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি দলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছিলেন, কাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার বিরুদ্ধে একতরফা অভিযোগ করে, দলের কর্মীদের অপমান করে প্রচারের আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন?

নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের জন্যও তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আসেননি। আমি নিজে ৪০-৫০ বার ফোন করেছিলাম। ফোন ধরেননি। তাঁর দাদাকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম। আমাদের সাংসদ কৃষ্ণা বসুর মারফত চিঠি

পাঠিয়েছি। কোনো সাড়া মেলেনি। আমি কোথাও কোনো ত্রুটি রাখিনি। কিন্তু বুঝেছিলাম, সবচেয়ে বড় ত্রুটি আমার ছিল ওঁকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠানোর সিদ্ধান্তটা।

নির্বাচন হচ্ছে একটা রাজনৈতিক যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে যে সামনের সারিতে থেকে ব্যক্তিস্বার্থে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার জন্য কোনো উপযুক্ত বিশেষণ আমি খুঁজে পাইনি।

যারা আমাদের উঠতে-বসতে বিরোধিতা করেছিলেন, ন্যূনতম সৌজন্যের শালীনতা না-রেখে আমাদের ধান্দাবাজ এবং স্বার্থপর বলেছিলেন, তাঁদেরই মতো কয়েকজনের জন্য আমাদের কংগ্রেসের সঙ্গে তখন জোট গড়তে হয়েছিল। ভদ্রতা এবং সৌজন্যের খাতিরেই নামগুলো লিখে তিক্ততা বাড়াতে চাই না। আমার ধৈর্যের সীমা কেউ কেউ অতিক্রম করলেও আমায় সংযম রাখতেই হয়। সেটাই সৌজন্য।

তাঁদের জন্যই দিল্লি থেকে উড়ে এলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসনেতা কমল নাথ। প্রথমদিন প্রায় ঘণ্টাদুয়েক আলোচনা হল। আসন সমঝোতা নিয়ে। আমাদের দিক থেকে একটাই শর্ত ছিল—কংগ্রেস যদি সত্যি সত্যিই রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির লড়াই লড়ে সিপিএমের বিরুদ্ধে, তবেই আমরা তাদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যেতে পারি। কমল নাথ ইতিবাচক জবাব দিয়ে বলেছিলেন, "এই তো ব্যাঙ্গালোরে অধিবেশনে আমাদের প্রস্তাব পাস হয়েছে যে আমরা একাই চলব। সিপিএমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না।"

আমাদের প্রশ্ন ছিল, বিহার, তামিলনাড়ুতে সিপিএম-কংগ্রেস একসঙ্গে লড়াই করে বাংলায় সিপিএম-বিরোধিতা করবে? এটা কি দ্বিচারিতা নয়? কমল নাথ তখনো বলেছিলেন, ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের পর আর সিপিএমের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা হবে না।

আলোচনা শুরু পর অবশ্য বুঝলাম, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের চারটি গ্রুপকে খুশি করতে গিয়ে ওদের জেতা আসনগুলোর বেশিরভাগই দিয়ে দিতে হবে। আমরা লড়ব শুধু হেরো আসনে। আর ওঁরা লড়বেন শুধু জেতা আসনে। প্রায় ৬৩টি আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া হল। আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া না-হলে ওরা ১০টি আসনও জিতত কি না, সন্দেহ। কিন্তু রফাসূত্রের তালিকায় আমার এবং কমল নাথের যৌথ স্বাক্ষর সত্ত্বেও তার প্রায় ৯০ ভাগ আসনে

কংগ্রেস কোথাও অর্থব্যয় করে তাদের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী আবার কোথাও কোথাও এনসিপি-র প্রার্থী দিয়ে দিল। অল্প ভোটের ব্যবধানে আমরা বহু আসনে হেরে গিয়েছিলাম! এটা ঠিক যে, ভুলটা আমাদেরই ছিল। কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেছিলাম। ভাবিনি, ওরা কথার খেলাপ করবে। একদিকে সিপিএমের লাগামছাড়া সন্ত্রাসে প্রায় ৩৭টি কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থীরা ঢুকতেই পারল না। সকলকে জানানো সত্ত্বেও কেউ সাহায্য করেনি।

ষড়যন্ত্রকারীদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল। আমাদের গাছে উঠিয়ে মই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের কোনো সাহায্য পেলাম না। আরও যাদের কাছে সাহায্যের আশা করেছিলাম, তারাও আসল সময়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে ২০০১ সালে বাংলায় পরিবর্তনের স্বপ্ন সফল হল না। বাংলার ইতিহাস বলে, ১৯৭২ সালে কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখন রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেই ক্ষমতায় এসেছিল। আবার ১৯৭৭ সালেও রাষ্ট্রপতির শাসনেই ক্ষমতায় এসেছিল সিপিএম। মোরারজি দেশাই যে সমস্ত রাজ্য সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ ছিল তার অন্যতম।

নির্বাচনে আমাদের পরাজয় হল। অন্যায়ের কোনো বিচার হল না। যত দোষ নাকি সব আমাদেরই! বলা শুরু হল, তৃণমূল এবার শেষ। মাত্র চারবছরের একটা রাজনৈতিক দল কিন্তু তখনো মাথা উঁচু করে মানুষের কথা বলে। প্রধান বিরোধীদলের মর্যাদা পেয়ে প্রতিটি ইঞ্চিতে লড়াই করে সিপিএমের সঙ্গে। নির্বাচনে হারের সংকেত আমি আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকে বুঝতে দিইনি। যদি সহকর্মীদের মনোবল ভেঙে যায়। যেখানে ভোট মেশিনারির প্রায় পুরোটাই একটি পক্ষের হয়ে কাজ করে, সেখানে আর ভোট হয় না। অনেক বিধানসভা কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের একটা পয়সাও দিতে পারিনি। ভোটের দিন সিপিএম বিভিন্ন জেলায় আমাদের প্রার্থীদের রাইফেলের নলের সামনে দাঁড় করিয়ে আমার কালীঘাটের দফতরে ফোন করিয়ে বলেছে, ভোট খুব ভালো হচ্ছে! কিন্তু যখনই শুনেছি, ভোট পড়েছে ৯০ বা ১০০ শতাংশ, তখনই বিষয়টা জলের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একমাস ধরে অক্লান্ত প্রচার করেছিলাম। রোদ-ঝড়-জল-বৃষ্টিতে। রেলমন্ত্রিত্ব ছেড়ে আসার পর আর ট্রেনে উঠতাম না। তাই প্রচণ্ড গরমে কখনো প্রখর বর্ষায়ও সড়কপথে দক্ষিণ থেকে উত্তরবঙ্গ সফর করেছিলাম ভোটের প্রচারে।

নির্বাচনী ফলাফলে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলাম। রাতের পর রাত ঘুমোতে পারতাম না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগত না। ভেটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই আমার ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলাম পঙ্কজ'দার কাছে। তিনি দৌড়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি তো সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ। আমরাই পারিনি।"

মাসখানেক কিছু খেতেও ভালো লাগত না। এই পরাজয়ের পর আর রাজনীতি করারও ইচ্ছে ছিল না। শুধু মা বলেছিলেন, "ভাবিস না। তোরা হারিসনি। তোদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই ভেঙে পড়লে যারা তোকে ভালোবাসে, তাদের কী হবে?"

কর্মীদের মনোবল জোগাতে ভোটের ফল বেরোনোর ১০দিনের মাথায় বিভিন্ন জেলার নেতৃত্বকে ডেকে মিটিং করা শুরু করেছিলাম। বিরোধী দলনেতা নির্বাচন-সহ অন্যান্য কাজও করেছিলাম। নির্বাচিত বিধায়কদের ডেকে বৈঠকও করেছিলাম।

ভোটের পর যখন কংগ্রেস একতরফাভাবে আমায় এবং তৃণমূলকে আক্রমণ করতে শুরু করল, সেদিনই আমরা বুঝেছিলাম, কংগ্রেস কোনোদিনই সিপিএমকে ছাড়তে পারবে না। তাই সে বছরের ২১ জুলাই আমরা 'একলা চলা'র সিদ্ধান্ত নিলাম। দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্বও সমস্তটাই জানতেন।

সেইসময় একলা চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা লাভ হয়েছিল। কারও উপর নির্ভর না-করে আমার নিজেদের মতো করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। যার ফলে একটা তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি হয়েছিল। যারা আগামীদিনে বাংলায় রাজনীতি করবে।

২১ জুলাই সমাবেশের পর রাতে কৃষ্ণা'দির বাড়িতে যে দলীয় বৈঠক হল, সেখানে দলের সাংসদরা আলোচনা করছিলাম, পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। সাংসদদের যুক্তি ছিল, নির্বাচনকে ঘিরে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে রাজ্যে আমরা একলাই চলব। কিন্তু দিল্লিতে এনডিএ-কে সমর্থন দেওয়াটাই ঠিক হবে। তারপরেই সংসদের বাদল অধিবেশন। ফিরে এসেই আবার পালন করতে হবে ৯ অগস্ট। তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর থেকেই আমরা মেদিনীপুর জেলার কোনো না কোনো প্রান্তে ঐতিহাসিক ৯ অগস্ট দিনটা পালন করে থাকি। ২০০১ সালে কাঁথির তৎকালীন বিধায়ক শিশির অধিকারী প্রস্তাব দিলেন,

ওইদিনটা কাঁথির ময়দানে করলে ভালো হয়। সেইমতোই পরিকল্পনা করে দিল্লিতে গেলাম।

তখনই একদিন সংসদে জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে দেখা। তখন তিনি মন্ত্রী নন, এনডিএ-র আহ্বায়ক। জর্জের সঙ্গে প্রথামতো নমস্কার বিনিময় হল। তাঁকে দেখেই মনে হল, তহলকা প্রশ্নে আমরা এনডিএ ছেড়ে গিয়েছিলাম আর তাঁকেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ছাড়তে হয়েছিল। ভেবে খানিকটা খারাপ লাগছিল। কুশল বিনিময়ের পর জর্জ বললেন, আমার সঙ্গে একবার আলোচনায় বসতে চান। তিনি কি আমার বাড়িতে আসবেন? আমি বললাম, "আমিই আপনার বাড়িতে যাব।"

সেদিন প্রায় দু-ঘণ্টা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে জর্জ'জিকে অনুরোধ করলাম ৯ অগস্ট আমাদের কাঁথির সভায় আসার জন্য। উনি রাজি হলেন। কাঁথির সভায় তিনি সর্বসমক্ষে তৃণমূলকে এনডিএ-তে ফিরে আসতে আহ্বান জানালেন। বিশাল সভা হয়েছিল। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দেখে জর্জ'জিও বোধহয় দিল্লিতে জানিয়েছিলেন। ২৭ অগস্ট দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে এনডিএ-র যে সভা হল, সেখানে তৃণমূলকে এনডিএ-তে নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। শুনেছি, ওই সভার দিন বড় একটি রাজনৈতিক দল প্রস্তাব গ্রহণ করার চেষ্টা করেছিল, এনডিএ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তৃণমূলকে দুঃখপ্রকাশ করতে হবে। সভা থেকে বেরিয়ে জর্জ'জি আমায় প্রশ্ন করেন, তৃণমূল কি দুঃখপ্রকাশ করবে? আমি প্রশ্ন করি, কোন দল? জর্জ'জি বললেন, "তুমি আন্দাজ করে নাও।" আমি একটা দলের নাম বললাম। ঠিকই বললাম। আমি দলের তরফে জর্জ'জিকে বললাম, "দুর্নীতির প্রশ্নে তৃণমূল এনডিএ ছেড়েছিল। নীতিগত ভাবে। এমনকী, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তৃণমূল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে বাজপেয়ী'জিকে সমর্থনের কথা বলায় আমরা পাঁচমাস এনডিএ-র বাইরে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটা বিরূপ মন্তব্য করিনি। এনডিএ-র বিরুদ্ধে ভোটও দিইনি সংসদে। ফলে দলের কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে মাথানত করে এনডিএ-তে ঢুকতে গেলে আমরা দরকারে বাইরে থাকতেও প্রস্তুত।"

পরে শুনেছিলাম, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে তৃণমূলকে মর্যাদার সঙ্গেই এনডিএ-তে নেওয়া হয়েছিল।

আবার শুরু হল একটা অধ্যায়। এসে গেল পুজোর মরশুম। ভাইফোঁটার পর আবার শুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। এসে পড়ল রাম জন্মভূমি প্রশ্ন। বাজেট অধিবেশনে অতিরিক্ত করের বোঝা এবং গুজরাত। বাজেটে সাধারণ মানুষের উপর বোঝা চাপানোয় আমি চাঁচাছোলা ভাষায় লোকসভায় বক্তৃতা করলাম। স্বভাবতই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আমার উপর চটলেন। এবং ক্ষোভ প্রকাশের জন্য তিনি এনডিএ-র বৈঠককে বেছে নেবেন, ভাবিনি।

এনডিএ-র বৈঠক চলাকালীন অর্থমন্ত্রী বললেন, এক শরিক নেত্রী এমন ভাষণ দিয়েছেন যে, বিরোধীরা সে ভাবে লোকসভায় বলেনি। আমার মনে হল, তিনি তো আমার কথাই বলছেন! সরাসরি বৈঠকে বললাম, "মানুষের হয়ে কথা বলা অপরাধ হলে ঠিক আছে। কিন্তু দয়া করে অর্থমন্ত্রী জানান, যে ভাষণটা আমিই দিয়েছি। এটা তো সকলের জানা উচিত। আর আপনি যদি মনে করেন, আমার স্বাধীন মতামত দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেবেন, তা হলে প্রতিবাদস্বরূপ আমি এই বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

বলে আমি বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলাম। ফারুক আবদুল্লা, রামবিলাস পাসোয়ানরা অনুরোধ করলেন বৈঠকে ফিরে যেতে। আমি জানালাম, সভা চলাকালীন সকলের পিছনে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। বৈঠকে আর অংশ নিইনি।

কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, কতগুলো ব্যাপারে মতের অমিল হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আমাদের স্নেহ করেন ঠিকই। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন আমাদের আদৌ পছন্দ করেন না। এনডিএ-র সঙ্গে সংঘাত আমি চাইনি। রাজনীতি করতে গেলে সমস্ত দলেরই কিছু বাধ্যবাধকতা থাকে। জাতীয় দলগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলোর তফাত হল—রাজ্যের স্বার্থই তাদের কাছে প্রথম প্রাধান্য। এখন কেন্দ্রে জোট সরকারেরই যুগ। সেখানে বিভিন্ন দলের মতামতকে সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্নেই গুরুত্ব দিতে হবে। কোনো ইগো না-রেখে সকলের মতামতই উদার হয়ে গ্রহণ করতে হয়। জোট রাজনীতিতে সমস্ত দলেরই মনে রাখা উচিত—রাজনীতিটা শুধু আজকের নয়। আগামীদিনেরও।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল তৈরির পর যখন প্রথম বিজেপি-র সঙ্গে আমাদের আসন সমঝোতা হল, তখন খুব কাছ থেকে দেখে তাঁদের ব্যবহারে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁদের পরিবারের আচার আচরণেও মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

আডবানি'জির স্ত্রী'কে আমি 'দিদি' বলে ডাকি। আর উনি আমায় ডাকেন 'দোস্ত' বলে।

পাঁশকুড়া, নির্বাচনে বামফ্রন্ট হেরে যাওয়ার পর থেকেই তাদের হৃতজমি পুনরুদ্ধার করার জন্য সিপিএম সশস্ত্রবাহিনী তৈরি করল। কেশপুরের সরুই, নেড়াদেউল, গোপীনাথবাটি, গরদজপোতা, বিকলচক, অমরীশপুর, এলোনি—গ্রামের পর গ্রামে কান্নার রোল। কেউ কাঁদছে না খেতে পেয়ে। কেউ কাঁদছে তার সন্তানদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে না পেরে।

২০০১-এর ৩ জানুয়ারি কেশপুরে আমাদের সভা ছিল। সেই সভার জন্য দাসপুরে দেওয়াল লিখছিল আমাদের গৌড় খাঁড়া। সেটাই তাদের অপরাধ। ধারাল অস্ত্র দিয়ে গৌরের জিভটা কেটে নিয়েছিল সিপিএম। আমরা ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ওকে চিকিৎসা করাই। তারপর দিল্লিতেও নিয়ে গিয়েছিলাম। এমন কত কত নাম! কত ঘটনা! কেশপুরের গৌর খাঁড়া, বর্ধমানের জামালপুরের ফিরদৌস।

মনে আছে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কেশপুরের এক সভা থেকে ফেরার পথে পুলিশের সামনেই সিপিএমের আক্রমণে আমাদের প্রচুর সমর্থক আহত হল। আমিও তাদের রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়ালাম সারারাত ধরে। কলকাতা ও অন্যান্য জেলা থেকে যে সমস্ত বাসগুলোয় আমাদের সহকর্মীরা গিয়েছিলেন, সেই বাসগুলোকে আক্রমণ তো বটেই, সে সব গাড়ির চালকরা যাতে স্টিয়ারিং ধরতে না-পারে, সে জন্য অনেক চালকের হাত মেরে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল।

ঠিক যেমন বাঁকুড়ার বৈতলের সভা করে ফেরার সময় দেখেছি আমাদের সভা ঘিরে বাঁশবনের আড়াল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়েছে সিপিএমের ক্যাডাররা। প্রশাসনকে বারবার বলা সত্ত্বেও তারা কোনো কান দেয়নি। বাধ্য হয়ে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৈতলের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা গাড়ি পার করিয়েছি। যে সিপিএম ক্যাডাররা আমার সহকর্মীদের তাক করে গুলি ছুড়ছিল, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করেছি!

এমন প্রতিটি ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো সত্ত্বেও মাত্রই একবার এনডিএ আহ্বায়ককে মেদিনীপুরে পাঠানো ছড়া কোনো সহযোগিতা পাইনি।

মনে পড়ে অনেক ঘরছাড়া মানুষকে নিয়ে গোপীনাথপুর-শিহড়ে (বাঁকুড়া জেলায়) তৈরি ত্রাণশিবিরে গিয়েছিলাম। শিশুদের পড়াশোনা বন্ধ। মহিলারা

এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন। শিবিরের কথা বলে প্রশাসনকে অনুরোধ করে এসেছিলাম তাদের রক্ষা করতে। প্রশাসন কথাও দিয়েছিল। আমি জয়রামবাটি, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, গড়বেতা হয়ে মেদিনীপুরের রানি শিরোমণি গেস্ট হাউসে ফিরে এসেছিলাম। পরদিন সকাল থেকেই খবর পাচ্ছিলাম, শিহড়ের ত্রাণশিবির আক্রান্ত। মহিলা-শিশুদের বাঁচাতে গিয়ে একাধিক লোক নিহত। নিখোঁজও বেশকিছু। এমনকী, জয়রামবাটির কাছে রামকৃষ্ণ আশ্রমের যাঁরা প্রতিবাদ করেছিলেন, তাঁদেরও শাসিয়েছিল সিপিএম ক্যাডাররা।

সন্ধেবেলায় মেদিনীপুর থেকে রওনা হয়ে বৈতলের জঙ্গল ধরে যাচ্ছিলাম গোপীনাথপুর-শিহড়ের ত্রাণশিবির দেখতে। আগেরদিন যেখানে অসংখ্য মহিলা-শিশু দেখেছি, পরদিন সেখানে দেখলাম নিঝুম। কোথাও তৃণমূলের পতাকা নেই। একটা দেওয়াল লিখনও নেই। সমস্ত ঘরে তালা। তখন আমি রেলমন্ত্রী। আমার সঙ্গে নিরাপত্তাবাহিনীর কয়েকজন। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দূরে দূরে মাচা বেঁধে বসেছিল সেইসব বহিরাগত বন্দুকবাজরা। যারা গ্রামের পর গ্রাম দখল করছিল। গভীর রাত পর্যন্ত এলাকার মানুষদের অভয় দিয়ে, তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এলাম মেদিনীপুরে।

কেশপুর, বৈতল, বীরভূমের নানুরের সুচপুরে ১১ জন সংখ্যালঘু গরিব মানুষকে একই সঙ্গে খুন—একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে আর আমি সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে গিয়েছি সেখানে। ভোটে হারিয়ে বামপন্থী ও অ-বামপন্থীরা পদে পদে আমাদের লাঞ্ছিত আর অপমানিত করেছে। দিল্লির সরকারের কাছে অপমানিত হতে হচ্ছিল। আমি লোকসভায় কোনো বিষয়ে বলতে চাইলেও এনডিএ-র তালিকায় আমার নাম রাখা হত না। দীর্ঘসময় অপেক্ষা করার পর হয়তো বলার সুযোগ পেতাম।

দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের আগে আলু আর পেঁয়াজের দাম খুব বেড়ে যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, পেঁয়াজের এই রাজনীতিতে বিজেপি কিন্তু ভোটে হেরে যাবে। উনি মানতে চাননি। ভোটের ফল অন্যকিছু বলেনি।

কখনো বিলগ্নীকরণ, কখনো পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, কখনো বা কোনো ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে নানা মতান্তর হচ্ছিল ক্রমাগত। মনে হত, এখানে যে-ই জনগণের হয়ে কিছু বলতে যাবে, সে-ই শত্রু হবে! তর্ক করতে গিয়ে

দেখতাম, আমি একেবারেই একা। একদিকে অভিন্ন কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে বিজেপি-র নিজস্ব এজেন্ডাগুলো রূপায়ণের চেষ্টা, অন্যদিকে শরিক দলগুলোর বড়মাপের দলের কাছে মাথানত করে থাকা (মন্ত্রিত্ব হারানোর ভয়ে)—দু'য়ে মিলে আমাদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এনডিএ-র কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাম জন্মভূমির মতো একটা বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এগোনো শুরু হল। আমি প্রশ্ন তুললাম।

এনডিএ-র কর্মসূচি-বহির্ভূত বিষয়গুলো প্রকাশ্যে আসতেই অন্যান্য শরিকদলের নেতারা আমায় অনুরোধ করলেন একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতে। তেলেগু দেশম পার্টির নেতা ইয়ারেন নাইডু, সংযুক্ত জনতা দলের দেবেন্দ্র যাদব, ফারুক আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে আমরা নিজেদের বোঝাপড়া বাড়ানো নিয়ে আলোচনা করতাম। একদিন এনডিএ-র বৈঠকে যে জন্য আমায় কথা শুনতে হল। বলা হল, আমি নাকি এনডিএ-র ভিতরে এনডিএ করেছি! আমি বললাম, তার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু এনডিএ থেকে যাতে দেশের উন্নয়ন আর ভালোটা হারিয়ে না-যায়, তার জন্য তো শরিকদলেরা মিলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেই পারে। অসুবিধার কী আছে? মনে পড়ল বাজপেয়ী'জির ১৩ মাসের সরকারের সময় শরিকদের সঙ্গে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ তখন সরকার একটা টলমলে অবস্থায় ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় যত সরকারের স্থায়িত্ব বাড়ল (লালু প্রসাদরা এনডিএ-তে আসার পর), তত বিজেপি-র কট্টরপন্থীরা 'ক্ষমতার চাবুক' মেরে সকলকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা শুরু করল।

তারপরেই শুরু হল গুজরাতের ভয়াবহ দাঙ্গা। আমি তীব্র প্রতিবাদ জানালাম। প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে বলে এলাম, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরান! তবু সংসদে সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্নে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিইনি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, মানসিকভাবে আমরা কতটা অসুখী ছিলাম গুজরাত-প্রশ্নে সরকারের পক্ষে ভোট দিতে গিয়ে।

এর মধ্যেই এসে পড়ল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

যখন কোনো সমাধান সূত্রই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দিল্লি থেকে ডাক পড়ল আমার। বাড়িতে পৌঁছতেই এলেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত। তিনি জানলেন, তাঁরা রাষ্ট্রপতি হিসেবে পি সি আলেকজান্ডারের কথা ভাবছেন। আমার ওঁর

প্রতি একটু আবেগ ছিল। কারণ, নরসিংহ রাওয়ের মন্ত্রিসভায় আমায় নেওয়ার ব্যাপারে আলেকজান্ডারের পরামর্শ ছিল। তাই তাঁর নামে আমি আপত্তি জানাইনি। কিন্তু আলেকজান্ডারের নাম নাকি 'সর্বসম্মত' হবে না। তখন আমি প্রস্তাব দিলাম, ভারতের পরমাণু বোমার জনক এপিজে আব্দুল কালামকে রাষ্ট্রপতি করা হোক।

আমার উপরেই ভার পড়ল কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলে কালামের নাম পাস করানোর। আলোচনা করে তা করালামও। তেলেগু দেশমও আপত্তি করল না। তাদের সঙ্গে আমার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ছিল। কালামের নামটাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল। সে জন্যই যেদিন এনডিএ-র বৈঠকে কালামের নাম রাষ্ট্রপতি পদের জন্য চূড়ান্ত হল, সেদিন প্রধানমন্ত্রী আমায় বৈঠকের পর ফোন করে খবরটা জানিয়েছিলেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন চলাকালীনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসে পড়ল রেল-বিভাজন।

তখন জল্পনা হচ্ছে, ১ জুলাই মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে এবং তৃণমূল আবার সেখানে যোগ দেবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকেও আমাদের তেমনই জানানো হয়েছিল। ঠিক তখনই রেল-বিভাজনের ব্যাপারটা প্রকাশ্যে এল। প্রধানমন্ত্রীকে জানালাম, এটা হতে পারে না! এই বিভাজন রেলের স্বার্থে নয়, ঐক্যের স্বার্থে নয়, রেল চলাচলের স্বার্থে নয়। এই বিভাজন দেশ বিভাজনের সমান। বাংলা থেকে রেলের দফতর অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ বাংলাকে বঞ্চিত করা। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের মাত্র ১৫ দিন আগে ১৪ জুন আচমকাই তৎকালীন রেলমন্ত্রী বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিলেন। নিশ্চিতভাবে সেই পরিকল্পনা করেই যে, এর পর ওই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তৃণমূল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যাবে না।

অত বড় একটা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে এল। কিন্তু বারবার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও শরিক হিসেবে তার কোনো মর্যাদাই দেওয়া হল না! মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সময় যাঁরা বারবার আমায় যোগ দিতে বলেছিলেন, তাঁদের বলেছিলাম, "প্রধানমন্ত্রী সত্যিই চাইলে আমরা দফতরবিহীন মন্ত্রিত্বেও থাকতে রাজি। কিন্তু রেল-বিভাজন বন্ধ করতে হবে। সম্মানজনক কোনো সমাধানসূত্র না বেরোনো পর্যন্ত আমরা আমাদের মতোই থাকব।" প্রধানমন্ত্রী নিজে বিষয়টি

দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন হঠাৎ শুনলাম, প্রধানমন্ত্রীর কথার তোয়াক্কা না-করেই রেলমন্ত্রী সংসদে লিখিতভাবে রেল-বিভাজনের বিজ্ঞপ্তির কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আমি দ্রুত সংসদে গেলাম এবং আমার বিরোধিতার কথা জানিয়ে এলাম। যদিও মনে হচ্ছিল, গোটা ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত। কিছুক্ষণ পর জর্জজি আমায় তাঁর ঘরে কথা বলতে ডাকলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর দফতরেরও একজন ছিলেন। দু'জনে আমায় নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, আগে আমি মন্ত্রিসভায় যৌগ দিই। তারপর মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মেনে নিলেই চলবে। জবাবে বললাম, "একদিকে বলছেন, মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবে। আবার রেলমন্ত্রী নিজেই তড়িঘড়ি সংসদে ঘোষণা করে দিচ্ছেন? তা হলে কোনটা ঠিক?"

ঘটনাচক্রে, একজন প্রায় মুখ ফস্কেই বলে ফেললেন, বিষয়টা মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা হবে, কথাটা স্রেফ মুখরক্ষার জন্য বলা হয়েছে। নতুন করে অনুমোদনের জন্য। বুঝলাম, যে কোনো উপায়ে আমায় একটা মন্ত্রিত্বে যোগদান করিয়ে, মন্ত্রিসভার বৈঠকে আমার উপস্থিতিতেই রেল-বিভাজনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হবে। যার প্রতিবাদে আমায় ইস্তফা দিতেই হবে আর দেশের মানুষের কাছে আরও একবার বলা যাবে, মমতা ইস্তফা দিতে ভালোবাসে!

বুঝতে পারছিলাম, বিজেপি যা-ই করে, সবটাই নিজেদের স্বার্থে অঙ্ক কষে। যেখানে তাদের শক্তি বেশি, সেখানে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ভোট করাবে। আবার যেখানে দুর্বল, সেখানে শরিকদের সমর্থনে ক্ষমতায় এসে তারপর তাদের শেষ করে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলাতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না।

কিন্তু বাংলাকে কেন অবহেলা করা হবে?

ঠিক করলাম, প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির সামনে ধরনা দেব। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে আমাদের পুলিশ থেকে বারণ করা হল। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেই সৌজন্য দেখিয়ে যন্তরমন্তরে ধর্না দিলাম। তখনো আমরা কিন্তু এনডিএ-র শরিক। কিন্তু বিজেপি-র কেউ একবার ভদ্রতা করেও সেখানে দেখা করতে আসেননি। এক কাপ চা খাওয়ানোর সৌজন্যটুকু দেখাননি। পরদিন দলের

ওয়ার্কিং কমিটির সভা। যেখানে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, রেল-বিভাজন নিয়ে সম্মানজনক সিদ্ধান্ত না-হওয়া পর্যন্ত আমরা এনডিএ-র কোনো অংশের সঙ্গেই থাকবে না। আরও সিদ্ধান্ত হল, সকলে কলকাতায় ফিরে গেলেও আমি যেন দিল্লি ছাড়ার আগে প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আসি। কারণ, উপরাষ্ট্রপতি আমায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের দিনও ফোন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সমাধানসূত্র দিলাম। উনি শুনলেন। হাসলেন। উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গেও দেখা করে বক্তব্য জানালাম। উনিও মন দিয়ে শুনে বিবেচনার আশ্বাস দিলেন। পরদিন আমার কলকাতায় ফেরার কথা। উপরাষ্ট্রপতি ফোন করে তাঁর শপথে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। এমনিতেই রেল-বিভাজনের প্রতিবাদে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমরা ভোট দিইনি। ফলে একদফা সৌজন্য দেখিয়েই কলকাতা-সফর বাতিল করে শপথ অনুষ্ঠানে গেলাম।

শপথের পর চা-চক্রে অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। আডবানি'জির সঙ্গে দেখা হওয়ায় সবকিছু বুঝিয়ে বললাম। উনি বললেন জর্জ'জির সঙ্গে কথা বলতে। বললাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হল না। আসলে তখন একে একে জর্জ থেকে শুরু করে সমস্ত শরিককেই দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছিল। বিজেপি-র অন্দরের কলহকে কাজে লাগাতে।

আমি এখনো বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি—সকলে মিলে চাইলে নিশ্চয়ই রেল-বিভাজনে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। করেননি। আমি ফিরে এসেছিলাম আমার ধাত্রীভূমি কলকাতায়।

এনডিএ-র সঙ্গে সুতোটা প্রায় ছিঁড়েই গেল। কিন্তু তখনো আনুষ্ঠানিক ভাবে আমরা এনডিএ-তেই। তারপরেও এনডিএ-তে ছিলাম। কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে অনেকটা দূরত্ব চলে এসেছিল। তারপরেও আমি রেল-বিভাজনের প্রতিবাদে দফতরবিহীন মন্ত্রী হয়ে কাটিয়েছিলাম বেশ কয়েকমাস। রাজি হইনি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিকের সেই অনুরোধ ফেলতে পারিনি।

২০০৪-এর ভোটে কার্যত ছত্রাকার হয়ে গেল এনডিএ। আমি তখন সংসদের ভিতরে-বাইরে একলা। আক্ষরিক অর্থেই। মাঝে মাঝে মনে হত, মানুষের দরবারে এ ভাবে একা হয়ে পড়তে হবে।

জানতাম, কখনো না কখনো মানুষ আমাদের বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন, আমরাই একমাত্র তাঁদের সুখেদুঃখে পাশে আছি-থাকব। সেদিন এল অবশেষে। ২০০৬-এর ভোটে সিপিএম-কংগ্রেসের যৌথ ষড়যন্ত্রে হেরে গেলেও আমাদের শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দিল সিঙ্গুর।

৮

অনশন আর সিঙ্গুর

বহুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু মনে হয়, এই তো সেদিন!

অনেকেই আমায় এখনও প্রশ্ন করেন, কী করে অতদিন টানা অনশন করলাম? সম্ভবত কেউ ভাবতেই পারেননি, একটা একটা করে দিন পেরিয়ে ২৬ দিন অনশন শেষ হবে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গণতন্ত্রের শরণাপন্ন হয়ে, শান্তিপ্রিয় ভাবে আমি অনশন করেছিলাম। অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ, যারা শোষিত, পদদলিত, যাদের আর্তনাদ আমার বিবেককে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, আমি অনশন করেছিলাম তাদের জন্য বিচার পেতে। যারা কোনোদিন ভাবেনি, বিচার পাবে।

মনে হয়েছিল, তবে কি মানুষের অধিকারের কোনো মূল্য নেই, যারা হাজার কোটি টাকার মালিক, তারা অসহায় মানুষের উপর ক্ষমতার বুলডোজার চালিয়ে যাবে? মানুষ প্রতিবাদ করলে তাদের মারা হবে ক্ষমতার চাবুক? বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষ যা অর্জন করেছে, তা কেড়ে নেওয়া হবে ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে? সংবিধানের নামে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে অথচ সংবিধানকে তোয়াক্কা না-করে সরকার যা খুশি তাই করে যাবে? আমরা সমাজের কিছু স্বার্থপর মানুষ তা নীরবে হজম করে যাব?

আমি সেটা কখনও মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। কখনও মনে হয়নি, মানুষের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে উন্নয়ন হতে পারে।

তাই অনশন। তাই সিঙ্গুর।

তার আগে ২০০৬-এর বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল রাজ্যে। পাঁচদফা সেই নির্বাচনে আমরা হেরে গিয়েছিলাম। রেল-বিভাজনের ক্ষোভ নিয়ে দিল্লি ছেড়ে চলে এসেছিলাম ২০০৩ সালে। তার পরেও আমায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নেওয়া

হয়েছিল। কিন্তু রেল-বিভাজনের প্রতিবাদে আমি কোনো দফতর নিইনি। শেষপর্যন্ত ২০০৪-এর জানুয়ারির প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর একান্ত অনুরোধে কয়লা ও খনি মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। কিন্তু ২০০৪-এর লোকসভা ভোটে এনডিএ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ক্ষমতায় এল বহুদিনের কুখ্যাত জোট-বন্ধন—কংগ্রেস-সিপিএম। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপি-১ সরকার গঠিত হল। যাদের বাইরে থেকে সমর্থন দিল সিপিএম। তৃণমূলের সাংসদদের মধ্যে শুধু আমিই জিতলাম দক্ষিণ কলকাতার মানুষের ভালোবাসা-আশীর্বাদে। নির্লজ্জভাবে আমাদের বরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে, গুজরাতের দাঙ্গার সিডি বিতরণ করে, তৃণমূলকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে তকমা এঁটে দিয়ে হারিয়ে দিল সিপিএম-কংগ্রেস। সংসদে আমি আবার একা। আবার লড়াই শুরু।

২০০৬-এর ভোটেও বিজেপি-র সঙ্গে রাজ্যে আসন সমঝোতা করে লড়ছিল তৃণমূল। সেবারও মহাজোটের নামে বহু সময় নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা করে একঝাঁক চ্যানেল তাদের সমস্ত নেটওয়ার্ক দিল্লি এবং কলকাতায় কাজে লাগিয়ে আমাদের আবার অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহে ঢুকিয়ে পরিকল্পনা করে বধ করা হয়েছিল। প্রচুর প্রচারও হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজটা সেরে ফেলা হয়েছিল 'নন-এপিক কার্ড' দিয়ে ভোট করিয়ে। সারা দেশে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছিল! প্রতিবাদের সোচ্চার হয়েও তথাকথিত গণতন্ত্রের নামে গিলোটিনে যেতে হল আমাদের। ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে মাত্রই ৩০টা পেলাম আমরা। সিপিএমের ঔদ্ধত্য বাড়ল আরও সহস্রগুণ। অর্থবল, প্রশাসনিক বল এবং বুর্জোয়া জোতদারকে তাঁবেদার হিসেবে পেয়ে ওঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করলেন।

নির্বাচনের আগেই সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে গিয়েছিল। সিপিএমের নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতায় রেখে দেওয়ার জন্য যে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল, সেই অনুযায়ীই সমস্ত কাজ হল। সিপিএমের চাপে পড়েই কংগ্রেস বলেছিল, তারা মহাজোটে শামিল হবে। ফলে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমাদের। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিপিএমের বোঝাপড়াও হয়ে গিয়েছিল। যাতে ভোটের সময় কেন্দ্র এই রাজ্য সরকারকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে।

বাস্তবে অন্যকিছু হয়নি। সপ্তমবারের জন্য ক্ষমতায় এসে সিপিএমের সরকার শুরু করে দিল কালা কানুনের প্রতিষ্ঠা। কেড়ে নিল মানুষের অধিকার।

২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই তথাকথিত শিল্পের একটা ধুয়ো তোলা শুরু হয়েছিল। সেটা কি এমনি এমনিই হয়েছিল? একেবারেই না! শুনেছি, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধিদের ভারতবর্ষে বিনিয়োগের আগে এ রাজ্যের বাম সরকারকে সাহায্য করার কথা বলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সিপিএম যে আবার ক্ষমতায় আসবে, তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল।

২০০৬-এর নির্বাচনের আগে আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনটে দাবি করে এসেছিলাম। ১) ক্লিন ভোটার-লিস্ট (ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা), ২) ক্লিন এপিক কার্ড (ত্রুটিমুক্ত সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র) এবং ৩) ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ভোট (সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন)।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, নির্বাচনী বৈতরণী পেরনোর জন্য, অর্থাৎ, তৃতীয় দাবিটির পালনের জন্য প্রথম দুটো দাবি ঠিকমতো পালন করতে হত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলাম, ভোটার-তালিকা তৈরির কাজটা কমিশন গুরুত্ব দিয়ে শুরু করল। বিহার নির্বাচনের দায়িত্বে-থাকা অফিসার কে জে রাও সহ অনেকেই এ রাজ্য ভোটার-তালিকা তৈরির সময়ে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে তদন্তেও যাচ্ছিলেন। ফলে চূড়ান্ত ভোটার-তালিকা প্রকাশিত হওয়ার আগে প্রায় ২২ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম প্রথমদফার অভিযোগের ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

তখনই আবার আঘাত এল!

সংবাদমাধ্যমে জানতে পারলাম, আমাদের সঙ্গেই বাংলার মানুষও জানতে পারলেন, কে জে রাও নির্বাচনী পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। খবরটায় যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছিলাম। রাওয়ের সরে যাওয়াটা যে রাজ্যে নিরপেক্ষ নির্বাচনে প্রেক্ষিতে যথেষ্ট তাৎপর্যের ছিল, সকলেই বুঝতে পারছিলেন। পাশাপাশিই স্পষ্ট হচ্ছিল পরিকল্পনা—কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পশ্চিমবঙ্গের সিপিএমের সরকারকে রেখে দেওয়া।

রাও যে ভাবে বিহারের ভোট পরিচালনা করেছিলেন, তা আগে এ দেশে দেখা যায়নি। আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকার লালুপ্রসাদকে দুর্বল করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে লালুর বিরুদ্ধে সবরকম সহযোগিতা করেছিল। তাই

বিহারের নির্বাচন হয়েছিল রাষ্ট্রপতির শাসনে। অর্থাৎ, বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারেরই তত্ত্বাবধানে। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে বোঝাপড়া হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিপিএমের। রাও বিদায় নিলেন। কেন তিনি চলে গিয়েছিলেন, তা আমরাও বিভিন্ন সূত্রে জানার চেষ্টা করেছিলাম। অনেকে বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনের মধ্যে রাওয়ের সঙ্গে অন্য কারও কারও ব্যক্তিত্বের সংঘাত চলছিল। কারণ বিহার নির্বাচনে কমিশনের বদলে নিবার্চন পরিচালনার জন্য বাহবা পেয়েছিলেন শুধু রাও।

সেটা অবশ্য আমার সত্যিই মনে হয়েছিল। বিহার নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের সময় আমার আমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম রাস্তায় রাস্তায় রাওকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্টার। নীতীশ কুমারের শপথে যে লাখো মানুষ উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা রাওয়ের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন, তা আমি স্বকর্ণে শুনে এসেছিলাম। সেই মানুষটা বাংলার নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে এসে দুম করে সবকিছু ছেড়েছুড়ে যাবেন, সেটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ অন্তত আমি দেখিনি। কোনো কোনো মহল থেকে আবার বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক রাওয়ের ফাইল আটকে দিয়েছিল। বিহার নির্বাচনের সময় যে দুঁদে অফিসার চাকরিতে 'এক্সটেনশন' পেয়েছিলেন, বাংলার ভোটের আগে তাঁকে চলে যেতে বাধ্য করার সমস্ত পরিকল্পনাই যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সিপিএম মিলে করেছিল, তাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল না। রাওকে সরিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সিপিএমকে এই বার্তাই দিয়েছিল যে, নির্বাচনে রাজ্যকে কোনো বিপাকে ফেলবে না কেন্দ্রীয় সরকার।

অনেকে বলেছিল, ২০০৬ সালে নাকি পশ্চিমবঙ্গে নিরপেক্ষ ভোট হয়েছিল!

আমি বলি, যদি তা-ই হয়, তা হলে লোকসংখ্যা ও রেশনকার্ড সংখ্যায় এত ফারাক থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন? জনসংখ্যার চেয়ে রেশনকার্ড বেশি হলে কত লক্ষ ভূতুড়ে ভোটার সরকার গঠনে ভোট দিয়ে থাকে? বারবার আমাদের ওই অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে জনিয়েছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি। সিদ্ধান্ত তো আগেই হয়ে গিয়েছিল! সিপিএমকে ক্ষমতায় রেখে দেওয়া হবে। বিহারের ভোটে সিদ্ধান্ত ছিল লালুকে পরাস্ত করার। তাই কমিশন সক্রিয় ছিল। আর বাংলায় সিপিএমকে

ক্ষমতায় রেখে দিতে বধ করা হল রাওকে।

বাংলার নির্বাচনের জন্য যখন শেষবার নির্বাচন কমিশনার রাজ্যে এসেছিলেন, তখন রাজভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলে এসেছিলাম, বাংলায় ত্রুটিমুক্ত ভোটার-তালিকা বা ত্রুটিমুক্ত সচিত্র পরিচয়পত্র দিয়ে ভোট হচ্ছে না। সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে সিপিএমের স্তাবকরা। বলেছিলাম, কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। বাধ্য হয়ে এমনও বলেছিলাম যে, "দেখেশুনে মনে হচ্ছে, সবটাই লিপ-সার্ভিস। ঠোঁট নাড়ানো শুধু। অন্য কিছু নয়।"

রাও চলে যাওয়াটা যদি একটা ধাক্কা হয়, তা হলে দ্বিতীয় ধাক্কা অবশ্যই চূড়ান্ত স্ক্রুটিনিতে ১১ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ-পড়া। যেখানে অত্যন্ত কৌশলে সিপিএম বিরোধী ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল। সব জেনেবুঝেও নির্বাচনে লড়েছিলাম। কারণ, বিকল্প ছিল দুটো। এক, নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে সরে যাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, রক্তাক্ত বিপ্লবের পথ। কিন্তু দুটো পথই গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ এবং বাস্তবোচিত নয়। ফলে নির্বাচনে অংশ নিলাম। জানতাম, জিততে পারলে সমালোচকরা সব স্তাবকে পরিণত হবে। আর হেরে গেলে তার কারণ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণে না-গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের অতিবড় শুভানুধ্যায়ী বনে যাবে। কারণ, জেতাটাই আসল কী করে, কোন পদ্ধতিতে জয়, সেটা কিছু নয়।

'নন-এপিক কার্ড' নিয়ে ভোট হয়েছিল বাংলায়। কী সেটা?

যাদের ভোটার-তালিকায় নাম আছে। অথচ ছবি নেই। এ রাজ্যের নির্বাচনে কখনও সঠিক ভোটার-তালিকা বা সঠিক ভোটার-পরিচয়পত্র তৈরি করা হত না। ফলে ভোট এলেই ছবি-হীন লক্ষ লক্ষ 'নন-এপিক-কার্ড' কেন্দ্র ধরে ধরে সিপিএম ক্যাডারদের হাতে দিয়ে দেওয়া হত। সিপিএমের লোকেরা প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে জেতার জন্য ছবি-হীন ভোটার স্লিপ 'নন-এপিক-কার্ডে'র নাম করে ভোটারদের লাইনে দিয়ে দিত তাদের দলের সক্রিয় সদস্য ও সদস্যাদের হাতে। ২০০৬-এর ভোটেও 'নন-এপিক-কার্ডে' ভোট দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হল। তাই অনায়াসেই জিতে গেল সিপিএম।

এখনও পর্যন্ত আমরা বারবার প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি, ঠিক এমন কত ভোটার-স্লিপ নির্বাচনের ৭২ ঘন্টা আগে থেকে ইস্যু করা হয়েছিল। যখন

নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের ওয়েবেল সংস্থাকে এপিক কার্ড তৈরির বরাত দিয়েছিল, তখনই আমরা বহু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলাম। অত্যন্ত ঢিলেমির সঙ্গে গোটা কাজটা করা হচ্ছিল। ছিল অজস্র ভুল। সে বিষয়ে বারবার কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। প্রতিদফার ভোটের আগে প্রচারে বেরিয়ে যখন খবর পেতে শুরু করলাম যে, লক্ষ লক্ষ 'নন-এপিক-কার্ড' সিপিএমের হাতে চলে যাচ্ছে, তখন দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে প্রচারে বেরিয়ে নিজেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ও-প্রান্ত থেকে যা শুনেছিলাম, তা আর গোপনীয়তার খাতিরে এখানে লিখতে পারছি না। কিন্তু আলোচনার মধ্যেই একটা অশুভ সঙ্কেত পেয়েছিলাম। তর্কের খাতিরে আপনারা বলতে পারেন, আমরা কেন বিষয়টা নিয়ে আরও হইচই করিনি। কিন্তু কী জানেন? একবার সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে আমলারা তা সম্পূর্ণ করতে প্রাণপাত করতে থাকেন। সিদ্ধান্ত হয়েই গিয়েছিল। শুধু ফলাফলের অপেক্ষা ছিল।

ভোটপর্ব মিটে গেল। কিন্তু কিছু ভাবার আগেই চলে এল কৃষিজমি রক্ষার গণ-আন্দোলন।

ভোটের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে প্রচার করতে হয়েছিল। খানিকটা ক্লান্তিও এসেছিল। ভাবলাম, হারিয়েই দেওয়া হোক আর হেরেই গিয়ে থাকি, কিছুদিন একটু বিশ্রাম নিই। কোথায় কী! নির্বাচন পর্ব মিটে যাওয়ার পরেই শুরু হয়ে গেল জোর করে জমিদখলের প্রক্রিয়া। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই। মানুষের সঙ্গে কথা বলা বা কারও সঙ্গে অলোচনা করার ধৈর্যটুকুও দেখানো হল না। ২৩৫ আসনের জোরে তাঁরা তখন ক্ষমতার দম্ভে ফুটছেন। তাই সিপিএমের সরকার শপথ নেওয়ার দিনেই মহাকরণ থেকে ঘোষণা হল সিঙ্গুরে চাষিদের উর্বর কৃষিজমিতে টাটাদের মোটরগাড়ির কারখানা হবে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুলিশি বলে বলীয়ান হয়ে কৃষকদের সম্পদ টাটাদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিলেন। কোথায় গেল ক্লান্তি! কোথায় বিশ্রাম! মানুষ বিপদে পড়েছেন। তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সাহায্য চাইছেন তাঁরা।

সিঙ্গুরের কৃষকরাই প্রথমে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির গণসংগঠনগুলির সাহায্যে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি বাঁচাও কমিটি' গড়েছিলেন। সেই

কমিটি কৃষক পরিবার, খেতমজুর ও বর্গা রেকর্ডধারী সহ যাঁরা জমিরক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে নেমেছিলেন। সেই কমিটির ডাকেই নির্বাচন সমাপ্ত হতে না-হতেই আমরা পৌঁছোলাম। জুন মাস থেকে লাগাতার আন্দোলন শুরু হল। সিঙ্গুরের আবালবৃদ্ধবনিতা এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করলেন। প্রতি সপ্তাহে তাঁদের ডাকে একটার পর একটা প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ, মিছিল হতে শুরু করল। মানববন্ধন, ডান্ডি অভিযান, জেলাশাসক থেকে শুরু করে রাজ্যপালের কাছে অভিযান—কিছুই বাদ গেল না। রাজ্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল আন্দোলন ভাঙতে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমাতে না পেরে শুরু হল দমনপীড়ন।

প্রতিটি নির্বাচনের আগে যেমন ভোটারদের রঙিন স্বপ্ন দেখাত সিপিএম, তেমনই ২০০৬-এর আগেও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে স্লোগান তোলা হয়েছিল 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'। ভোটের পরেই তাই সিপিএম চাবুক-হাতে বেরিয়ে পড়েছিল শিল্প গড়তে। গরিব কৃষকদের ভাতে মারার জন্য তখন সর্বহারা সরকার টাটা-সালিমদের ইজারা নিয়েছে। নির্বাচনের পর স্লোগানটা পাল্টে গেল—'কৃষি হয়েছে বাসি, শিল্প আমাদের হকিকত'।

টাটার অনেক টাকা আছে বলে তাদের কৃষকদের জমি বিনে পয়সায় দিতে হবে। দিতে হবে তাদের জীবন-জীবিকা। এ এক আশ্চর্য মাৎস্যন্যায়! পিপিএমের সরকার শিল্প শিল্প করে লাফাতে গিয়ে একবারও ভাবল না যে, তাদের আমলেই ৫৫ হাজার বড় কোম্পানি এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছোট সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক কোটির উপর বেকার। তা-ও নথিভুক্ত। বন্ধ কারখানার ৪০ হাজার একর জমি পড়ে আছে। রয়েছে জলা ও অনুর্বর জমি। সেগুলি খুঁজে বার করে টাটারা শিল্প গড়লে কি কেউ আপত্তি করতেন? আমরা তো করতাম না। কিন্তু বহুফসলি উর্বর জমি চাষিদের থেকে কেড়ে নিয়ে টাটারা সিপিএমের স্বেচ্ছাচারিতার দোসর হয়ে গেলেন।

আমরা যে কথাটা বারবার বোঝাতে চেয়েছিলাম—উর্বর কৃষিজমি না-নিয়ে, অনিচ্ছুক চাষিদের থেকে তাদের জমি না-নিয়ে অনুর্বর জমিতে তাঁদের যেমন খুশি কারখানা করুন। কিন্তু সিপিএমের সরকার টাটার সঙ্গে গোপন 'ডিল' করে সিঙ্গুরের সোনার মাটিতে ভাতের কারখানা বন্ধ করে মোটরগাড়ির

কারখানা গড়তে গেলেন। কেন?

কেন জনতার জন্য একরকম আইন আর টাটাদের জন্য একরকম? জনগণের সঙ্গে তঞ্চকতা করে এক পয়সাও অগ্রিম না-দিয়ে, সুদ না-নিয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে পাঁচবছরের জন্য টাটাদের হাতে দেওয়া হবে কেন? বিনে পয়সায় জমি। তা-ও আবার টাটাদের পছন্দ-করা। সব বিনামূল্যে! কর্মহীন হবেন প্রায় সাড়ে ৪৭ হাজার চাষি। ১০ হাজার খেতমজুর কাজ হারাবেন। ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারকেশ্বর-হরিপালসহ আশপাশের আরও অন্তত ৫০ হাজার পরিবার। ক্ষতি হবে দোকানদার, সব্জিবিক্রেতা, পাটশিল্পের। বন্ধ হবে আরও তিনটি নতুন সংস্থাসহ অনেক ছোটবড় শিল্প। সিঙ্গুরের সজীব-সবুজ মাটিতে যে সোনার ফসল ফলত, তার দিকেও কেউ তাকালেন না!

অতএব জুন মাস থেকে শুরু হল লাগাতার আন্দোলন। আমার সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সহকর্মীরা। দেখতাম প্রবীণা সরস্বতী দেবীকে। ভাবতাম, কী অফুরান মানসিক শক্তি! বয়স যাঁর কাছে হার মেনেছে। সিঙ্গুরে প্রতিটি সভায় গিয়ে প্রথমেই চোখ পড়ত আন্দোলনকারী মা-বোনেদের দিকে। অনেকের মুখ দেখতে দেখতে এতটাই চিনে গিয়েছিলাম যে, কোনো সভায় না-দেখলে মনে হত, আসেননি নাকি? তারপর অবশ্য ঠিক পেয়ে যেতাম। সরস্বতী দেবীর মতোই সামনের সারিতে থাকতেন নয়নতারা দেবী। কৃষিজমি আন্দোলনের গান নিজে লিখে, সুর দিয়ে সেই গান গেয়ে সকলকে অনুপ্রাণিত করতেন। ছিল ছোট্ট পায়েল। ছিল তাপসী মালিক। আমি ধর্মতলায় অনশনরত থাকার সময় যাকে সিপিএমের লোকেরা নিষ্ঠুরভাবে খুন করল। ছিল রাজকুমার ভুল। যাকে ২০০৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর লক-আপে পুলিশ এমন পেটাল যে, মারা গেল সে। এদের আমি কোনোদিন ভুলব না।

২৫ সেপ্টেম্বর। ওই তারিখটাও ভোলার নয়। আমার কাছে খবর এসেছিল, সিঙ্গুরের কৃষকদের চেক দেওয়ার নামে নকল কৃষকদের সাজিয়ে সিপিএম চেক নিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গুরেরই এক কৃষক জানতে পারেন, তিনি জমির দামের ক্ষতিপূরণ বাবদে চেক না-নিলেও তাঁর নামের চেক সিপিএমের কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক নেতার নামে তোলা হয়েছে। কৃষকরা প্রতিবাদ করলেও তাঁদের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আমার মনে হয়েছিল, ওঁদের পাশে আমার দাঁড়ানো উচিত। গাড়ির চালক সুদর্শনকে নিয়ে আমি সটান বেরিয়ে পড়ি

সিঙ্গুরের দিকে। পুলিশকে জানিয়েই অবশ্য। কারণ, খাতায়কলমে আমায় জেড-প্লাস নিরাপত্তা দেওয়া হত। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, পুলিশের কেউ সেদিন আমার সঙ্গে এল না।

তখন মনে হয়নি, কেন পুলিশ এল না। পরে বুঝেছিলাম, সেদিনও একটা পরিকল্পনা ছিল।

কলকাতা থেকে সিঙ্গুর যেতে লাগে বড়জোর ৪০ থেকে ৫০ মিনিট। গিয়েই শুনলাম কৃষকদের প্রতিবাদের কথা। পরিস্থিতি থমথমে। মহিলারা অভিযোগ করতে থাকেন, পুলিশ তাঁদের মারধর করেছে। কথা বললাম জমিরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক আমার সহকর্মী বেচারাম মান্নার সঙ্গে। জানতে চাই, কে কোথায় চেক বিলি করেছে। জানলাম, চেক বিলি হচ্ছে সিঙ্গুরের বিডিও অফিস থেকে। পুলিশ পুরো অফিসটা ঘিরে রেখেছে। বিডিও অফিসে পৌঁছে দেখলাম, জেলাশাসক এবং জেলার পুলিশসুপার বিডিও-র ঘরেই বসা। তাঁদের প্রশ্ন করতে তাঁরা প্রায় শিশুর ভঙ্গিতে অজ্ঞতা জানালেন। আমরা তাঁদের সাফ বললাম, এই ভুয়ো চেক বিলি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যতক্ষণ না তা হচ্ছে ভুয়ো চেক বিলির জন্য প্রকৃত দোষী শাস্তি পাবে, ততক্ষণ আমরা সেখানেই ঘেরাও-অবস্থান করব।

বিকেল ৫টা থেকে শুরু হল শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান। আস্তে আস্তে চারদিকে খবর ছড়াচ্ছিল। ভিড় করছিল নিউজ চ্যানেলের ক্যামেরা। আসছিলেন আমার অন্য সহকর্মীরা। সমাজবাদী পার্টির বিজয় উপাধ্যায়, জনতাদল (ইউ)-এর অমিতাভ দত্ত, কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, নকশালপন্থী বর্ণালী গুহ, তৃণমূলের সৌগত রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সী, সোনালী গুহ, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রত্না নাগেরা চলে এসেছেন বিডিও অফিসে। লক্ষ্য করছিলাম, আধঘন্টা পর পর জেলাশাসক ও পুলিশসুপারের কাছে ফোন আসছে। কখনও দিল্লি, কখনও কলকাতা থেকে। পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে দিল্লি থেকে তাঁদের দরকারি নির্দেশ দিচ্ছেন, তা তাঁদের ফোনে কথোপকথনেই বোঝা যাচ্ছিল।

এর মধ্যেই একবার দুই কর্তা বাইরে যাওয়ার কথা জানালেন। বললেন, খানিকক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবেন। অনেকেই রাজি ছিলেন না। কিন্তু আমি বললাম, হয়তো প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার দরকার হচ্ছে। সহকর্মীদের অনুরোধ করে আমি ওঁদের বাইরে যাওয়ার কথা জানিয়ে দিলাম। ওঁরা গেলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরেও এলেন। আমরা বারবার ওঁদের প্রশ্ন করছিলাম, এতক্ষণ ঘেরাও-অবস্থান চলছে। তাঁরা কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? তাঁরা বললেন, বাইরে যেতে পারছেন না। তাই কোনো সিদ্ধান্তও নিতে পারছেন না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে তাঁদের বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। তখন প্রায় রাত ১১টা। আমরা ভাবলাম, ওঁরা যদি উপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিতে চান, তাই করুন। জগাই-মধাই বাইরে গেলেন। কিন্তু তাঁরা আর ফিরলেন না।

আরও দেড়ঘন্টা কেটে গেল। রাত প্রায় সাড়ে ১২টা। দেখলাম, এক পুলিশ অফিসার দু'জন সাংবাদিককে চোখের ইশারা করছেন। কী যে মনে হল, সকলের সামনেই বলে ফেললাম, "এখানে কোনো বিচার পাওয়া যাবে না। সরকারের সিদ্ধান্ত একটাই—আমাদের উপর এ বার অত্যাচার শুরু হবে।"

খবর এল, হাওড়া-হুগলি-বর্ধমানের বিভিন্ন ব্যারাক থেকে সার সার গাড়িতে পুলিশ এবং র‍্যাফ বাহিনী আনা হয়েছে। রাত ১টার পর শুরু হল লাঠি, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটা আর গুলির আওয়াজ। সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। মনে হল, এই ছোট ঘরটার মধ্যে এক অন্ধকূপ-হত্যার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। বাইরে থেকে ভেসে এল 'বাঁচাও-বাঁচাও' আর্তি। শুনলাম, যে কৃষক রমণীরা বাইরে বসেছিলেন, তাঁদের চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পেটানো হচ্ছে। বৃদ্ধা সরস্বতী দেবীকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে লাঠিপেটা করা হচ্ছে নির্দয়ভাবে। গ্রামের কয়েকজন মহিলা তাঁদের দিয়ে সরস্বতী দেবীকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। প্রথম বাইরে থেকে পিটিয়ে এলাকা খালি করা হল। তারপর আমাদের ঘরের ভিতর থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শুরু হল টানাহ্যাঁচড়া। ভিতরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। কয়েকজন ঘরে ঢুকল মারমুখী মূর্তিতে। আমার চুলের মুঠি ধরে, লাথি-ঘুঁষি মারতে মারতে, কাপড়জামা ছিঁড়ে আমায় পুলিশের গাড়িতে তোলা হল। সঙ্গে অশ্লীলতম বাক্যবাণ। পুলিশ উর্দি-পরিহিত কেউ প্রশাসনিক দায়িত্বে থেকে যে ওই ভাষা বলতে পারেন, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। অতদিনের রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মী হিসেবে তাঁরা তো আমায় চিনতেন। তাও কেন যে গাড়িতে ওঠাতে ওঠাতে আমার কোমর, পেট, বুকে বারবার আঘাত করা হচ্ছিল! কিছু উন্মত্ত গলা বলছিল, "মার, মার! মেরে ফেলে দে!" এর বেশি বলতে গেলে ছাপার অযোগ্য শব্দ লিখতে

হয়।

গাড়িতে আমায় তুলে পুলিশের কিছু লোক আমার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলেছিলেন, "এবার যদি তোকে গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে রাস্তায় গাড়ি চাপা দিয়ে দিই, কেউ জানতেও পারবে না।"

জীবনে এমন হুমকি অনেক শুনেছি। তাই ওই অবস্থাতেও বলেছিলাম, "বড্ড সাহস তো!"

প্রতিবাদ করতে গেলেই গাড়িতে আমাদের রাইফেলের বাট দিয়ে মারা হচ্ছিল। প্রবল অসম্মানিত অবস্থায় নিয়ে এসে সব নিয়ম ভেঙে হুগলি জেলার পুলিশ কলকাতায় ঢুকে বিধ্বস্ত অবস্থায় আমায়, পার্থদাকে, সোনালি আর রত্নাকে আমার কালীঘাটের বাড়িতে ফেলে দিয়ে গেল। কিন্তু সেই অসম্মান নিয়ে আমি আর বাড়িতে ঢুকলাম না। অত্যাচারের বিহিত চাইতে সেই রাতেই গিয়ে বসলাম ময়দানে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। সারারাত ওখানেই বসেছিলাম। পরদিন বেলা বাড়তে অনেকেই আসতে শুরু করলেন। একটা ঝোলাব্যাগে কিছু জরুরি কাগজপত্র আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু পুলিশ সেটাও কেড়ে নিয়েছিল। ওই অবস্থাতেই পার্থদা আর অসীম চট্টোপাধ্যায়কে থানায় এফআইআর করতে পাঠিয়েছিলাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমায় সকলের বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করছিলেন। ততক্ষণে দিল্লিতে আমাদের দুই রাজ্যসভা সংসদ মুকুল রায় এবং দিনেশ ত্রিবেদী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে গোটা ঘটনা জানিয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমায় জানিয়েছিলেন, পুরো ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিও গান্ধীমূর্তির পাদদেশে এসে বলেন, তাঁরাও পরদিন বিষয়টির প্রতিবাদ করবেন।

সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সভাও হল। কিন্তু মারের ধাক্কায় আমায় রাতে বেলভিউতে ভর্তি হতে হল। ২৯ তারিখে দুর্গাপুজো শুরু হল। কিন্তু আমি তখন হাসপাতালে। ফুসফুসে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। চিকিৎসকেরা কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র তৈরি রেখেছেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে পাল্‌স-রেট নেমে গিয়েছিল ৪০-এর ঘরে। মাসখানেক শয্যাশায়ী থাকার পর ফিরে এলাম। এবং আবার গেলাম সিঙ্গুরের আন্দোলনে।

৩০ নভেম্বর। সিঙ্গুরে জারি হল ১৪৪ ধারা।

২৯ তারিখ সিঙ্গুরে সমাবেশ করেছিলেন মাননীয় সরকার বাহাদুর। সেই

সমাবেশ শেষে কৃষকদের একাংশকে মারধর করা হয় এবং তাদের শাসানো হয়, দেখে নেওয়া হবে বলে। ৩০ তারিখে জমিরক্ষা কমিটির সমাবেশ। সেখানে আমাদেরও যাওয়ার কথা। কিন্তু ওইদিন সকালেই ভীত সিপিএমের সরকার সিঙ্গুরের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার জন্য জারি করল ১৪৪ ধারা। সভায় যাওয়ার জন্য বেরোলাম। দেখলাম, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর মুখ থেকেই পুলিশ-প্রশাসনের সাজো-সাজো রব। আমাদের গাড়ি দ্বিতীয় হুগলি সেতু এগোতে শুরু করল। যাওয়ার সময় হাতে করে ভারতের সংবিধান নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, জানতে চাইব, দেশের সংবিধান অনুযায়ী আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে কি না। গাড়িতে আমি, শোভন চট্টোপাধ্যায় (কানন) আর রত্না দে নাগ। মাইতিপাড়ায় আমার গাড়ি আটকালেন হুগলির সেই জেলাশাসক, পুলিশসুপার এবং এসডিপিও। প্রশ্ন করলাম, "কোন আইনে আমাদের গাড়ি আটকানো হল?"

জবাব এল, "সরকার এখানে ১৪৪ ধারা জারি করেছে।"

কোন আইনে?

জবাব এল, "সকাল থেকে এখানে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে।"

বললাম, "সরকারি বিজ্ঞপ্তি কোথায়? সেটা দেখান আমাদের। কোন কারণে প্রশাসন ও সরকার এখানে ১৪৪ ধারা জারি করল? যেখানে আমাদের গাড়ি আটকানো হল, সেটা তো সিঙ্গুর থানা এলাকার বাইরে! মাইতিপাড়া তো হাওড়া-হুগলির সীমানায়!"

সে সব যুক্তিতর্কের কথা আর শোনে কে! আমাদের গালাগাল দিতে দিতে, ধাক্কা মারতে মারতে চুলের মুঠি ধরে আমায় গাড়ি থেকে নামিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে এসে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সামনে। দেখলাম, আমার পায়ের হাওয়াই চপ্পলটাও নেই! খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে যেন গণতন্ত্রের অন্তিমযাত্রার যাত্রী মনে হচ্ছিল। কোথায় যাব? ভাবলাম, বিধানসভায় যাই। সেখানে আমাদের বিধায়করা আছেন। ওঁদের গিয়ে ঘটনাটা জানাই।

বিধানসভায় গেটেও আমায় আটকে দেওয়া হচ্ছিল! এক দৌড়ে পুলিশের নাগাল এড়িয়ে ঢুকলাম বিধানসভায়। সম্ভবত ১৫-২০ বছর পর। গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। নিউজ চ্যানেলের সুবাদে ততক্ষণে সেখানে সমস্ত খবর পৌঁছে

গিয়েছিল। বিধায়করা আমার অসম্মানের ঘটনায় স্বভাবতই অত্যন্ত উত্তেজিত ও প্রতিবাদী। সিপিএমের সঙ্গে তাঁদের উত্তেজিত বিতন্ডা ও কিছু আসবাবপত্র ভাঙচুরের ঘটনা তখন ঘটে গিয়েছে। বিধানসভা ভবনে বিরোধী দলনেতা পার্থদার ঘরে ওঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। একটা সাংবাদিক বৈঠক করলাম। পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করে ফিরে এলাম বাড়িতে। পরদিন শুনলাম, সিপিএমের সরকার বিধানসভা ভবনে ভাঙা আসবাবপত্রের প্রদর্শনী করছে! সিপিএমের ক্যাডাররা এসে সে সব লাইন করে দেখে যাচ্ছে।

১ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুরে একটা সভায় যাওয়ার কথা ছিল। সকালে বিমানে শিলিগুড়ি পৌঁছোলাম। শোভন, গৌতম দেব এবং তিলক চৌধুরীকে নিয়ে ইসলামপুর পৌঁছোলাম। বেলা দুটো থেকে সভা শুরু হল। মঞ্চে উঠতে যাচ্ছি, শোভন বলল, জরুরি ফোন আছে। শুনলাম, কয়েকশো পুলিশ সিঙ্গুরে ঢুকে পড়ে কৃষকদের উপর তাণ্ডব চালিয়েছে। বাড়ি বাড়ি ঢুকে অত্যাচার চালিয়েছে। মনটা অশান্ত হয়ে গেল। ফোনে পুলিশের গুলির আওয়াজও আমায় শোনানো হল। কোনোক্রমে সভা শেষ করেই ট্রেন ধরার জন্য মালদহের পথে রওনা দিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনলাম, মালদহ থেকে প্রতিটি স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে, যাতে আমরা ট্রেনে গেলেও আমাদের গ্রেফতার করা যায়। কোনোক্রমে দুটো গাড়ির ব্যবস্থা হল। তাতেই রওনা হলাম। সাংবাদিকরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকলেন।

৩ ডিসেম্বর রাত তিনটে নাগাদ পানাগড়ে পৌঁছোলাম। বর্ধমান পেরিয়ে হুগলিতে ঢুকতে ভিন জেলার সাংবাদিকরা ফিরে গেলেন। ভোরবেলায় ডানকুনির টোল-প্লাজা পার হয়ে গিয়ে দেখলাম, আমাদের গাড়ি ঘিরে প্রায় ৫০টা পুলিশের গাড়ি। সামনে-পিছনে ঘিরে রেখেছে। চালককে বললাম, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে একটা পেট্রল পাম্পের খোঁজ করতে। পুলিশ এবার ধাঁধায় পড়ল। আমি কী করব, বুঝতে পারছে না! কয়েকমিনিটের মধ্যেই একটা পেট্রল পাম্প পাওয়া গেল। যার আশেপাশে সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক সভা-সমাবেশ করেছি। তখনও ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটেনি। ফোন করলাম মুকুলকে। ও বলল, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাছে অপেক্ষা করছে। এবার তা হলে এগিয়ে আসবে। ততক্ষণে আবার পুলিশের গাড়িগুলো আমায় ঘিরে ফেলেছে। আবার টানাহ্যাঁচড়া শুরু হল। একটা পুলিশের গাড়িতে আমায়

ওঠানো হল। গাড়িতেও আমায় লাঞ্ছনা করার জন্য একজন পুলিশ আমার কোলের উপর বসে পড়ল! যন্ত্রণায়, অসম্মানে, অপমানে আমি তখন কাঁপতে শুরু করেছি। বুঝলাম, মানুষের হয়ে কথা বলাটাই আমার মস্ত অপরাধ হয়ে গিয়েছে।

মানবিক-সাংবিধানিক-সম্পত্তি এবং মৌলিক অধিকার যখন হরণ করা হয়, তখন আর কী দেওয়ার থাকে মানুষের? তাই জীবন বাজি রেখে অনশন-সত্যাগ্রহের পথে গিয়েছিলাম। মানুষের জন্য বিচার পাওয়ার আশা নিয়ে। ৩ ডিসেম্বর সকালে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর বেলা ১১টায় মিটিং ডাকলাম জমিরক্ষা কমিটির। ঠিক হল, সরকার যখন কোনো কথা শুনতে নারাজ, তখন আমরা অনশন অন্দোলনের পথে যাব। পরদিন থেকেই ধর্মতলার মোড়ে শুরু হল। অনশন।

৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনশন চলেছিল। প্রথমে ভাবিনি, এতদিন অনশন চলবে। যাঁরা অনশন মঞ্চ তৈরি করেছিলেন, সম্ভবত তাঁরাও ভাবেননি। হালকা একটা সভার উপযোগী করেই মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। মঞ্চের উপর যে বিছানাগুলো রাতে থাকার জন্য পাতা হত, রাস্তায় গাড়ি গেলে সেগুলো কেঁপে উঠত। আসলে সকলে ভেবেছিলেন, সকলেই তো প্রতীকী অনশন করে থাকেন। ২৪ ঘন্টা বা বড়জোর ৪৮ ঘন্টা।

ভেবেছিলাম, বিরোধী নেত্রী অনশন করছেন বলে সরকার সৌজন্য দেখাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হল না। কিন্তু একটার পর একটা তারিখ বদলেছে আর আমার জেদ বেড়েছে। প্রথম ৮-১০ দিন অবশ্য কিছুই মনে হয়নি। কষ্ট হলেও কষ্ট পাইনি। সহকর্মীদের সঙ্গে কেটে গিয়েছে। মনটা পড়ে থাকত সাধারণ মানুষের মাঝে। আমাদের অনশনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনশন শুরু করেছিলেন। সিঙ্গুরে শুরু হয়েছিল রিলে-অনশন।

প্রতিদিন রাতে খবর আসত, পুলিশ দিয়ে জোর করে অনশন ভাঙানো হবে। চারদিকে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, গাড়ির শব্দ, গ্যাস আর ধুলো। অপরিষ্কার একটা দুর্বল মঞ্চে অতদিন কাটানো। রাতে একটু ঘুমোনরও অবকাশ থাকত না। কারণ, ওই যে বললাম, খবর আসত, পুলিশ এসে অনশন ভেঙে দেবে। ১৫ দিন কাটার পর একজন সরকারি চিকিৎসকের নামে সরকারের পরিচিত কিছু চিকিৎসককে আমায় পরীক্ষা করতে পাঠনো হয়েছিল। দিনের

বেলায় মিটিং-সমাবেশ হত অনশন মঞ্চের সামনে। হাজার হাজার মানুষ আসতেন। দিন শুরু হত ভোর চারটেয়। আমার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃবধূ লতা। কোনো কোনোদিন থাকত কল্যাণ আর সীমা। ভোরে উঠে পড়তাম। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে লতার ঘুম ভাঙতে একটু কষ্টই হত। কিন্তু ভোরবেলায় বাসি জামাকাপড় ছেড়ে আবার সারাদিনের জন্য পরিষ্কার জামাকাপড় পরে তৈরি হতে হত। বিছানা মানে তো কয়েকটা সাদা চাদর। মঞ্চ পরিষ্কারের জন্যও কিছুটা সময় দিতে হত। রোজ একটা সংসারে থাকলে যা যা করতে হয়, আমরাও তাই করতাম। ধর্মতলার ফুটপাথ হয়ে গিয়েছিল আমাদের নৈমিত্তিক সংসার। একটা পরিবারের মতোই।

অনশন চলাকালীন মঞ্চে এসেছিলেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং, বিজেপি-র তৎকালীন সভাপতি রাজনাথ সিংহ, বাংলার রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী (তিনবার), মেধা পটেকর, মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অম্লান দত্ত, কাশীকান্ত মৈত্র, প্রতুল মুখোপাধ্যায়-সহ সমাজের বহু স্তরের বহু বহু মানুষ। খ্রিস্টান ধর্মগুরু থেকে ফুরফুরা শরিফের ছোট সাহেব, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মহারাজরা। কখনও দিল্লি, কখনও মুম্বাই, কখনও চেন্নাই বা ওড়িশা থেকে বিভিন্ন আন্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ এসেছিলেন মঞ্চে। এসেছিল হাজার হাজার সমর্থন-জনিত চিঠি।

আমার সঙ্গেই অনশন শুরু করেছিল বিজয় উপাধ্যায়, শ্রমিক ভাই আভাস মুন্সী আর বর্ণালী মুখোপাধ্যায়। আভাস ২০ দিন পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। বর্ণালী ভর্তি হয় ১০ দিন পর।

অনশন শুরু দিনচারেক পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর থেকে একটা চিঠি পেলাম। যেন অনশন তুলে আলোচনায় বসি। তার জবাবও দিলাম সেদিনই—সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হোক। এই আমার 'করুণ আবেদন'। তার কোনো জবাব এল না। বোধহয় ওঁরা ভেবেছিলেন, ওই ভাবেই অনশন করতে করতে আমরা মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ব। তখন আর তাঁদের সামনে প্রতিবাদী কেউ থাকবে না! অনেকের অনুরোধে আমরাই তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলাম ২০ ডিসেম্বর। যাতে বললাম, বিষয়টিকে 'প্রেস্টিজের লড়াই' না-করে কৃষকদের বাঁচার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। সেদিনই তিনি জবাব দিয়ে জানালেন, ওটা প্রেস্টিজের লড়াই নয়। 'বাংলার উন্নয়নের স্বপ্ন'। আমি যেন অনশন প্রত্যাহার

করে নিই।

আবার চিঠি এল ২১ ডিসেম্বর। সামান্য দু'লাইন। অনশন প্রত্যাহার করে আলোচনায় বসার 'আন্তরিক অনুরোধ' সহ। সেদিনই কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ভেবেছিলাম, সারা দেশে যখন আলোড়ন পড়েছে, তখন নিশ্চয়ই উনি একবার ফোনে কথা বলবেন। বা একটা বিহিত করা চেষ্টা করবেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে ফিরে গেলেন দিল্লি।

ক্রমশ মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়ছিল। মঞ্চের সামনে স্লোগান উঠত, আমি যেন অনশন প্রত্যাহার করে নিই। সিঙ্গুরের মা-বোনেরাও চিন্তিত ছিলেন। তাঁরাও মঞ্চে এসে বলতেন, "আমাদের জমির জন্য আপনি শেষ হয়ে যাবেন না। আপনার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কথা কে বলবে?" প্রায়ই আসতেন গায়ক সুমন। এসেছিলেন মহাশ্বেতাদি।

শিল্প শিল্পের জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াক। কৃষি থাকুক কৃষকের সম্পদ হয়ে। এ দাবি আমরাও বারবার জানিয়েছি। কিন্তু কৃষিজীবী মানুষের একমাত্র সম্পদ জমি কেড়ে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা সিপিএমের সরকার নির্লজ্জভাবে করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমাদের অনশন-সত্যগ্রহ মানুষের চেতনাকে জাগিয়েছিল। সবুজ না-থাকলে শান্তি থাকে না। শান্তি না-থাকলে উন্নয়ন হয় না। বারবার অনশন মঞ্চ থেকে বলতাম আমরা। সেই সত্য প্রমাণেই নিজের জীবনটা বাজি রেখে টানা ২৬ দিন অনশন করেছিলাম।

২১ তারিখের পর থেকে আমার শরীরের অবস্থার অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। আমি অবশ্য কাউকে কিছু বুঝতে দিইনি। তা হলেই সিপিএম এবং ইউপিএ সরকার জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিত। কিন্তু মাথাটা ঝিমঝিম করত। পেটে ভয়ঙ্কর ব্যথা হত। শ্বাসকষ্টও শুরু হয়ে গিয়েছিল। ক্রমশ ২৫ ডিসেম্বর কেটে গেল। তখন আর কোনোকিছু ভাবতে ইচ্ছে করত না। চারদিকে ততটা মনও দিতে পারতাম না। সারা দেশের সঙ্গেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও তখন আমাদের অনশন মঞ্চের দিকে নজর রাখতে শুরু করেছিলেন।

সকলেই যখন আমার শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত, তখন আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ দীনেশদা দিল্লিতে এনডিএ-কে জোটবদ্ধ করেন। এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী, যিনি ২০০৪-এর লোকসভা ভোটের পর কোথাও

যাননি, তিনি এনডিএ-র টিম নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে যান বিচার চাইতে। অটলজি চিরকালই আমায় স্নেহ করতেন। তিনি নিজে রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ায় প্রশাসনের টনক নড়ে। রাজনাথ সিংহও দিল্লিতে মুখর হন। নিরুপায় ইউপিএ সরকার আমায় প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পাঠায়।

২৮ ডিসেম্বর রাতে অনুরোধ আসে মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। তার সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলজির এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। সকলের অনুরোধ আসার পর জমিরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললাম, "আপনারা সকলকে নিয়ে বসুন। তারপর আপনাদের মতামত আমায় জানান।"

ঘন্টাখানেক মিটিংয়ের পর প্রদীপদা বললেন, "সরকার যখন আলোচনা করবে বলে কথা দিয়েছে, তখন আমাদের আন্দোলন সফল। এখান থেকেই চিকিৎসকরা আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবেন। এত অনুরোধ আসার পর সরকার নিশ্চয়ই তার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারবে না। আপনি দয়া করে আমাদের কথা মেনে অনশন তুলে নিন।"

ভাবলাম, এর পরেও অনশন প্রত্যাহার না-করলে সকলে ভাববেন, আমি কারও আবেদনেই সাড়া দিচ্ছি না। এমনকী, আমার আন্দোলনের সঙ্গীদের কথাতেও নয়! সরকারও বলতে পারে, তারা সমস্যার সমাধান করতে চায়। কিন্তু আমি তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছি না। তাই বিচারের আশায় সকলের অনুরোধ মেনে নিলাম। ধর্মতলায় অনশন মঞ্চ থেকেই আমায় নিয়ে যাওয়া হল এন জি মেডিকেয়ারে। সেখানে ডক্টর দাস এবং ডক্টর সুদর্শন ঘোষদস্তিদারের অধীনে আমার চিকিৎসা শুরু হল।'

২৬ দিনের অনশনের আমার ওজন প্রায় ১০ কিলো কমে গিয়েছিল। শারীরিক যন্ত্রণাও ছিল। চিকিৎসাধীন থাকার সময়েও সংক্রমণের ভয় ছিল। দীর্ঘদিন অনশনে শরীরে অনেক ঘাটতি তৈরি হয়েছিল। শক্তি সঞ্চয় করতে সময় লাগবে বলেই চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলেও চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞায় দেখা করতে পারেনি। অনশনের পরেও হাসপাতালে গিয়ে প্রথম চার-পাঁচদিন মুখে খাবার তুলতে পারিনি। তারপরেও তিনমাস ডাবের জল, গ্লুকোজ, ফল আর এমনি জল খেয়ে কাটাতে হয়েছিল।

ভেবেছিলাম, অতদিনের টানা অনশনের পর অন্তত রাজ্য সরকার কথা রাখবে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার—কেউ না! বরং আমি হাসপাতালে ভর্তি হতেই আবার সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা বলবত করা হয়েছিল।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীনই জানতে পেরেছিলাম নন্দীগ্রামের আন্দোলন ও তার রক্তাক্ত কাহিনি।

নন্দীগ্রাম। আমার আন্দোলনের ধাত্রীভূমি।

৯

নন্দী-মা এবং নেতাই

ধর্মতলার অনশন মঞ্চে থাকাকালীনই আমরা খবর পাচ্ছিলাম, বলপূর্বক বিভিন্ন জায়গায় জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারি নির্দেশনামা জারি করা হচ্ছে। যেখানে যেখানে ওই কাজ হচ্ছিল, সেখানেই আমাদের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাধারণ মানুষ।

যেমন পরমাণু কেন্দ্র তৈরি হবে বলে সরকারি খবর রটে গিয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের হরিপুরে। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারও। একদিকে পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য কয়েক হাজার একর জমি দখলের চেষ্টা। অন্যদিকে আবার ওই জেলারই নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণ। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। জমি হারানোর আতঙ্কে, পরমাণু কেন্দ্রের ভয়ে এবং সিঙ্গুরের কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপর সরকারি বাহিনীর অত্যাচার দেখে মানুষ আরও শঙ্কিত হচ্ছিলেন।

সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সিঙ্গুর-আন্দোলন চলাকালীনই শুরু হয়েছিল হরিপুরে প্রতিবাদ মিছিল। এমনিতেই তমলুক বা সাবেক তাম্রলিপ্ত চিরকালই আন্দোলনের পীঠস্থান। তাই জমি আন্দোলনেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ২৬ দিনের অনশন আন্দোলন প্রত্যাহার করার পরেই আমি অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। ফলে ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বহির্জগতের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগই ছিল না।

৩ জানুয়ারি রাতে প্রথম জানতে পারলাম, নন্দীগ্রামে জমিরক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বড় গন্ডগোল হয়েছে। জমি দখলের বিজ্ঞপ্তি জারি

হওয়ার পর ওখানকার সমস্ত মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন বিডিও অফিসে। পুলিশের সঙ্গে তখন তাঁদের বচসা হয়। তা থেকেই শুরু লাঠিচার্জ। জনগণের সঙ্গে সঙ্ঘাত শুরু হয় প্রশাসনের একাংশের। জমি দখলের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সময় থেকেই সঙ্ঘাত শুরু হয়েছিল। ক্রমশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। গ্রামবাসীরা এককাট্টা।

৭ জানুয়ারি সোনাচূড়ায় খুন হল বিশ্বজিৎ-ভরত-সেলিম। ক্রোধে- আক্রোশে জ্বলে উঠল নন্দীগ্রাম। সিপিএম হার্মাদদের হামলার প্রতিবাদে বেরিয়ে এলেন নন্দীগ্রামের দলমতনির্বিশেষে মা-ভাই-বোনেরা। নন্দীগ্রামের আন্দোলন পরিণত হল আত্মমর্যাদার আন্দোলনে। শুরু হল জীবন সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। সেখ সুফিয়ান, আবু তাহের, সোয়েম কাজি, কুদ্দুস, নিশিকান্ত মণ্ডলরা একজোট হলেন। তাঁদের সাহায্য করতে সর্বশক্তি দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। শিশির অধিকারী, শুভেন্দু অধিকারী, মুকুল রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সীরা ওই আন্দোলনকে নিজেদের অধিকার রক্ষার আন্দোলন ভেবেই নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন।

সিঙ্গুরের কৃষিজমি আন্দোলনের সময় থেকেই অনেক বামপন্থী বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা চলছিল। সিঙ্গুরের অনশন আন্দোলনে যাওয়ার আগে আমরা 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' গড়ে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। তখন সেই বামপন্থী বন্ধুরাও তাঁদের বুদ্ধি-পরামর্শ-সহযোগিতা ও ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতির কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন।

সিঙ্গুরের আন্দোলন যখন ধর্মতলায় কৃষিজমি রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলছিল, তখন বাংলাসহ দেশবিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওই আন্দোলনের যথার্থতা নিয়ে একটা জনমত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতিফলন ঘটেছিল মানুষের মধ্যে। যাঁরা জমি আগ্রাসনের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন, তাঁরা নিজেদের অধিকার রক্ষায় জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন। নন্দীগ্রাম থেকে হরিপুর, ভাঙড় থেকে ক্যানিং, ক্যানিং থেকে রায়চক, বারাসাত থেকে বর্ধমান, বর্ধমান থেকে বীরভূম, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে চা-বাগন—সর্বত্রই মানুষ গর্জে উঠেছিলেন।

সিঙ্গুর যে পথ দেখিয়েছিল, নন্দীগ্রাম তা গ্রহণ করে জমির লড়াইকে বাঁচার লড়াইয়ে পর্যবসিত করেছিল। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই বিশ্বজিৎ-ভরত-সেলিমের খুনের ঘটনা শুনে পার্থদা, মুকুল, দোলা সেন, পূর্ণেন্দু বসুকে সেখানে

পাঠাই। তাঁরা ফিরে এসে যা বলেছিলেন, ভয়ঙ্কর। সিপিএমের নেতারা তখন নন্দীগ্রামের মানুষকে জব্দ করতে পর পর এলাকায় হার্মাদবাহিনী সংগঠিত করে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে। তাদের সঙ্গে পুলিশ আছে বলেও জানতে পারি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই আমি নন্দীগ্রাম যাওয়ার সিদ্ধান্ত গিয়েছিলাম। ৪ ফেব্রুয়ারি গেলাম নন্দীগ্রামে। আন্দোলনে নিহত সাতজনের পরিবারের হাতে আমার সহকর্মীদের তরফে একলক্ষ টাকা করে সাহায্য তুলে দেওয়া হল। শোনা যাচ্ছিল, জমি অধিগ্রহণের সরকারি বিজ্ঞপ্তি নাকি প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। তাঁরা সেটা প্রথমে বিশ্বাসও করেছিলেন। কিন্তু দেখিয়েছিলেন, তেখালি ব্রিজ পেরিয়ে খেজুরির দিক থেকে প্রায় প্রতিদিনই সিপিএমের সশস্ত্র হার্মাদরা আসছিল হুমকি দিতে। অন্যদিকে, প্রশাসন আন্দোলনকারীদের জড়িয়ে দিচ্ছিল মিথ্যা মামলায়। যাতে তাঁরা আন্দোলন থেকে সরে আসেন।

ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল প্রশাসনের উপর অনাস্থা। যে রাস্তা দিয়ে সশস্ত্র সিপিএম ক্যাডারদের আনাগোনা চলছিল, সেই রাস্তা কেটে দেন গ্রামের মানুষ। প্রশাসন ঘোর বিপাকে পড়ল। বাঁচার পথ খুঁজছিলেন মানুষ। অত্যাচার, অনাচার, সন্ত্রাসকে জয় করে এগিয়ে যাচ্ছিল জোটবদ্ধ নন্দীগ্রাম। কিন্তু দীর্ঘ তিরিশ বছর যে মানুষ তাদের বশংবদ ছিল, তাদের এই ঘুরে দাঁড়ানো ভালো চোখে দেখল না সিপিএম। বিনয় কোঙার হুমকি দিলেন, "চারদিক থেকে গিয়ে পাল্টা মার দেওয়া হবে। ওরা অস্ত্র নিয়ে এলে আমরা কি চুপ করে থাকব? দরকার হলে ওদের দখলে-থাকা চারটে গ্রাম পঞ্চায়েত ঘিরে ফেলে জীবন জেরবার করে দেব। লক্ষ্মণ শেঠকে ফাঁসি দিলে কি শুভেন্দু অধিকারীরা বাঁচবে?"

২০০৭ সালের ৬ জানুয়ারির মধ্যে কেশপুর-লাইনেই নন্দীগ্রাম দখলের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল সিপিএম। খেজুরি, হলদিয়া এবং রেয়াপাড়া দিয়ে সশস্ত্র ক্যাডারদের ঢোকানোর পরিকল্পনাও চূড়ান্ত। গড়চক্রবেড়িয়া, কালীচরণপুর, সাউদখালি, সোনাচূড়া-সহ চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে অভিযানের যুদ্ধ শুরু করতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের অনুমতির অপেক্ষায় ছিল তারা। পুরো অভিযান পরিচলনার জন্য বিভিন্ন এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে ২৫টি ক্যাম্প গড়া হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, প্রথমে জমিরক্ষা আন্দোলনের নেতাদের তাড়াতে ময়দানে নামবে খেজুরির কুখ্যাত হার্মাদ বাহিনী। শিবিরগুলির মধ্যে

যোগাযোগের জন্য একাধিক মোবাইল ফোনও প্রতিটি শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। সিপিএমের আশ্রিত এলাকার দাগী অপরাধীদের খেজুরির তিনটি শিবিরে আনা হয়েছিল। ৬ জানুয়ারি সকাল থেকেই শিবিরগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সবক'টি শিবির মিলিয়ে প্রায় পাঁচহাজার ক্যাডার এবং দুষ্কৃতী নন্দীগ্রাম দখলমুক্ত করার প্রস্তুতি নেয়। আনা হয় অন্তত ৫০০ মোটরবাইক।

৭ জানুয়ারি সূর্যোদয়ের আগেই রক্তাক্ত হল নন্দীগ্রামের মাটি। মারা গেলেন তিনজন। ৩ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ এবং সিপিএমের তরফে মোট ১০টি মামলা দায়ের করা হল। অভিযুক্ত প্রায় এক হাজার জন।

রাতে হামলার আশঙ্কায় জেগে থাকতেন নন্দীগ্রামের মানুষ। শাঁখ-কাঁসর ঘণ্টা নিয়ে, মসজিদে মসজিদে মাইকের সামনে। বহিরাগতদের আক্রমণের সঙ্কেত দিতে। আন্দোলনকারী ও আন্দোলন-বিরোধীরা দু'ভাগে বিভক্ত তালপাটি খালকে মাঝে রেখে। উত্তরে নন্দীগ্রাম আন্দোলনকারীদের স্বভূমি। দক্ষিণে আন্দোলন-বিরোধী সিপিএমের দুর্ভেদ্য দুর্গ। একজন গড় রক্ষা করতে চায়। অন্যদল চায় প্রতিরোধ ভেঙে, গুঁড়িয়ে দিয়ে গড় দখল করতে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে ত্রাস আর আতঙ্ক গ্রাস করল নন্দীগ্রামকে। সিপিএমের সমর্থকরা ফেরিঘাট বন্ধ করে দেওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়ল। শিল্পনগরী হলদিয়ায় জনমজুর খাটতে-যাওয়া শ্রমিকদের রোজগারের পথ বন্ধ হল। বন্ধ হয়ে গেল শাক-সবজি-মাছের ছোট ব্যবসায়ীদের উপার্জনের রাস্তা।

৪ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের দিকনির্দেশ করতে নন্দীগ্রামের কলেজ-মাঠে বিশাল জনসভা করলাম। সেখানে বললাম, "সিঙ্গুর থেকেই সরকারের জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই আন্দোলন ছড়িয়ে গিয়েছে গোটা বাংলায়। শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। শিল্প বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জোর করে কৃষিজমি গ্রহণ আটকাব। বুদ্ধবাবু বাংলার মা-মাটি-মানুষকে বোঝেন না। তাই এ ভাবে কৃষিজমি নিচ্ছেন।"

সমাবেশে ছিলেন পার্থ'দা, পূর্ণেন্দু'দা, শুভেন্দু, সমীর পুততুণ্ড, কবীর সুমন, সুনন্দ সান্যাল এবং সিঙ্গুরে নিহত তাপসী মালিকের বাবা মনোরঞ্জন মালিক। অনশন প্রত্যাহারের পর নন্দীগ্রামের প্রথম জনসভাতেই আমি সরকারকে

চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলাম।

ক্রমে রাজ্য-রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বামফ্রন্টের শরিকদের মধ্যে মতভেদ প্রকাশ্যে চলে এল। ফ্রন্টের বৈঠকে শরিকরা প্রশ্ন তোলায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তিনি নাকি কিছুই জানতেন না। তাঁদের লোকেরা কেন সমীক্ষা না-করে মৌজার তালিকা তৈরি করেছে, জানতেন না। নন্দীগ্রাম যে এত ঘন বসতিপূর্ণ, জানতেন না। তাঁদের অন্যায় হয়ে গিয়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি নন্দীগ্রাম গিয়ে সব বুঝিয়ে বলবেন।

মুখ্যমন্ত্রী গেলেন। কিন্তু খেজুরির হেড়িয়াতে। নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা সেখানে যোগ না-দিয়ে নিজেরা মিটিং-মিছিল করলেন। সিপিএমের তরফে ৭ জানুয়ারির ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল মুখ্যমন্ত্রীর সভায়। কিন্তু তাঁরা কেউই গেলেন না। উল্টে বললেন, "খুনি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে টাকা নেব না!" সিপিএমের স্থানীয় নেতারা বললেন, সম্ভবত ওঁরা 'রাজনৈতিক কারণে' সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সেই সভায় বললেন, মানুষ না চাইলে নন্দীগ্রামে জোর করে জমি নেওয়া হবে না। কিন্তু মানুষের মনের সংশয় যায়নি। তাঁরা ভাবলেন, আন্দোলন থেমে গেলেই আবার জমি অধগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ফলে আন্দোলন আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মার্চের শুরুতে নন্দীগ্রামের দখল নেওয়ার জন্য সিপিএম এবং পুলিশি তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেওয়া হল। ৪ মার্চ, কোলাঘাটে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিথিশালায় বৈঠক হল 'অপারেশন নন্দীগ্রাম' নিয়ে। সেখানে হাজির পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গেই সিপিএমের নেতারা। তার পরেই নন্দীগ্রামের বিভিন্ন সীমানায় সশস্ত্র ক্যাডার বাড়াতে থাকে সিপিএম। ৫ মার্চ থেকে ১০ মার্চের মধ্যে পুরো পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে যায়। ১০ তারিখে জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। সেখানে লিখিত সিদ্ধান্ত হয়, প্রশাসন শান্তিরক্ষার জন্য রাস্তাঘাট ও ব্রিজ সারাবে। সে জন্য জরুরি প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই বৈঠকে অবশ্য ছিলেন না তৃণমূলের কোনো প্রতিনিধি। কিন্তু বৈঠকের সিদ্ধান্ত পৌঁছে যায় প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম দুই সেনাপতি শিশির'দা-শুভেন্দুর কাছে।

অনশনের জন্য গলব্লাডার নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রথমদফায় নন্দীগ্রাম থেকে

ঘুরে আসার পরেই আমার একটা অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। ভেবেছিলাম, নন্দীগ্রাম শান্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, তা হল না। রোজ বোমা-গুলি চলত। আমরা আমাদের দলের নেতাদের ঘনঘন সেখানে পাঠাতাম। ভেবেছিলাম, সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মর্যাদা দেবে। বারবার প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করেও কোনো লাভ হল না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তখন পরস্পরের বিশেষ বন্ধু। তাই কারও কাছেই সহায়তা পাওয়া গেল না। বিচার পাওয়া যাচ্ছে না। দেখে সাধারণ মানুষ নিজেরাই আত্মরক্ষার জন্য আবার জায়গায় জায়গায় রাস্তা কাটতে শুরু করলেন।

অস্ত্রোপচারের পরে চিকিৎসকদের নির্দেশে বাড়িতে থাকলেও আমি নিয়মিত খোঁজ রাখতাম। নন্দীগ্রামে গণহত্যা ঘটানোর আগে থেকেই আমার কাছে খবর আসছিল, খেজুরিতে সিপিএম প্রচুর অস্ত্র মজুত করছে। বাইরে থেকে দুষ্কৃতী ভাড়া করে এনে খেজুরিতে রাখছে। প্রতিদিনই তালপাটি খালের ও-পার থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে এ-পারে।

কিন্তু ১৪ মার্চের মতো একটা ঘটনা ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তবে কিছু কিছু তথ্য পাচ্ছিলাম। যেমন কোলাঘাটের সমস্ত অতিথিশালা 'বুক' করে নেওয়া হয়েছিল। ১০ মার্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশের বড়কর্তাদের সঙ্গে সিপিএমের নেতাদের নিয়মিত বৈঠক হচ্ছিল। পুলিশকে পথ দেখানো এবং আন্দোলনকারী নেতাদের চিনিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সিপিএমের বাহিনীও ভিতরে যায়। পুলিশের পোশাক এবং অস্ত্রও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১০ মার্চে পর থেকেই সিপিএম এবং প্রশাসনের দাপাদাপি বেড়ে গিয়েছিল। উন্নয়নের জন্য গ্রামে ঢুকতে বাধা দেওয়া অনুচিত—এই বার্তা ছড়িয়ে যেতে আন্দোলনকারীরা কিছু কিছু রাস্তা পুলিশের যাতায়াতের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্কা তাঁদের মনে ছিলই। কিছু কিছু খবরও বাইরে চলে আসছিল। পুলিশের একাংশের মাধ্যমে।

১৪ মার্চের ঘটনা তো আর বিশদে বলার কিছু নেই। পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। আরও অনেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন। তাঁদের এখনও খোঁজ মেলেনি।

অস্ত্রোপচারের জন্য আমার তখন গাড়িতে বেশি সময় যাতায়াত করা বারণ। বাড়িতেই খবর পেলাম নন্দীগ্রামের। কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে গেলাম।

তারপর সম্বিত পেয়ে ছুটলাম বাড়ির পাশের অফিসে। সেখানে দ্রুত জমিরক্ষা কমিটি ও তৃণমূল নেতাদের ডেকে পাঠালাম। তারপর সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক বৈঠক করে রওনা দিলাম নন্দীগ্রামের পথে।

রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল। তাদের মুখে শুধু নন্দীগ্রাম-গণহত্যার কথা। কোলাঘাটে পৌঁছোনর পরেই মুখোমুখি হলাম একদল সিপিএম ক্যাডারের। তারা আমার গাড়ি আটকাল। তারপর অকথ্য গালিগালাজ করতে লাগল সেখানে দাঁড়িয়ে। সে ভাবেই রাত ঘনিয়ে এল। সিপিএমের নেতাদের নির্দেশ ছিল, আমাদের যেন নন্দীগ্রামের দিকে যেতে না দেওয়া হয়। সুতরাং, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। প্রশাসন মূক-বধির-অন্ধ। ততক্ষণে সিপিএমের ক্যাডাররা বাকি মৃতদেহগুলো হলদি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছিল। আমরা তখন নন্দীগ্রামে পৌঁছোলে তো সকলে ব্যাপারটা জেনে যেত। রুখে দেওয়া হয়েছিল সংবাদমাধ্যমকেও। আসলে সরকার এবং প্রশাসন ভাবতে পারেনি, অসুস্থ শরীরেও আমি গণহত্যার কেন্দ্রস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়তে পারি। তাই সেদিন আমাদের সারা রাত রাস্তায় আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছিল তারা। নন্দীগ্রামের সমস্ত রাস্তাই বন্ধ করে রাখায় প্রায় মধ্যরাতে ঘুরপথে আমরা তমলুকে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। পরদিন সকালে যাতে অন্তত নন্দীগ্রাম পৌঁছোতে পারি, তার ব্যবস্থা করছিলাম। ফলে সরকারের পরিকল্পনা পুরোটা কার্যকর করা যায়নি। মাঝরাতে তমলুকে পৌঁছনোর পরেও সিপিএমের ক্যাডাররা আমাদের গাড়ি ঘিরে উন্মত্ত তান্ডব চালিয়েছিল। কেউ বলছিল, "চল। সকলকে বাদ দিয়ে তোকে একা নিয়ে যাই।" কেউ বলছিল, "একটা পেট্রোল বোমা নিয়ে আয়। মুখটা পুড়িয়ে দিই এখানেই!" আমার সঙ্গে ছিল দোলা, পূর্ণেন্দু'দা আর অনুরাধা পুততুণ্ড। প্রত্যেক্যেই ঘটনার স্তম্ভিত।

অগত্যা মাঝরাতের পর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ফোনে ধরলাম। বললাম, "এখানে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটছে। কিছু একটা করুন।"

তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আর ফোন করলেন না! টেলিভিশনে লোকসভার বিরোধী দলনেতা সমস্ত দেখে ফোন করলেন। বললেন, ওখানে আইনের শাসন নেই। আমরা যেন ওখান থেকে সরে যাই। দিল্লি এবং কলকাতা থেকেও বহু হিতৈষীর ফোন আসছিল এলাকা ছাড়তে বলে। ফলে তমলুকে ফিরে যেতে হল রাতে।

পরদিন সকালে আবার রওনা দিলাম নন্দীগ্রামের পথে। জানতাম, সিপিএম ক্যাডাররা আবার পথ আটকাবে। রেয়াপাড়ার মুখে ওরা যথারীতি আমাদের পথ আটকাল। বাধা পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। অনেকদূর যাওয়ার পর দেখতে পেলাম প্রায় ১০ হাজার মানুষের একটা মিছিল আসছে নন্দীগ্রামের দিক থেকে। মিছিলের নেতৃত্বে শেখ সুফিয়ান। রেয়াপাড়ায় আমাদের আটকে দেওয়া হয়েছে খবর পেয়েই সুফিয়ানরা আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল।

প্রথমেই গেলাম হাসপাতালে। অবর্ণনীয় দৃশ্য। ভিতরে যখন আগতদের সঙ্গে কথা বলছি, বাইরে শুরু হল কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া। হাসপাতালের মধ্যেই এসে পড়ল গ্যাসের শেল। কারও পেটে গুলি, কারও কোমরে, কারও পিঠে, কারও হাতে, কারও পায়ে গুলির আঘাত। মাথায় গুলি খেয়েও কেউ লড়েছে মৃত্যুর সঙ্গে।

পরের কয়েকদিন সংবাদের শিরোনামে রইল নন্দীগ্রাম। রাজ্যের দেশে, বিদেশেও। রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী গেলেন হাসপাতালে। আহতদের সঙ্গে দেখা করতে। ১৬ তারিখে সিবিআইয়ের টিম গেল তদন্ত করতে। বামফ্রন্টের শরিকদল থেকে শুরু করে রাজ্যপাল, হাইকোর্ট থেকে সাংসদ— কাঠগড়ায় দাঁড় করাল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর সরকারকে। সমালোচিত হলেন ঘরে-বাইরে। দেশ ও বিদেশে। নন্দীগ্রামের ঘটনায় ব্যথিত তিনজন লেখক রাজ্যের দেওয়া পুরস্কার ফিরিয়ে দিলেন। আরও বহু বিশিষ্টজন ফিরিয়ে দিলেন রাজ্য সরকারের পুরস্কার। অনেকে পুরস্কারের অর্থমূল্য দান করলেন নন্দীগ্রামের নিহত-আহতদের জন্য ত্রাণ তহবিলে।

নন্দীগ্রামের গণহত্যার পর মানুষ ভেবেছিলেন, আর নয়। এ বার শেষ হবে অশান্তি। আন্দোলনকারী এবং সাধারণ মানুষ আবার বিচারের আশায় বুক বেঁধেছিলেন। হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করে। কুখ্যাত জননী ইটভাটা থেকে সশস্ত্র সিপিএম হার্মাদদের গ্রেফতার করে। বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা হতে থাকে বোমা এবং অস্ত্রশস্ত্র। সিবিআই তদন্ত শুরুর পর থেকেই শাসকদল এবং সরকার খানিকটা পিছু হঠাতে শুরু করেছিল। সিবিআই-ও তদন্ত করে তাদের রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছিল। সকলেই উৎসুক ছিল, রিপোর্টের বিষয়বস্তু জানতে। কিন্তু কেউই তা জানতে পারেনি। আমি অনেকের

কাছ থেকে শুনেছিলাম, তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক সিপিএম নানা ছলচাতুরি করে এমন ব্যবস্থা করেছিল, যাতে ওই রিপোর্ট দিনের আলো না দেখতে পায়। তার মধ্যে ছিল এমনকী, রাজনৈতিক চাপও। ফলে সিপিএমের সরকার সিপিএম দলকে বার্তা দিল, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না।

শুনেছি, সেই খবর পেয়েই সিপিএম হার্মাদরা আবার নন্দীগ্রামে অত্যাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। খেজুরি তখন সম্পূর্ণভাবে হার্মাদদের দখলে। সেখানেই মজুত ছিল অস্ত্রভান্ডার। প্রতিদিনই গুলিগোলা চালানো শুরু হল। খবর শুনে আমিও রোজই প্রায় রাজনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠাতে শুরু করলাম সেখানে। নিয়মিত যেতে শুরু করলেন মহাশ্বেতা দেবী, কবীর সুমন, শাঁওলি মিত্র, অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষ, শুভাপ্রসন্ন, বিভাস চক্রবর্তী, জয় গোস্বামী, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল, তরুণ সান্যাল, অশোকেন্দু সেনগুপ্তরা। একবার নয়, বহুবার।

আমি নিজে যে কতবার গিয়েছিলাম, তার সংখ্যা আমিও জানি না।

সিবিআইয়ের রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা পড়ার পর থেকেই কিন্তু আবার উল্টো বাতাস বইতে শুরু করল। পুজোর সময় পরিকল্পনা করে ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রামে 'সূর্যোদয়' ঘটানোর চেষ্টা করল সিপিএম। তার আগে ২৮ অক্টোবর আমি গিয়েছিলাম সেখানে। একের পর এক অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে থাকায় মানুষকে নৈতিক সমর্থন দিতে। তেখালি ব্রিজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে ও-পাশ থেকে গুলি ছুটে এল। গাড়ির সামনে এসে পড়ল কার্তুজের ফাঁকা খোল। আমি গ্রামবাসীদের বললাম, "আপনারা ঝুঁকি নেবেন না। গুলি লাগতে পারে আপনাদের।" জবাবে ওঁরা বললেন, জীবন বাজি রেখে আমাদের রক্ষা করবেন। একটা ভ্যান রিকশার উপর মাইক লাগিয়ে ওঁরা সভা শুরু করে দিলেন। আমার ধারেকাছে তখন কোনো পুলিশ নেই। শুধু দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী দ্বিবেদী'দা আর স্বরূপ। ছিলেন সাংবাদিকরা। টানা দু'তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সিপিএমের গুণ্ডাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় কাঁথি পুরসভায় একটা কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা ছিল। সকলে অনুরোধ করতে থাকল সেখানে যাওয়ার জন্য। অনেক রাত করে শেষপর্যন্ত সেখানে পৌঁছোলাম। সে রাতে কাঁথিতেই থেকে গেলাম। ঠিক করলাম, সকাল

হলেই যাব নন্দীগ্রামের দিকে। কিন্তু খবর পেলাম, সিপিএম কাঁথির চারপাশে সমস্ত পথ অবরোধ করে রেখেছে। নন্দীগ্রাম থেকে কাউকে আসতে বা সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। রাত পর্যন্ত অবরোধ উঠল না। পরদিন আবার নন্দীগ্রামের মানুষের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আমাদের বাংলা বন্‌ধ ছিল। সে রাতে না-ফিরলে আর ফেরা যেত না। তাই চলে এলাম বন্‌ধের দিন কলকাতায় থাকতে হবে। নন্দীগ্রামকে ঘিরে সেই অবরোধের নাম সিপিএম দিল 'সূর্যোদয়'।

৬ নভেম্বর থেকে কালীপুজোর মধ্যে নন্দীগ্রামকে ঘিরে তাণ্ডব চালাল সিপিএম। নিহত ও আহত হন কয়েকজন। ২৯ অক্টোবর থেকেই নন্দীগ্রামে যাওয়ার সমস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল সিপিএম। সাংবাদিকদেরও প্রবেশে ছিল নিষেধাজ্ঞা। তখন আমি তৃণমূল ভবনে থাকতাম। ফোন বাজলেই মনে হত, কোনো দুঃসংবাদ নয়তো? ভাবতাম, কবে আবার নন্দীগ্রামের মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারব। সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল, যখন শুনলাম, ১০ নভেম্বর কালীপুজোর দিন নন্দীগ্রামের মানুষেরা একটা শান্তিমিছিল করছিলেন আর তার উপর গুলি চালিয়েছে সিপিএম হার্মাদরা। অনেকে রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। অনেকে আহত। অনেককে নাকি আবার টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হলদি নদীর দিকে। কালীপুজোর আলোর রাত কালো হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল দীপাবলির উজ্জ্বল্য। সেই রাতে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফোন করে সাহায্য চাইলাম। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ঠিক করলাম, নন্দীগ্রামে যেতেই হবে। পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম। খবর পেলাম, আবার আমাদের বাধা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সিপিএম।

আবার গতবারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। পার্থ'দা বললেন, একজন পদস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে খবর পেয়েছেন, রাতে আমাদের প্রাণনাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাস্তায় যেন ওইভাবে দাঁড়িয়ে না-থাকি। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম, কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অতিথিশালায় রাতের বাকি দু'একঘণ্টা কাটিয়ে দেব।

পরদিন ভোরবেলায় আবার শুনলাম, নন্দীগ্রাম চারদিক থেকে অবরুদ্ধ। কিন্তু আমরা কোলাঘাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বেরোনর আগে এক শুভার্থীকে বললাম, "তুই শুধু তোর মোটরবাইকটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে আয়।"

সিপিএম ক্যাডাররা আবার অবরোধে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, আমরা কোলাঘাটের পাশ দিয়েই যাব। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, পাঁশকুড়ার ভিতর দিয়ে এগোব। সিপিএম তা জানত না। তবে কয়েক কিলোমিটার ঢুকে পড়ার পর তারা খবর পেয়ে আবার পিছু ধাওয়া শুরু করল। আবার অবরোধ। আবার কটূক্তি। আমি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালাম। লক্ষ্য করলাম, ওদের ক্রোধের মাত্রাটা। আর কী কী গালিগালাজ করছে। ভাবতে ভাবতেই মুকুল, দোলা আর কাকলি ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথা বলতে বলতেই চোখের ইশারা করালাম বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীকে। চোখের পলকে সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে আমি ঝট করে ওর বাইকে চড়ে বসলাম। আর বললাম, "খুব জোরে চালা। কোনোদিকে তাকাবি না। কোথাও থামবি না আমায় জিজ্ঞেস না-করে।"

দ্রুত চলতে শুরু করল বাইক। ততক্ষণে পুলিশ-সিপিএম আমাদের গরুখোঁজা খুঁজছে। অনেক পথ পেরিয়ে যখন আমরা পাঁশকুড়া শেষ করে বড় রাস্তার উপর গিয়ে তমলুক যাওয়ার রাস্তার উপর, তখন দেখলাম, আবার কমরেডরা খোঁজখবর নিয়ে আমাদের রাস্তা আটকে দিয়েছে। ততক্ষণে মুকুলরাও কয়েকটা বাইক জোগাড় করে এসে আমাদের ধরে ফেলেছে। এবার মুকুলকে বললাম, কয়েকজন স্থানীয় ছেলেকে জোগাড় করতে। যারা গ্রামের ভিতরের রাস্তাগুলো চেনে। ততক্ষণে খবর পেয়ে দলে দলে মানুষ আমার পাশে জড়ো হতে শুরু করেছেন। তাঁরাও চাইছিলেন, আমরা যাতে নন্দীগ্রাম পৌঁছোতে পারি।

দু'তিনজন স্থানীয় যুবককে নিয়ে আমরা এক অচেনা রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করলাম। সিপিএমের কমরেডদের অবরোধের একেবারে উল্টোদিকে। তিনটে বাইকে আমরা ছ'জন। তিন-চারটে গ্রাম পেরোনর পর দেখলাম, পিছনে বাইকের সংখ্যা বাড়ছে। পিছন থেকে আওয়াজ এল, "দিদি, আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আছি। ঠিক যাচ্ছেন। আমরা আপনারই কর্মী। কোনো চিন্তা নেই। অনেক তৃণমূল কর্মী আছে আশেপাশে। খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। কেউ আটকাতে পারবে না আপনাদের। আপনাকে ঠিক তমলুকে পৌঁছে দেব।"

তমলুকে ঢোকার মুখেও অবরোধে পড়তে হবে, জানতাম। তাই মুখ ঘুরিয়ে বললাম, জেলার পুলিশসুপারের অফিসের দিকে যাব। সমস্ত বাইকের মুখ যখন

ঘুরে গিয়েছে, তখন মুকুলকে ইশারা করলাম হাসপাতালের দিকে যেতে। ওখানে ভর্তি আহতদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ পাব জানতাম। বোকার মতো সিপিএমের অবরোধকারীরা দৌড়োল পুলিশ সুপারের অফিসের দিকে। আমরা ঢুকে পড়লাম হাসপাতালে। তার আগেও ওরা একবার বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের অগ্রাহ্য করেছিলাম পুরোপুরি। হাসপাতালে যে বর্ণনা শুনলাম, ভয়ঙ্কর। ঠিক করলাম, পুলিশসুপারের অফিসের সামনে ধরনায় বসব। সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। কিন্তু সারা বাংলায় এক শোকের দিন। নন্দীগ্রামের পথে বেরিয়েও দুটো দিন কেটে গেল পথের ধুলোয়। মধ্যরাতে ফিরে গেলাম তমলুকের আশ্রয়ে। ভাবলাম, পরদিন যাব। প্রধানমন্ত্রী তখন রাশিয়ায়। সেখানে তাঁর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নন্দীগ্রামের অসহনীয় অত্যাচারের কথা জানালাম। সিআরপিএফ পাঠানোর অনুরোধ করলাম। সাহায্য চাইলাম গোটা রাজ্য, এমনকী, দিল্লিতেও আমাদের পরিচিতদের কাছে।

দিল্লিতে বুদ্ধিজীবীরা অনেকে রাস্তায় নামলেন। আর কলকাতা-সহ সারা বাংলার সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, কবি, নাট্যব্যক্তিত্ব, চলচ্চিত্র জগৎ, সাংস্কৃতিকে কলাকুশলীরা নামলেন পথে। প্রেসিডেন্সি থেকে যাদবপুরের ছাত্রছাত্রীরা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামবাংলা—সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তখন চলছিল কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। অভিনেতা, বুদ্ধিজীবীরা উৎসব বয়কট করলেন। ফিরিয়ে দিলেন তাঁদের অর্জিত পুরস্কার। কলকাতাকে উত্তাল করে রাজপথে হল মৌনমিছিল। মিছিলে অংশ নিয়ে প্রতিবাদ- প্রতিরোধের ঢেউ তুললেন সমাজের বিশিষ্টজনেরা চিত্রশিল্পীরা ক্যানভাসে আঁকলেন নন্দীগ্রামের সন্ত্রাসের ছবি। শঙ্খ ঘোষ-জয় গোস্বামীদের কবিতা, প্রতুল মুখোপাধায়-কবীর সুমনের গান, কৌশিক-ব্রাত্য-রেশমী-মণীশ-অর্পিতাদের নাটকের সংলাপের মধ্যে প্রতিবাদের ভাষা পেলেন বাংলার অগণিত মানুষ।

সারা দেশ তোলপাড় হয়ে গেল। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য তখনও অপেক্ষা করতে হচ্ছে। সিপিএমকে অখুশি করতে চায়নি কেন্দ্রে তাদের 'বন্ধু সরকার'। তমলুকে তিনদিন ধরে পড়েছিলাম সহকর্মীদের নিয়ে। যাতে নন্দীগ্রাম থেকে দূরে না যেতে হয়। সেখান থেকেই আন্দোলন সংগঠিত করেছি। নন্দীগ্রমের আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। শেষমেশ সাংবাদিক বৈঠক করে বললাম, "যতক্ষণ না সিআরপিএফ

নন্দীগ্রামে পৌঁছবে, আমি এখান থেকে যাব না।”

শেষপর্যন্ত বিভিন্ন মহলের চাপে পড়ে, জনমতকে উপেক্ষা করতে না পেরে খানিকটা ঢোক গিয়ে হলেও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে হয়েছিল নন্দীগ্রামে। ততদিনে রাজ্যপাল গোটা ঘটনাকে অনৈতিক-অগণতান্ত্রিক-অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। একই কথা বলেছেন অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞও। সেই সময়েই সংবাদমাধ্যম মারফত জানলাম, লোকসভার তৎকালীন বিরোধী দলনেতা নন্দীগ্রামে আসবেন। মুকুলকে বললাম, এবার তাঁর নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবেই। বাস্তবেও তাই হল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল, যা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি যেন আর না-হয়।

টানা ১০ দিন নন্দীগ্রাম অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর সেখানে সিআরপিএফ এল।

বিরোধী দলনেতার কনভয়ের মধ্যে একটা গাড়িতে নন্দীগ্রামে চলে গেল মুকুল, পূর্ণেন্দু'দা। ফিরে এসে ওরা আমায় রিপোর্ট দেওয়ার পর শুরু করলাম ত্রাণের কাজ। হাজার হাজার মানুষ তখন ঘরছাড়া। স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হল ত্রাণশিবির। সিআরপিএফের উপর মানুষের আস্থা জন্মেছিল। অলোক রাজ ছিলেন তাদের নেতৃত্বে। প্রায় প্রতিদিনই ত্রাণ পাঠানো হত।

অসম্ভব মানসিক শক্তি দেখেছি আমি নন্দীগ্রামের মানুষের মধ্যে। অফুরন্ত বিশ্বাস দেখেছি। সংহতির মেলবন্ধন দেখেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। সিঙ্গুর আন্দোলনের মতোই নন্দীগ্রামেও মা-বোনেদের মনের জোর দেখেছি বারবার। বহুবার। সংখ্যালঘুদের দৃঢ় মানসিকতা আর তফসিলি ভাইবোনদের প্রাণোন্মাদনা নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে ঐতিহাসিক করেছিল।

যে ইতিহাসের হাত ধরে পঞ্চায়েত ভোটে আমাদের বিপুলভাবে জয়ী করেছিলেন মানুষ।

* * *

নন্দীগ্রামের সন্ত্রাসের বাতাবরণ থেকেই বাংলার বাতাসে ছড়িয়ে গেল এক অমানবিকতার বাতাস। রিজওয়ানুর রহমান। অর্থশক্তি ও রাজশক্তির যৌথ বিষবাষ্পের শিকার হল রিজওয়ানুরের পরিবার। ছুটে গেলাম তাদের পাশে দাঁড়াতে। আন্দোলনের পাশাপাশিই দলীয় সহকর্মী আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বললাম আদালতে আইনি লড়াই লড়তে। রিজওয়ানুরের মা

কিশওয়ার জহান বলেছিলেন, হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ার অর্থবল তাঁদের নেই। আমি বলেছিলাম, "মাসিমা, আপনি আমাদের মা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মামলা যে ভাবে লড়েছে কল্যাণ, আপনার রিজের মামলাও সে ভাবেই লড়বে।"

এসব মামলা আমরা বরাবরই বিনা পারিশ্রমিকে লড়ি। মানুষের পাশে দাঁড়াতে। ভিখারি পাসোয়ান থেকে রিজওয়ানুর—সমস্ত ঘটনাতেই আমার সহকর্মীরা নাগরিক আন্দোলন থেকে আইনি লড়াই, সমস্তই নিজেদের সীমিত সাধ্য নিয়ে লড়েছে। কল্যাণ তো সারাক্ষণ দলের মামলা করেই বেড়ায়। রিজওয়ানুরের মৃত্যু আমাদের হৃদয়ের গভীরে এক নিবিড় চেতনার জন্ম দিয়েছিল। সামাজিকতা ও মানবিকতার তোয়াক্কা না-করে শাসকরা যখন কাঙালের মতো ব্যবহার করে, তখন সেই চেতনা আমাদের ঘুম ভাঙায়। রিজওয়ানুরের মৃত্যু এ সমাজের ধারক-বাহকদের বহু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। রিজওয়ানুরের মৃত্যুর ঘটনায় সমাজের বহু ক্ষেত্রের মানুষ বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন। এত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ দৃঢ়তা বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনের জায়গাটাকে আরও পোক্ত করেছিল। কিন্তু এখনও বিচার পায়নি সিঙ্গুরের বঞ্চিত পরিবারগুলি। পায়নি রিজওয়ানুর। পায়নি ভিখারি পাসোয়ানের পরিবার।

নানুর থেকে ছোট আঙারিয়া। কেশপুর থেকে চমকাইতলা। মানুষকে বিচার দিতেই আমাদের পথে নামা। যে পথের আরও একটি মাইলস্টোন পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ের নেতাই গ্রাম।

মঙ্গলকোট, কেতুগ্রামের তিনজন তৃণমূল সহকর্মীর শবদেহ নিয়ে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলায় মোড় পর্যন্ত শোকমিছিল করছিলাম ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি। ধর্মতলার মোড়ে শহিদবেদি তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ভাবিনি, এক শবযাত্রা থেকে যেতে হবে আরও এক শবযাত্রায়।

খবরটা পেলাম মুকুল আর শুভেন্দুর থেকে। লালগড়ের নেতাইয়ে সিপিএম হার্মাদরা গুলি করে কয়েকজনকে মেরে ফেলেছে। শুভেন্দুর ফোন পেয়েই ওকে বললাম, নেতাইয়ের পথে রওনা হয়ে যেতে। কলকাতা থেকে রওনা করিয়ে দিলাম পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। মিছিল শেষ করে আমি আর মুকুল রওনা দিলাম মেদিনীপুরের পথে। ততক্ষণে চ্যানেলে চ্যানেলে নেতাইয়ের ঘটনা

জেনে গিয়েছেন সাধারণ মানুষ। যেতে যেতেই খবর পেলাম মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাত। তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা। একজনের মাথার খুলি উড়ে গিয়েছে। একজনের পেটের নাড়িভুঁড়ি সমস্ত বেরিয়ে এসেছে। মেদিনীপুরে যখন পৌঁছোলাম, তখন শীতের সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে। মেদিনীপুরের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে হাজারে মানুষ। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত, আশঙ্কিত। অন্ধকারে নেতাইয়ে গিয়ে কোনো লাভ হবে না বুঝে সেদিন হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে কথা বললাম। যা বুঝলাম, নিরস্ত্র-অসহায় মানুষদের উপর রাইফেলের দাপট দেখিয়েছে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী। বিস্তারিত আলোচনা করে সার্কিট-হাউসে ফিরে এলাম। ততক্ষণে পার্থদা-শুভেন্দু নেতাই থেকে ফিরেছে। আরও বিস্তারিত জানলাম।

পরদিন সকালে পৌঁছোলাম নেতাইয়ে। ঘটনাস্থলে তখনও চাপ চাপ রক্ত। গুলির ঘায়ে তখনও ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। জানলাম, হার্মাদদের গুলিতে সাতজন নিহত তো বটেই, গুলিবিদ্ধ আরও ১৮ জন। মোট আহত ৫০। সকালেই ওই গণহত্যা ঘটিয়েছে হার্মাদরা। পরিকল্পনা করে। সিপিএম নেতা রথীন দন্ডপাট এবং অবনী সিংহের নেতৃত্বে। যে দোতলা বাড়ি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে এসেছিল, সেখানেই ছিল সিপিএম হার্মাদদের সশস্ত্র শিবির। ঘটনা ঘটার পর বাড়িতে ঢুকে দেখা গিয়েছিল সিপিএমের লালঝান্ডা। ফেলে যাওয়া অস্ত্র উদ্ধার করেছিল সিআরপিএফ। তার মধ্যে ছিল দু'টি একনলা বন্দুক এবং একটি হাতকামান। তার আগের প্রায় ২৫দিন ধরে ওই বাড়ির দখল নিয়েছিল জনা তিরিশেক বহিরাগত যুবক। তারা সশস্ত্র ছিল। বললেন গ্রামবাসীরা। গ্রামে ঢোকা আর বেরোনর সময় নাকি তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হত বাসিন্দাদের। এমনকী, স্কুলছাত্রদেরও।

গ্রামবাসীদের একজন গৌরাঙ্গ মণ্ডল বললেন, "মুখ বুজে সহ্য করছিলাম। ওরা বলত, এলাকায় মাওবাদী সন্ত্রাস রুখতে আমরা নিরাপত্তা দিতে এসেছি। আমাদের টাকায় খেত। রুটিন ছিল, আজ অমুক বাড়ি থেকে চাল যাবে। কাল তমুক বাড়ি থেকে ডাল। কে কবে গিয়ে রান্না করে দেবে, তা-ও ওরা ঠিক করে দিয়েছিল।" গ্রামের যুবক জয়দেব মণ্ডল বললেন, "বৃহস্পতিবার গ্রামের যুবক থেকে বৃদ্ধদের বৈঠক ডেকেছিল ওই বহিরাগতরা। সেখানে তারা জানায়, এবার থেকে গ্রামের মানুষদের রাতপাহারা তো দিতেই হবে। সঙ্গে শরীরচর্চাও

করতে হবে। বন্দুক চালাতে শিখতে হবে। আমরা বলেছিলাম, সারাদিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমাদের পক্ষে শীতের রাতে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়। শরীরচর্চা বা বন্দুক চালানো তো অনেক দূরের কথা।"

কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকেলেই অনেককে জোর করে দৌড় করানো হয়। ছুটতে গিয়ে অনেকে পড়ে যান। অনেকে বমি করে ফেলেন। কিন্তু কথা না-শুনতে চাওয়ায় ওই যুবকরা কয়েকজনকে মারধরও করে। তার পরেই গ্রামবাসীরা ঠিক করেন, সিপিএমের কাছে আবেদন করবেন, জবরদস্তির অস্ত্রশিক্ষা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক। সেই আবেদন জানাতেই তাঁরা ওই দোতলা বাড়ির কাছে গিয়েছিলেন। সিপিএমের দুই নেতার নির্দেশে হার্মাদ ক্যাম্পের সামনে তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু ওই নেতারা নির্দেশ দেন, ক্যাম্পে গিয়ে রান্নার জল তুলে দিতে হবে। জামাকাপড় কেচে দিতে হবে। হার্মাদদের গা-হাত-পা মালিশ করতে হবে। তাদের সম্বোধন করতে হবে শান্তিবাহিনী বলে।

জনতা আপত্তি জানানোয় গুলিবৃষ্টি শুরু হয়। বাকিটা সেই অতীত গণহত্যার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ঘটনার পর সশস্ত্র যুবকের দল এলাকা ছেড়ে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পালায়। একটি দল গ্রাম-লাগোয়া কাঁসাই নদী পেরিয়ে চলে যায় বেলাটিকরির দিকে। অন্যটি পালপাড়ার দিকে। তখন বেলা প্রায় সাড়ে ১০টা।

ভাবছিলাম, নেতাই গ্রাম থেকে লালগড়ে যৌথবাহিনীর ক্যাম্প ও লালগড় থানার দূরত্ব মাত্রই আড়াই কিলোমিটার। কাঁটাপাহাড়িতে আরও একটি ক্যাম্প যৌথবাহিনীর। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে নসিপুরেও যৌথবাহিনীও আরও একটি ক্যাম্প ছিল। তিনটি ক্যাম্প ও লালগড় থানাকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ভাড়াটে হার্মাদবাহিনী অত লোককে গুলি করে মেরেছিল।

সকাল ৭টা থেকে টানা তিনঘণ্টা হার্মাদরা গ্রাম ঘিরে রাখায় উদ্ধার করা যায়নি আহত-নিহতদের। সেই তিনঘণ্টা হদিস ছিল না পুলিশ বা যৌথবাহিনীরও।

নেতাইয়ের মানুষেরা ঘিরে ধরে বলেছিলেন, তাঁরা কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নন। নিহত-আহতরা সকলেই গরিব মানুষ। কেউ দিনমজুর। কেউ ছোট

চাষী। পুলিশের কাছে তারা বারবার খবর পাঠিয়েছিলেন, হার্মাদ-ক্যাম্প ঘিরে রেখেছেন। পুলিশ যেন তাড়াতাড়ি আসে।

কেউ আসেনি।

নেতাইয়ের রক্তস্নাত মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, আর কতদিন? এই অত্যাচার-অবিচার-অনাচারের শেষ নেই? সিপিএমের অপশাসন এর পরেও চলবে বাংলার বুকে?

১০

অবশেষে

গত বছরের ১৩ মে আমার কালীঘাটের বাড়ির উঠোনে যখন লক্ষ মানুষের ভিড় সবুজ আবিরে মাখামাখি, কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে সুদূরে, তখন আমার মনে সিনেমার ফ্ল্যাশব্যাকের মতো ছবিগুলো সরে সরে যাচ্ছিল।

২০০৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। প্রথম সকলে বুঝলেন, বাংলায় ভোট হয় না!

সমস্ত খবরের কাগজে সেই ভোটে রক্তস্নাত বাংলার ছবি। রিপোর্ট।

২০০৪ সালে এলেন আফজল আমানুল্লা। সেই অকুতোভয় আইএএস প্রথম নির্বাচন কমিশনকে ৭০ পাতার রিপোর্ট দিলেন। যাতে তিনি সরাসরি বললেন, 'বেঙ্গল ইলেকশন ইজ নাইদার ফ্রি, নর ফেয়ার'। তা সত্ত্বেও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন এক আশ্চর্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রইল আমাদের কাছে। মানুষের মুখচোখের সঙ্গে যার ফলাফলকে কিছুতেই মেলাতে পারিনি। এখনও পারি না। তৃণমূল মাত্র ৩০টা আসনে জিতল। নির্দল মিলিয়ে কংগ্রেস ২৬টা। ১১৭টা আসন আমরা হেরে গেলাম ভোটের বিভাজনে। কিন্তু ২১২টা আসনে আমরাই দ্বিতীয় স্থানে রইলাম।

২০০৬ সালের ১৭ মে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ২৫ মে টাটারা জমি দেখতে গেল সিঙ্গুরে। মানুষ তাদের ফিরিয়ে দিলেন। তারপর এল ২৫ সেপ্টেম্বর। যে রাতের কথা আমি এই বইয়ের 'সিঙ্গুর ও অনশন' পরিচ্ছেদে লিখেছি। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে সিঙ্গুরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে ৪৪ বার! তারপরেই নন্দীগ্রাম। গোটা ২০০৭ সাল জুড়ে যার রেশ রইল।

২০০৮ সালে এল আবার পঞ্চায়েত নির্বাচন। নন্দীগ্রামের দুটো পঞ্চায়েত

জিতল তৃণমূল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ জিতলাম আমরা। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় জিতলাম। উল্টোদিকে কংগ্রেস হারাল মুর্শিদাবাদ। ধরে রাখল মালদহ আর উত্তর দিনাজপুর।

২০০৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেও আমরা মানুষকে বোঝাতে পারছিলাম না, সিপিএমকে হারানো যেতে পারে। শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের সঙ্গে আসন-সমঝোতা হল। আমরা পেলাম ১৯টা আসন। কংগ্রেস পেল ছ'টা। আমাদের সঙ্গে থেকে এসইউসি পেল একটা আসন। আর দার্জিলিং আসনটা পেল বিজেপি। জঙ্গলমহলে তথাকথিত অতিবামেরা ভোট বয়কট করলেন। জিতে গেল সিপিএম। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন। অনেকে খুব ভুল বুঝেছিলেন যে হয়তো এবারও CPM জিতে যাবে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা আমরা পাইনি। আর একটু সাহায্য পেলে আরও ভালো হতো। আমরা শেষপর্যন্ত সিপিএমকে পর্যুদস্ত করতে পারলাম। যা কংগ্রেসের তাবড় নেতারাও ভাবতে পারেননি। তাঁরা রিপোর্ট দিয়ে তাঁদের হাইকম্যান্ডকে বলতেন, দু'তিনটের বেশি আসন জিততে পারবে না তৃণমূল।

২০০৯-এ কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা ভেঙে গেল ২০১০ সালের পুরভোটে। কলকাতা আর শিলিগুড়ি পেল বিরোধীরা। কলকাতায় একা লড়ে প্রায় সেঞ্চুরি করে ফেলল তৃণমূল। শিলিগুড়িতে আমাদের এবং কংগ্রেসের আসন সমান-সমান। কিন্তু তা-ও কংগ্রেস সিপিএমের সমর্থনে বোর্ড গড়ল মেয়র পদটার জন্য! সেই বছরেই হল ১০টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন। আমরা সাতটায় প্রার্থী দিয়ে প্রতিটায় জিতলাম। কংগ্রেস তিনটে আসনে প্রার্থী দিল। হেরে গেল গোয়ালপোখর এবং কালচিনি। জিতল সুজাপুর। দেখলাম, উত্তরবঙ্গেও আমাদের জমি শক্ত হচ্ছে। যে রায়গঞ্জে আমরা ২০০৬-এ হেরেছিলাম ৪৯ হাজারেরও বেশি ব্যবধানে, সেখানে সেই ব্যবধান মুছে দিয়ে ২০১০-এর উপ নির্বাচনে জিতলাম ১৬ হাজার প্লাস ভোটে।

রেলমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলার জন্য একটার পর একটা প্রকল্প এবং সিপিএমের বাধা। মানুষ বুঝলেন। আমরা বুঝলাম, ২০০৯-এর লোকসভা ভোটের চেয়েও আমাদের ব্যবধান বাড়ছে বিভিন্ন আসনে। রাজ্যের উন্নয়নে সিপিএমের বাধা মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, সিপিএম অপরাজেয় নয়। এবং এ বার তাদের যেতে হবে। ২০১০ সালের ৯ আগস্ট জঙ্গলমহলের

লালগড়ে গিয়ে বলে এসেছিলাম, আলোচনায় আসুন। মূলস্রোতে ফিরুন। শান্তি আসুক জঙ্গলমহলে। গেলাম পাহাড়ে। বলে এলাম, রাজ্য ভাগ হবে না। গোর্খাল্যান্ড হবে না। সেই দাবি ছেড়ে আসুন। যা চান, তা-ই দেব।

২০১১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে সারা বাংলায় প্রচার করে বেড়িয়েছি। আমার হেলিকপ্টার গোটা রাজ্যে মোট ১৫৬টা টেক-অফ আর ল্যান্ডিং করেছিল। এখন ভাবলে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। কোথা থেকে অত এনার্জি পেতাম। প্রখর গ্রীষ্মেও কাতারে কাতারে মানুষ আসতেন। তাঁদের মুখে স্পষ্ট দেখতাম পরিবর্তনের প্রতীক্ষা। কংগ্রেস আমাদের সঙ্গে জোট গড়লেও প্রচুর আসনে গোঁজ প্রার্থী দিল। যার ফলে জোটের প্রার্থীরা অন্তত ২৯টা আসনে হেরে গেলেন। তৃণমূল কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গোঁজ দেয়নি কোথাও। বরং কেউ নিজের উদ্যোগে ভোটে দাঁড়িয়ে পড়লে সেই কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে তাকে নির্বাচনী সভামঞ্চে দাঁড়িয়েই দল থেকে বহিষ্কার করে এসেছি!

তার আগে থেকেই সিপিএম হার্মাদবাহিনীর সহায়তায় জঙ্গলমহলের আসনগুলো কব্জা করার চেষ্টায় ছিল। আমরা বারংবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ৭ জানুয়ারি ঘটে গেল নেতাই-কাণ্ড। সিপিএমের কীর্তি লোকসমক্ষে এল। ভোটের সময় এবার অবশ্য নির্বাচন কমিশন অন্যান্য বারের তুলনায় সুষ্ঠু ভোট করানোর প্রতি যত্নবান হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রশাসন যন্ত্রের চেয়েও আমি অনেক অনেক বেশি কৃতিত্ব দিই বাংলার মানুষকে। তাঁরা সাহস করে বেরিয়ে দল বেঁধে একটা ৩৪ বছরের অচলায়তনকে উপড়ে ফেলতে ভোট দিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, সিপিএমকে-ও হারানো যায়! সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল।

বহুদিনের দুর্নীতির পাহাড়, সন্ত্রাসের পারাবার এবং অনুন্নয়নের পথ পেরিয়েই কিন্তু দিনের পর দিন লড়াইয়ের পর এ রাজ্যে এল এক গণতান্ত্রিক সরকার। এবং আসার পর থেকেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম শুরু করল রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে।

দীর্ঘ ৩৪ বছরেরও বেশি এ রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন না-হওয়ায় একটা একপেশে, অগণতান্ত্রিক সরকার রাজত্ব করে এসেছে। সরকারি পদ থেকে বেসরকারি দফতর—সকলেই পরিণত হয়েছিল সিপিএমের দাসানুদাসে। সরকারি অর্থানুকুল্যে দলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শুধুমাত্র সিপিএমের প্রভাব

বাড়াতে কোটি কোটি সরকারি অর্থব্যয় হয়েছে। তার না-আছে কোনো হিসেব। না-আছে কোনো তথ্য। ফাইলের পর ফাইল উধাও! বেতন থেকে শুরু করে ভাতা—না-আছে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য বা বিস্তারিত বিবরণ। সরকারি কোষাগারে খোঁজ নিলে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ বেরিয়ে পড়ছে। বছরের পর বছর কোনো অডিট হয়নি। সরকারি দফতর ছাড়াও অনেক সরকারি নিয়োগ রয়েছে। সেখানে এমন অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে কতজন চাকরি করেন আর তাঁদের কতজনকে কী ভাবে নগদে বেতন দেওয়া হয়েছে, তার কোনো সঠিক হিসেব পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না!

চুন-সুরকি-বালি-মাটি সমস্তই হল প্রাকৃতিক সম্পদ। যা একান্তভাবেই রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। সে সবের সুযোগ নিয়েই সিপিএমের বহু তাবড় বন্ধু তাঁদের কাছের লোককে কোটি কোটি টাকা 'সরকারি সম্পদ' পাইয়ে দিয়েছেন। মৎস্যভেড়ি থেকে শুরু করে জমি—সমস্ত তদন্ত করা গেলে দেখা যাবে অর্থ আমদানি এবং অস্ত্র আমদানির যৌথ উদ্যোগ কী ভাবে এতদিন ধরে এ রাজ্যে হয়ে এসেছে।

সরকারে এসে দেখছি, 'ম্যান-পাওয়ার' নেই। দক্ষ সরকারি অফিসারের অভাব। অভাব সৎ, পরিশ্রমী কর্মচারীরও। পুলিশবাহিনীর আধুনিকীকরণ হয়নি। পুলিশের গাড়িগুলোও এমনকী, মান্ধাতার আমলের। মহাকরণে বসেই শুনলাম, কলকাতা মাউন্টেড পুলিশকে ঘোড়া কেনার টাকাও দেওয়া হয়নি। সাংস্কৃতিক কমিটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি কমিটিতে সাবেক সরকার জাঁকিয়ে দলতন্ত্র করেছে। সরকারি ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছে। ক্ষমতার কোষাগারকে ব্যবহার করেছে দুর্নীতির স্বার্থে। শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রগুলোর প্রাণভোমরা সিপিএমের 'সম্মাননীয় কমরেড'রা। দলীয় কাজ করাটাই যাঁদের সবচেয়ে বড় স্বার্থ। যাঁরা বিবৃতির ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সরকারি হাসপাতালগুলোয় চিকিৎসক-নার্স নিয়োগ করতে হয়।

স্বজনপোষণ করতে করতে, বি-এড কলেজ থেকে শুরু করে পিটিটিআই, জীবনদায়ী ওষুধের বরাত দেওয়া, বিনা-টেন্ডারে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ কেনা, যাতে টাকাটা নিজেদের লোকের মাধ্যমে নিজেদের ঘরেই জমা পড়ে—কত বলব!

সমস্ত সরকারি দফতরেই সিপিএম তৈরি করেছিল কমরেডদের জন্য

ফুল-বিছোন সরণি। যার ফলে কর্মসংস্কৃতি শিকেয় উঠেছিল। উন্নয়নের কাজ না-করে সকলকে ধমকে-চমকে, ভয় দেখিয়ে, নানা অভিযোগে খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে, প্রশাসনকে নীরব করে রেখে দলের ক্যাডারদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সিপিএম হিটলারের কায়দায় 'রেডস্টার অপারেশন' চালিয়ে গিয়েছে বছরের পর বছর। পরিকল্পনা হয়নি। উন্নয়ন হয়নি। বরং হয়েছে দলতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ। শুধু মিথ্যাভাষণ, কুৎসা, অপপ্রচার করে চলে গিয়েছে যুগের পর যুগ। আধুনিক যুগে বসেও শিল্পায়নের নামে চলেছে মিথ্যা প্রচার। অথচ কোথাও 'ই-গভর্নেন্স'টুকুও হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে বছরের পর বছর ক্যাডারদের পেনশন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাতে কেউ বেতন না-পায়, যাতে মানুষের গোচরে কোনো তথ্য না-আসে আর নগদে বেতন দেওয়ার নামে সরকারি কর্মচারীদের বেতনের দোহাই দিয়ে মোটা টাকা আদায় করা হয়েছে। এমন অনেক কর্পোরেশন রয়েছে, যেখানে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই ভূতুড়ে ক্যাডারদের বেতন দিতে কোটি টাকা চলে গিয়েছে। সেখানে সরকারি কর্মচারীদের কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকাও নেই। সে সব কর্পোরেশনের নিজস্ব কোনো আয় নেই। অথচ ক্যাডারকুল পুষতে এই দেউলিয়া সরকারেরও বছরে তিন থেকে চারশো কোটি টাকা খরচ হচ্ছে শুধু তাদের বেতনের ভরতুকিতে। যদিও সেই তালিকা সরকার-অনুমোদিত নয়। বিভিন্ন সরকারি জিনিস কিনতে কিছু ভুয়ো সংস্থাকে নাকি বরাত দেওয়া হত বলে আমার কানে এসেছে। সে সব সংস্থার যদি অস্তিত্বই না-থাকে, তা হলে তাদের দেওয়া অর্থ গেল কোথায়?

নির্বাচনের আগে নাকি একটা অনলাইন লোটো কোম্পানিকে বলা হয়েছিল, ভোটের পর তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। তাই তাদের উপর কর না-বসিয়ে রাজ্য সরকার কয়েকশো কোটি টাকা প্রাপ্য অধিকার জলে দিয়েছে। আর তারা বহাল তবিয়তে এখনও ২৪ ঘণ্টা ধরে বিনে পয়সায় সিপিএম পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে!

'আমার সরকার আমার পাশে'—এই ঢালাও বিজ্ঞাপন করে বাজেট-বহির্ভূত অর্থব্যয় করা হয়েছিল সিপিএমের স্বার্থে। বেশ কয়েক কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয়েছিল। যাতে অন্তত এবছর তথ্য-সংস্কৃতি দফতর কোনো কাজ করতে না-পারে। শুনেছি, ওই সংস্কৃতিপ্রেমী দফতরে গত পাঁচ-ছ'বছর কোনো অডিটও হয়নি!

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বলতে কয়েকটা ইটের ঘর। জেলায় জেলায় চিকিৎসক নেই। নার্স নেই। ওষুধ নেই। পরিকাঠামো নেই। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকে হাসপাতালেরও শয্যাও বাড়ানো হয়নি। বছরে অন্তত ৪০ হাজার শিশুমৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দফতরকে লুটেপুটে খেয়ে এডসের জন্য বরাদ্দ অর্থ, ভেজাল ওষুধ কেলেঙ্কারির আঁতুড়ঘর বানানো হয়েছিল স্বাস্থ্য দফতরকে। যার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল আমাদের রাজ্যের মানুষ। সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এখন চলছে কিছু স্তাবককে দিয়ে ছোট ছোট ঘটনাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচারের আলোয় তুলে-ধরা।

গত সাত-আটমাসে মা-মাটি-মানুষের সরকার কিন্তু অন্তত সাড়ে তিনহাজার শয্যা বাড়িয়েছে হাসপাতালে। সাতটি সদর হাসপাতালকে জেলা হাসপাতালে উন্নীত করেছে। সাতটি নতুন স্বাস্থ্যজেলা তৈরি করেছে। গ্রামীণ হাসপাতালগুলির উন্নতিতে এর মধ্যেই প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। রাজ্যের ১১টি পশ্চাদপদ জেলায় ২৫টি সুপার-ক্রিটিকাল হাসপাতাল এবং অন্য জেলাগুলিতে দু'টি করে নতুন সুপার-ক্রিটিকাল হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি আনুকূল্যে যাতে আরও সুযোগসুবিধা পান গরিব মানুষ, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও সদ্যোজাতদের দেখার জন্য, এমনকী, গর্ভবতী মায়েদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য সরকার ব্যবস্থা করেছে। যা এক কথায়— বৈপ্লবিক!

এ রাজ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক নেই। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে ইতিমধ্যেই একহাজার চিকিৎসক ও নার্স নিয়েছে। সারা দেশের চিকিৎসকদের আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে তাঁরা এসে আমাদের হাসপাতালগুলোয় ভর্তি রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেন। ইতিমধ্যেই নতুন করে চালু হয়েছে ছ'টি শিশুবিভাগ। মা ও শিশুদের জন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু ওই যে, ৩৪ বছরের ঘুণ-ধরা রাজনৈতিক দল এখনই তাদের সমালোচনার দাঁত-নখ দেখাচ্ছে। মিথ্যার আগুন ছড়িয়ে একটা মাত্র সাত-আট মাসের সরকারকে প্রথম দিন থেকেই পুড়িয়ে দিতে চাইছে।

সংস্কৃতি?

৩৪ বছর ধরে শুনে এসেছি বাম সরকারের 'সংস্কৃতি-মনস্কতা'র কথা।

সত্যিই যদি তা হত, তা হলে তো আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হয়ে সমাজের এক অজ্ঞাত-অশিক্ষিত নাগরিক হয়েও রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারতাম, 'দোলাও দোলাও দোলাও আমার হৃদয়'। কিন্তু কী দেখলাম? কবিগুরুর লাইন একটু পাল্টে নিয়ে বলি, 'ভোলাও ভোলাও ভোলাও আমার হৃদয়'।

কোথায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কোথায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল? কোথায় জীবনানন্দ দাশ? কোথায় নেতাজি, শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ? মাতঙ্গিনী হাজরা, শহিদ ক্ষুদিরাম বা প্রফুল্ল চাকী। বা কোথায় উত্তমকুমার, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া দেবী, দেবকী বসু, কিশোরকুমার, শ্যামল মিত্রের মতো বাংলার গর্ব, বাংলার সংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা?

কোথায় ছিল 'বঙ্গবিভূষণ' বা 'বঙ্গসম্মান'? কোথায় ছিল চলচ্চিত্র বা যাত্রার জগৎ? নাটক থেকে সঙ্গীত? কাব্য থেকে কবি? মাত্র দু'তিনজনের চোখ দিয়েই সংস্কৃতির জগতকে দেখা? তাদের পরিচিতির জোরেই অন্যদের পরিচয়? বাহ্! চমৎকার!

সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চাতুরি। কিন্তু কোনো সমাধান নয়। কিছু দলীয় কর্মীকে পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু পাশাপাশিই তাদের আধপেটা খাইয়ে রাখা। যাতে তারা চিরকাল সিপিএমের খোঁটায় বাঁধা থাকে। স্কিম এ—ঘুরে ঘুরে কাজ কর। মাসিক বেতন পাঁচশ টাকা। স্কিম বি—বাড়ি বাড়ি ঘুরে সিপিএমের প্রচার কর। মাসিক বেতন সাতশ টাকা। স্কিম সি—ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াও। বেতন মাসে আটশ টাকা। এ ভাবে হাজারখানেক স্কিম করে রেখে গিয়েছে সিপিএমের সরকার। কারও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পিটিটিআই, প্যারা-টিচার, এমএসকে, এসএসকে, রবীন্দ্রশিক্ষা, সর্বশিক্ষা—চারদিকের এই গোলকধাঁধা জানতেই তো আগামী কয়েকটা বছর কেটে যাবে। বিশদে আলোচনা করতে গেলে কোথাকার জল যে কোথায় গড়াবে, কে জানে! কোনো কূল-কিনারা পাওয়া ভার। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-শিল্প-সংস্কৃতি—সর্বত্রই কেলেঙ্কারির একশেষ। জোর করে জমি নিয়ে নেওয়া, কৃষকেরা যাতে নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করতে পারে, তার জন্য সহজ

কিস্তিতে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা করা, শস্যবিমা, হিমঘর—কোথাও কোনো পরিকল্পনা করেনি। কিন্তু মা-মাটি-মানুষের সরকার মাত্র প্রথম সাতমাসেই কিষান ক্রোডিট কার্ড, শস্যবিমা, ব্লকে ব্লকে কৃষকদের পণ্য বিক্রির নিশ্চয়তার জন্য কিষান মান্ডি করেছে। প্রায় সাড়ে ৩০০ হিমঘর তৈরির ব্যবস্থা করেছে। ধানের দাম যাতে কৃষকরা নিজেরা হাতে পায়, তার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও চেক-এর মাধ্যমে তাদের সেই অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

বেশ কয়েকদিন সিপিএম এবং তাদের দোসর 'সি-পন্থী'রা হঠাৎ করে আন্দোলনের নামে মানুষের কাছে মিথ্যা প্রচার করার চেষ্টা করল।

কী?

না, ধানের দাম বাড়াতে হবে। কংগ্রেস এবং কমরেডদের প্রশ্ন করি, ধানের সহায়কমূল্য ঠিক করে কে? জবাবটাও আমিই দিচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকার। তা হলে দিল্লিতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন না-করে কলকাতার রাস্তায় কেন এই সরকার-বিরোধী নাটুকে জেহাদ? আন্দোলনের পিছনে আসলে রয়েছে অন্য খেলা। সেটা কী জানেন? কিছু ধনধান্য ব্যবসায়ী সমিতি আছে, যেখানে সিপিএম এবং তাদের মার্ক্সবাদী কংগ্রেসের বন্ধুরা রয়েছেন। তাঁরা আগে কৃষকদের থেকে কম দামে তাদের ফসল কিনে নিতেন। সরকারি অর্থও যা চাষিদের পাওয়ার কথা, তার ৪০ শতাংশ চাষিদের দিয়ে বাকিটা নিজেদের পকেটস্থ করতেন। মা মাটি মানুষের সরকার আসার পর কিন্তু ধানের সহায়কমূল্য কৃষকদেরই নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে তাদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে মধ্যস্বত্বভোগীরা পড়েছে মহা বিপদে। তাদের ভাঁড়ারে অর্থের জোগান কম পড়িয়াছে। তাই তারা রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে তাদেরই কিছু এজেন্টকে। অপপ্রচার করতে। আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে ধান-পাটের সহায়কমূল্যবৃদ্ধি করতে বলছে বারবার। কেন্দ্র সেই সিদ্ধান্ত নিলেই আমাদের সরকার সেই স্থিরীকৃত মূল্যেই কৃষকদের থেকে ফসল কিনবে।

দ্বিতীয়ত, ওই যৌথ উদ্যোগীরা কৃষকদের কাছে গিয়ে যৌথ প্রচার করলেন, আমাদের সরকার আসার পর নাকি সারের দাম বেড়ে গিয়েছে। যা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বাম সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ২০১০ সাল থেকেই বেড়ে গিয়েছে সারের দাম। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সারের উপর আগে ভরতুকি দিত। ২০১০ সাল থেকে তারা সেই ভরতুকি তুলে নিয়েছে। ফলে বাজারে ব্যবসায়ীরা

আগের চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি দামে সার বিক্রি করছে। এবং সেটা শুরু হয়েছে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই। বরং আমাদের সরকার সেই সব ব্যবসায়ীদের কালো তালিকাভুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, যারা কেন্দ্রীয় সরকারের ঠিক-করা দামের চেয়ে বেশি মূল্যে সার বিক্রি করত। আসলে বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার যে সার সরবরাহ করে, তার বেশিরভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা। ফলে বেশি দামি। আমাদের সরকার তার প্রতিবাদ করেছে। বলে, আমাদের দেশজ সার দেওয়া হোক। দুর্গাপুরের কারখানা আমরা দ্রুত তৈরির চেষ্টা করছি। যাতে আমাদের কৃষকরা স্বল্পমূল্যে সার পেতে পারে। কৃষিপণ্যে লাভ করার জন্যও এখন থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যে উৎপন্ন আলু বহির্জগতে বিক্রির ব্যবস্থাও তো নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই।

আমাদের যে মা-ভাই-বোনেরা ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করেন, তাঁদের আগে ৯০ কিলো করে ওজন তুলতে হত। কিন্তু দুর্বল শরীরে তা তাঁরা পারেন না। তাই এখন সে ভার লাঘব করে ৬০ কিলো করা হয়েছে। জল-ভরো, জল-ধরো প্রকল্পে ২০ হাজার পুষ্করিণী খননের কাজ নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েছে। এতে কয়েক লক্ষ গ্রামীণ কর্মসংস্থান হবে।

ইতিমধ্যেই প্রায় পৌনে তিনলক্ষ সরকারি কর্মসৃষ্টি, বেসরকারি ক্ষেত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দু'লক্ষের উপর কর্মসৃষ্টির পরিকল্পনা হচ্ছে।

'বেঙ্গল লিড্‌স' শিল্প সম্মেলন, পাহাড়, তরাই-ডুয়ার্স, জঙ্গলমহল, দিঘা-তাজপুর-শঙ্করপুর-মন্দারমণি, সুন্দরবন, গঙ্গাসাগর—তীর্থক্ষেত্র থেকে পর্যটন—সারা বাংলা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। রাজারহাট, হুগলি নদী থেকে মাতলা নদী ঘিরে একরাশ স্বপ্ন যখন পাল তুলছে, তখন সিপিএম ঘাবড়ে গিয়ে তাদের কিছু দোসরকে নিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাস্তায় নেমেয়েছে। 'সিন্ডিকেট' তৈরি করে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে সংবাদমাধ্যম এবং টেলিভিশন চ্যানেলের একাংশ। আগে সাংবাদিকরা সমস্ত জেনেশুনে, খোঁজখবর নিয়ে লিখতেন। আর আজকাল তো 'ব্রেকিং নিউজ'-এর জমানা! সময় নেই। খবরটা ঠিক না ভুল, তা খতিয়ে দেখারও সময় নেই। সঠিক তথ্য না-পেয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই। একটা ছোট দোকানে আগুন লাগলেও 'বড় খবর'। ঠান্ডা পড়লেও। আবার ঠান্ডা কেটে গিয়ে গরম পড়লেও! আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একশ্রেণির ব্যবসায়ী তাদের বেতনভুকদের একাংশকে দিয়ে খুশিমতো

কাজ করাচ্ছে। এই এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর বেশিরভাগের সামনে খবরের কাগজ বা চ্যানেল। আর পিছনে বিবিধ কেলেঙ্কারি।

যাঁরা ৩৪ বছর ধরে মাঝেমধ্যে দু'একটা ঘটনা ছাড়া মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে বাম সরকারের হয়ে গান গেয়ে গিয়েছেন, বাম-জমানায় ৫৫ হাজার মানুষ খুন হয়ে গেলেও মূক-বধির হয়ে ছিলেন, তাঁদের প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এত অত্যাচারের পরেও বাংলার মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদ-শুভেচ্ছা-দোয়ায় রাজ্যে পরিবর্তন আসবে, কখনও ধারণা ছিল? তখন তো মনে হয়েছিল, ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বদলার রাজনীতিতে হাজার হাজার সিপিএম কর্মী খুন হবে। কিন্তু তাঁরা কী দেখলেন? দেখলেন, শান্ত বাংলা। দেখলেন দার্জিলিং থেকে তরাই-ডুয়ার্স শান্ত। নতুন করে প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পেয়েছে জঙ্গলমহল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেতন পাচ্ছেন মাসের পয়লা তারিখে।

মাত্র সাতমাসে সংখ্যালঘুরা প্রায় সাড়ে চারলক্ষ ঋণ ও বৃত্তি পেয়েছেন। সেল্‌ফ হেল্প গ্রুপ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন। সরকারি কর্মচারীরা ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। পুজোর বোনাস দ্বিগুণ হয়েছে। আগে মাসের পর মাস অপেক্ষা করলেও তফসিলি জাতি-উপজাতির সার্টিফিকেট পাওয়া যেত না। এখন কিন্তু তা মেলে বড়জোর একমাসে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বঙ্গবিভূষণ, রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বামীজি, জাতীয় সংগীত জনগণমন-র শতবার্ষিকী থেকে নজরুল ভবন, সিধো-কানহু থেকে বীরসা মুণ্ডা অ্যাকাডেমি, রাজবংশী অ্যাকাডেমি থেকে নাট্য উৎসব—কী হয়নি এই ক'মাসে? নেতাজি থেকে গান্ধীজি, দুর্গোৎসব থেকে বড়দিন, ইংরেজি নববর্ষ থেকে গঙ্গাসাগর। উৎসবের পর উৎসব। নতুন নতুন পুলিশ কমিশনারেট। দুর্গাপুর-আসানসোল-হাওড়া- বারাসত-ব্যারাকপুর—সেই অগ্রগতি জারি আছে।

পরিবর্তন হয়েছিল বলেই তো আজ বাংলা এগোচ্ছে। তাই না বন্ধু? এই অগ্রগতির মধ্যে দিয়েই বাংলা মা আবার জগৎসভায় সেরা আসনটা সসম্মানে নিয়ে নেবে। সবে তো পাঁচমাস। আগামী পাঁচবছরে বাংলায় আবার স্বর্ণযুগ আসবে।

যে যা খুশি ভাবুন। কেউ অপপ্রচার করুন। কেউ কুৎসা করুন। কেউ বা কারা যৌথ চক্রান্ত করুন। লাভ হবে না।

বেঁচে থাকলে আরও বলব পরে। কেন বেঁচে থাকার কথা বলছি? কারণ সেটা বাস্তব। চক্রান্ত তো এখনো চলছে। রাজনৈতিকভাবে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় পেরে না-উঠে যারা চক্রান্ত করে, তাদের কথাও তো ভাবতে হয়। তবে আমার মতো এক অতি সাধারণ ঘরের মেয়ের সে সবে তোয়াক্কা করার কোনো কারণ নেই। মানুষ ভালো থাকুন। তাঁদের যে কথা দিয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশি ইতিমধ্যেই করেছি। আরও করব। যাতে ৩৪ বছরের উন্নয়ন-বিরোধী বাম সরকার মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত না-করতে পারে। সমালোচনাকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু আমি চাই, সঠিক খোঁজ নিয়ে, তথ্য নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা। ইদানীং কিছু ছদ্ম বামপন্থী সক্রিয় হয়েছে ই-মেল এবং ফেসবুকে। মানুষ তাদের চিনে নেবে। তারা হার্মাদবাহিনীর পরামর্শদাদা। কেউ দধীচি, কেউ হাঁচি, কেউ কাশি নাম নিয়েছে। কেউ গণসংগঠনের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। ইন্টারনেটে যাদের ভাষার প্রয়োগ দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়! সমস্ত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন খারাপ, তা আমি মনে করি না। অনেকেই খুব ভালো কাজ করে। তাদের আমি সম্মান করি। ভালোবাসি। কিন্তু যারা মেকি, তাদের খাতায় নাম লিখিয়ে আমার ছাত্র-যুব ভাইবোনেরা দয়া করে কোনো প্রলোভনে পা দেবেন না। নিজেদের ভুল পথে নিয়ে যাবেন না। নেতাজি পড়ুন। বিবেকানন্দ পড়ুন। নজরুল-রবি ঠাকুর-শ্রীরামকৃষ্ণ পড়ুন। সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাবেন। সব দর্শনের আকরের সন্ধান পাবেন। ওঁরা তো আমাদের নিজেদের মানুষ। তাঁদের ফেলে অন্যের দুয়ারের ধূলিকণা আহরণ করতে যাবেন কেন? স্বদেশের ঠাকুর ফেলে কেন পুজো করতে যাবেন বিদেশের কুকুরকে?

বিদেশের কথায় মনে পড়ল। বাংলার দায়িত্ব নেওয়ার পর (শেষবার রেলমন্ত্রী থাকার সময়েও) বিদেশে বক্তৃতা করতে যাওয়ার একাধিক আমন্ত্রণ এসেছে। কিন্তু মাতৃভূমি-ধাত্রীভূমির মানুষের কান্না ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করেনি। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বিলেতে যাওয়ার আমন্ত্রণ রাখতে পারিনি গ্রামবাংলা সিপিএমের অত্যাচারে রক্তাক্ত হওয়ায়। আর পরিবর্তনের পর এখনো যেতে পারিনি সহকর্মীদের নিয়ে ভূতের পরিশ্রম ঘাড়ের উপর এসে পড়ায়। ভুলে-ভরা একটা স্লেট মুছে আবার নতুন লেখা লিখতে হচ্ছে এখন। বিদেশযাত্রার সময় কোথায়?

মনে আছে, প্রথম বিদেশযাত্রা ১৯৮৩ সালে। সুব্রত'দা (মুখোপাধ্যায়) পাঠিয়েছিলেন। আইসিএফটিইউ-এর কনফারেন্সে। তখন আমি আইএলও-র প্রশিক্ষণও নিয়েছিলাম। ফলে আইসিএফটিইউ-এর অনেক আলোচনাচক্রে ক্লাস নেওয়ারও সুযোগ পেয়েছিলাম। সুব্রত'দা আমায় আইএনটিইউসি-র প্রতিনিধি হিসেবে মালয়েশিয়ার কুয়ালা লামপুরে পাঠিয়েছিলেন। সেই কনফারেন্সে যাওয়ার আগে দিল্লিতে আইসিএফটিইউ এবং আইএনটিইউসি-র একটা যৌথ ওয়ার্কশপ হয়েছিল। সেই ওয়ার্কশপে আইএনটিইউসি-র তদানীন্তর সভাপতি রামানুজম সাহেব একটা ক্লাস নিতে গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব করেছিলেন। তাতে ১০০ শতাংশ উত্তর দিয়েছিলাম। আর তখন সুব্রত'দাও আইএনটিইউসি-র সহ-সভাপতি। ফলে আমার নামটা প্রস্তাব হওয়ার পরেই চটপট ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রথম বিদেশযাত্রাটা একেবারে অতর্কিতে হয়েছিল।

প্রথম বিদেশযাত্রার আগে জীবনে কোনোদিন প্লেনেই চড়িনি। তায় আবার প্রথম আকাশযাত্রা শুরুই হল বিদেশযাত্রা দিয়ে। সে যাত্রায় কী বিপত্তি হয়েছিল উদ্যোক্তারা কুয়ালা লামপুর বিমানবন্দরে না-আসায়, তা তো আগেই লিখেছি। বিমানের অ্যারাইভাল-এর সময়টা ভুল করায় ওঁরা যেতে পারেননি। আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করার পর ওঁরা আমায় ঘরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। গা'টা একটু ছমছম করছিল। সারা রাত ভয়ে ভয়েই কেটে গেল।

পরদিন থেকে সেমিনার শুরু। তাইল্যান্ডের একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল সেখানে। ওকেই অনুরোধ করলাম, আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে। মেয়েটা রাজিও হয়ে গেল। সাতদিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তবে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। ওদের খাবারের সঙ্গে আমাদের একেবারেই মিল নেই। ফিরে আসার আগেরদিন একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুঁজে পেয়ে পেট ভরে খেলাম। তার আগের ছ-দিন প্রায় ব্রেড খেয়েই কাটিয়েছি।

কনফারেন্স থেকে প্রস্তাব ছিল, ফেরার পথে যারা সিঙ্গাপুর হয়ে যেতে চায়, তাদের সমস্ত খরচ উদ্যোক্তারা বহন করবে। অন্যান্যরা তাই সিঙ্গাপুরের টিকিট কেটে ফেলল। কিন্তু আমার কাছে তো বিদেশে সাতদিন মানে সাতশো দিনের সমান! তাই আমি কলকাতার টিকিট কেটে ফেললাম। কিন্তু রোজ ডিরেক্ট ফ্লাইট নেই কলকাতার। ফলে আমার একটা দিন ব্যাঙ্ককে থাকতে হবে। উদ্যোক্তারা বললেন, ব্যাঙ্ককের দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারছেন না। সেখানে তাঁরা

কোনো প্রতিনিধির থাকার ব্যবস্থাও করেননি। আমার নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। মহা ফ্যাসাদ।

তাইল্যান্ডের বন্ধুটি বলল, "আমি তো ব্যাঙ্ককেই ফিরব। একটা দিন তুমি আমাদের বড়িতে অতিথি হয়ে থেকে যেও।"

সাতদিনের পরিচিত এক বিদেশি বন্ধুর হাত ধরে তাইল্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। ওর বাবা-মা এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। তাঁরা আমায় মহাযত্নে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পরদিন আবার আমায় এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন। ওদের আতিথেয়তায় এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে, বিদেশের কথা মনে পড়লেই এখনও আমার তাইল্যান্ডের বন্ধুর কথা মনে পড়ে, বহুবার পরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। জানি না এখন তারা কোথায় আছে, কেমন আছে। আমার বিশ্বাস, এই পৃথিবীর পথ পরিক্রমায় কোনো না কোনো প্রান্তে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। দেখা হলে এ বার ও আমার অতিথি হবে। আমার মাতৃভূমিতে।

যুবমানসের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১৯৮৭ সালে ভিয়েতনাম গিয়েছিলাম সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। সঙ্গে গিয়েছিল সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সম্পাদ গণেশ শঙ্কর পাণ্ডে। ছোটবেলা থেকেই ভিয়েতনামের নাম এবং সে দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা শুনেছি। একটা উৎসাহ ছিলই। ওখানে তখন অল্প কয়েকটি হোটেল ছিল। তখন দেশটা গড়ে উঠছে। বিধ্বস্ত পরিস্থিতি থেকে নতুন করে গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। তাই সেখানে বিশাল কোনো নাগরিক পরিষেবা আশা করাই ছিল বাতুলতা। যে হোটেলটায় আমরা ছিলাম, সেটাও নতুন তৈরি। দোকানবাজারও অপর্যাপ্ত। হোটেলের মধ্যেই সভা এবং আহারের বন্দোবস্ত ছিল।

গণেশ খাবার টেবিলে বসার আগে আমায় জানাল, ও নিরামিশাষী। আর আমি আমিষভোজী। আমি বললাম, "এখানে যে সাপের মাংস খাওয়া হয়, সেটা তো আর তুমি খাও না। ফলে তুমিও যা। আমিও তাই। তবে আমার পছন্দসই ডিমটা আমি পাব।" বেশিরভাগ দিনই একটা ডিমসিদ্ধ দু'পিস ব্রেড দিয়ে খেয়ে নিতাম। গণেশ মাখন আর ব্রেড খেতে খেতে ক্লান্ত। আমায় একদিন অসহায়ের মতো বলল, "এখানে কখনো আলুর তরকারি পাওয়া যাবে না? আমি তা হলে সেটা অন্তত ব্রেড দিয়ে খেতে পারতাম।"

আমি লক্ষ করতাম, ওদের মাংস রান্নার পদ্ধতিটা মোটামুটি ঠিকই আছে।

সেই পদ্ধতিতেই যদি ওকে একটু আলুর তরকারি বানিয়ে দেওয়া যায়। ইংরেজি অনুবাদককে দিয়ে কিচেনের লোকদের বোঝালাম, তাদের একজন অতিথি এতদিন ধরে শুধু ব্রেড খাচ্ছে, তখন তার জন্য নিরামিষ কিছু করে দেওয়া যায় না? পরে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমেও ওদের আমাদের খাওয়াদাওয়ার পদ্ধতি কিছুটা বুঝিয়েছিলাম।

আগেরদিন আমার মঙ্গলচণ্ডী ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি 'জয় মঙ্গলবার' করি। সুতরাং, আমার সঙ্গে মুড়ি ছিল। কোনো সমস্যা নেই। তা-ও ভাবলাম, গণেশের দৌলতে অনেকদিন পর একটু আলু খাওয়া যাবে। ভাবতে ভাবতে আমরা দু-জন খাবার টেবিলে গিয়ে বসলাম। গণেশ'জি, উত্তরপ্রদেশের খাঁটি ব্রাহ্মণ, নির্ভেজাল নিরামিশাষী, আমার ভরসায় খেতে বসেছে। মুখখানা হাসি-হাসি। টেবিলে ব্রেড-আলুর তরকারি এল। কিন্তু গণেশ'জির সন্দেহ তখনও পুরোমাত্রায় রয়ে গিয়েছে। তরকারিটা একটা চামচ দিয়ে নেড়ে দেখলাম। বড় বড় আলুর টুকরো আছে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে আবার মুরগির ছোট্ট ছোট্ট হাড় মেশানো। কিন্তু এত কুচি কুচি করে কেটে সেগুলো আলুর সঙ্গে মেশানো যে, মনে হচ্ছে, শাক বা শাকের মূল-টুল হবে। বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শাকসব্জি মিশিয়ে স্যালাড দেওয়া হয়। পরে আবার উল্টেপাল্টে দেখলাম, কচি মুরগির কচি কচি সিদ্ধ-করা সরু সরু হাড়গুলো আরও কুচি কুচি করে আলুর তরকারিতে মেশানো হয়েছে। গণেশকে বললাম, "আমি একটু আসছি।" তারপর অনুবাদককে নিয়ে গিয়ে কিচেনে বললাম, "পই পই করে বোঝালাম, ভারতীয় ভেজিটেরিয়ান বস্তুটা কী। তা সত্ত্বেও তোমরা এ সব করেছ। দেখতে পেলেই তো গণেশজির খাওয়া মাথায় উঠবে! আর খেতে না-পেয়ে ও আমাকেই শাপশাপান্ত করবে!"

খুব অপ্রস্তুত লাগছিল। খাবার টেবিলে বসে ঠিক করলাম, গণেশ'জি যতটা পারে খেয়ে নিক। বুঝতে পারলে তো আমাকেই ধরবে। খেতে যখন শুরু করেইছে, তখন যতটা পারে, মন দিয়ে খেয়ে নিক। গণেশ'জি ততক্ষণে খেতে খেতে কিছু কচি হাড় পেয়েও গিয়েছে। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "মমতা'জি, এগুলো কী?"

নির্বিকার মুখে বললাম, "শাকসব্জি।"

গণেশ'জি কিছু না-বলে খিদের জ্বালায় খেয়ে যেতে লাগল। আমি একজন

ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য জেনেও না-জানার ভান করতে লাগলাম। তারপর আলুর তরকারি খেতে খেতে আরও এক টুকরো হাড় উঠল। গণেশ'জি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ইয়ে ভি শাকাহারি হ্যায়?" বললাম, "আরে ভুখ লগা তো খানা খা লো।" ও আবার খেতে শুরু করল। তারপর একটা বড় সাইজের হাড় উঠল। এ বার কিন্তু আর ধোঁকা দেওয়া গেল না। প্রচণ্ড রেগে বলল, "ইয়ে ভি ভেজ হ্যায়?" তারপর খাওয়া বন্ধই করে দিল।

ওকে বোঝালাম, "আমি অনেক করে কিচেনে বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা বুঝতে না-পারলে কী করব?"

গণেশ'জি বলল, "তা হলে তুমি আগেই জানতে?"

আমি স্বীকার করে নিলাম। ও বলল, আমি কেন জেনেশুনে ওকে আমিষ খাওয়ালাম।

বললাম, "গত কয়েকদিন ধরে তুমি অভুক্ত। আর এটা তো আমার বাড়ি নয় যে, তোমায় কিছু রান্না করে খাওয়াব। বা নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করব। বিদেশে আর কতদিন তুমি না-খেয়ে থাকবে? তার চেয়ে যখন বিদেশে যাবে, এরপর থেকে চিঁড়েমুড়ি বেঁধে নিয়ে যেও। তা হলে আর কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।"

গণেশ'জি ব্যাপারটা বুঝল। বলল, "ইয়ে সুঝাও ঠিক হ্যায়। নেক্সটা টাইম সে অ্যায়সা হি করেঙ্গে।"

বিভিন্ন কনফারেন্সে কয়েকবার রাশিয়াতেও গিয়েছি। একটা জিনিস কিছুতেই মাথায় আসত না। কমিউনিস্ট দেশগুলোয় গেলেই কেন ওরা মোটা চাঁদা নেয়। ওদের তো সব আছে। অভাবও নেই। তবু কেন অতিথিদের থেকে চাঁদা নেওয়া?

প্রথমবার গিয়েছিলাম ইউথ ফেস্টিভ্যালে। তারপর গিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড উইমেন রাউন্ড কনফারেন্সে। আরও একবার এআইসিসি-র তরফে। মহিলা সম্মেলনে যেবার গিয়েছিলাম, সেবার মাত্র দু-ঘণ্টার নোটিসে আমায় প্লেনে উঠতে হয়েছিল। রাশিয়ায় তার আগেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবার রাজীব'জির নির্দেশে আমায় যেতে হয়েছিল। সময় এত কম ছিল যে, ডলার থেকে শুরু করে কিছুই জোগাড় করে উঠতে পারিনি।

অত অল্প সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ডলারে বদলানো। হাতে সময়

নেই। অথচ বিদেশে যাব—মুখ ফুটে এই কথাটা রাজীব'জিকে বলে উঠতে পারিনি। তখন প্রিয়'দা কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী। অগত্যা প্রিয়'দাকে অনুরোধ করলাম, যদি কিছু ডলার জোগাড় করে দিতে পারেন, তা হলে আমি ফিরে এসে টাকাটা শোধ করে দেব। তখন অভিজ্ঞতাও কম ছিল। ফলে ওই অনুরোধটা করা উচিত হয়নি, সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। প্রিয়'দা বললেন, "তুই এয়ারপোর্টে চলে যা।" এয়ারপোর্ট পৌঁছে সিকিউরিটি চেক করে বাইরে গেলে এয়ারপোর্ট থেকেই যে কুড়ি ডলার পাওয়া যেত, সেটা নিয়ে ভাবলাম, নিশ্চয়ই প্রিয়'দার থেকে কেউ আসবে। কেউ যখন এল না, তখন ওই কুড়ি ডলার নিয়েই রাশিয়া পাড়ি দিলাম। ওখানে নেমে শুনলাম, প্রতিনিধিদের ৪০ ডলার করে চাঁদা দিতে হবে। আমার সম্বল তো মাত্র কুড়ি ডলার। কিন্তু চাঁদা ৪০ ডলার! কী করি?

প্রথমেই মাথায় ঢুকল, এই চাঁদার ব্যাপারটাই বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কী করে? অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের বললাম, এই চাঁদার ব্যাপারটাই বড্ড বাজে! প্রতিবার এলেই যদি ৪০ ডলার করে চাঁদা দিতে হয়, তা হলে তো আমাদের প্রাপ্য ডলারের অনেকটাই খরচ হয়ে যাবে! আগে থেকে কেন এটা আমাদের জানানো হয়নি? কেন জানানো হবে না? সকলে একমত হল। হোটেলে যখন আমরা ব্যাপারটা নিয়ে একটা সভা মতো করছি, তখন সেখানে উদ্যোক্তারা চলে এলেন। ইনফর্মাররা গিয়ে খবর দিয়ে দিয়েছে। ওঁরা। বললেন, সভা কীসের? আমরা বললাম, "৪০ ডলার করে চাঁদা দিতে পারব না। আমাদের ব্যাপারটা আগে থেকে জানানো হয়নি কেন? কথায় কথা গড়াল। পরিবেশটা সামান্য উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে উদ্যোক্তারা খানিকটা বোধহয় ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন, রাশিয়ায় একজন ভারতীয় মহিলা সাংসদকে নিয়ে প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিমত হলে সেটা দেশের সম্মানের পক্ষে ভালো হবে না। নিরুপায় হয়ে উদ্যোক্তারা আমাদের দাবি মেনে নিলেন। সকলেই বেজায় খুশি ডলার বেঁচে যাওয়ায়। আমি তো আরও খুশি হলাম।

মনে আছে, আসার আগেরদিন পর্যন্ত ওই কুড়ি ডলার বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম, এ ভাবে মাত্র কুড়ি ডলার সম্বল করে অচেনা-অজানা বিদেশে যাওয়াই ঠিক নয়। এরপরেও বহু দেশে গিয়েছি কোনো না কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে যোগ দিতে। অসুবিধা হয়নি আর। তবে, বিদেশ যেতে আমার বিশেষ

ভালো লাগে না। বড্ড দেশের কথা মনে পড়ে। তাই বিদেশযাত্রার প্রস্তাব এলেই আমি কোনো না কোনো অজুহাতে ব্যাপারটা কাটিয়ে দিই। রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অনেক দেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ আসত। আমি তৎকালীন রেল প্রতিমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিংহকে পাঠিয়ে দিতাম। কমপক্ষে ১০০টা বিদেশযাত্রার আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছি। ভাঁড়ারে টান। তাই সরকারি অর্থব্যয় করতেও গায়ে লাগত। অথচ, অতিথিদের অনুরোধও ফিরিয়ে দেওয়া অনুচিত। তবে অনেক কাটছাঁট করে দিয়েছিলাম।

১৯৯৮ সালে অটল'জি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালী রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশযাত্রাটা অবশ্য আমার বেশ ভালো লেগেছিল। ছোটবেলা থেকেই ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলির কথা বইয়ে পড়ে এসেছি। সেখানে দেশের পক্ষে ভাষণ দিতে যাওয়াটা মস্ত সম্মানের। সেই আমার সর্বশেষ বিদেশযাত্রা। ভারতীয় হাইকমিশনের দফতর থেকে প্রায় পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়, এমনই একটা হোটেলে ছিলাম নিউইয়র্কে। সেখানে বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। দুপুর বা রাতে আমি একটু কমই খাই। তাই সঙ্গে নিয়েছিলাম চিঁড়ে-মুড়ি। তাতেই আমার দিব্যি চলে যেত। একদিন বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা হল। ওঁরা প্রশ্ন করলেন, "খাওয়াদাওয়া ক্যামন হইত্যাসে?" আমি বললাম, চিঁড়ে-মুড়ি খাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করলাম, ওঁদের খাওয়াদাওয়ার অবস্থা কী?

ওঁরা বললেন, "আমরা তো দিনে তিনবার ভাত আর ইলিশ মাছ খাইত্যাসি।"

কিন্তু পাচ্ছেন কোথায়?

ওঁরা বললেন, "আমাগো এখানে অনেক জানাশুনা। সকাল ৭টায় আমাগো খাবার লয়্যা আসে।" আমি কিছু বলার আগেই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা বললেন, "আপনে তো আমাদের হোটেলেই আছেন। কাল সকালে আপনাকে খাবার পাঠাইমু।"

সত্যিই পরদিন ওঁরা আমায় একটি টিফিন-ক্যারিয়ারে করে খাবার পাঠিয়েছিলেন। সেটা রেখে দিয়েছিলাম সযত্নে। রান্নাঘরের ফ্রিজে রেখে, মাইক্রোওয়েভে গরম করে আমার দিন চার-পাঁচ ওই খাবারেই চলে গিয়েছিল। এমনিতে আমেরিকার খাবারদাবার আমাদের সঙ্গে মানানসই। কিন্তু সমস্যা একটাই—একা একা খেতে গিয়ে যে অর্থ খরচ হবে, সেটা গায়ে লাগবে।

রোজ ১০০ ডলার করে হাতখরচা পেতাম। সেটা যদি অন্য কাজে লাগানো যায়, সেই চিন্তা করে ওই টাকাটা আমি বাঁচিয়ে রাখতাম। জীবনে কখনো অযথা বা বেহিসাবি খরচ করিনি। তাই সাতদিনে ইউএস ডলার পেলেও তার থেকে ৩০০ ডলার আমি ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রস সোসাইটিকে দান করে এসেছিলাম।

একদিন তাড়াতাড়ি কনফারেন্স থেকে ফিরে এসে আমি আমার ঘরটা পরিষ্কার করতে করতে রান্নাঘরে একটা সসপ্যান পেয়ে সেটা টয়লেটে রেখে দিয়েছিলাম। ওটা স্নান করা বা জল তোলার জন্য খুব কাজে লাগত। একদিন তাড়াতাড়ি কনফারেন্স শেষ হয়ে যাওয়ায় দুপুরে হোটেলে ফিরে দেখি, এক মহিলা আমার ঘর পরিষ্কার করছেন। আমায় তিনি সসপ্যানটা নিয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না যে, টয়লেটে বালতি বা মগ না-থাকায় সসপ্যানটা আমি জল তোলার কাজে ব্যবহার করি। স্নান করতে কাজে লাগে! কিন্তু মহিলা কিছুতেই বুঝবেন না। আমিও বোঝাতে পারছি না। অগত্যা ওকে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য বললাম, "মাইক্রোওয়েভ-টা কী করে ব্যবহার করে একটু দেখিয়ে দাও তো।" ও আমায় দেখিয়ে দিল। আর আমি খুশি হয়ে ওকে দেশ থেকে নিয়ে-যাওয়া একটা উপহার দিলাম। বেচারা সেটা পেয়ে সসপ্যানের কথা ভুলেই গেল! যে ক'দিন ওখানে ছিলাম, ওর সঙ্গে দেখা হলেই গল্প করতাম।

নিউইয়র্কে বহু প্রবাসী ভারতীয়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। তাঁরা যে কী আন্তরিক ছিলেন, বলে বোঝাতে পারব না।

মনে রাখব এয়ার ইন্ডিয়ার আতিথেয়তার কথাও। আমেরিকা থেকে লন্ডন হয়ে একবার দেশে ফিরছিলাম। প্লেনে সকলেই সুস্বাদু ভারতীয় খাবার খেলেও আমি কিছুই খাইনি। পাইলটের কাছে সম্ভবত সে খবর পৌঁছেছিল। লন্ডনে দু-ঘণ্টার স্টপ-ওভার। তাই সকলে শপিং করতে নেমে গেল। আমি নামিনি। কারণ আগে একবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার সময় লন্ডন, প্যারিস ঘুরে নিয়েছিলাম। বিমানসেবিকাদের বললাম, আমি না-নামলে কোনো অসুবিধা আছে? তাঁরা বললেন, মোটেই না। বরং আমায় চা বানিয়ে দিচ্ছেন। আমি বললাম, "চা বানানোর দরকার নেই। আপনারা তো সবসময়েই পরিশ্রম করেন। বরং আসুন, আমরা বসে একটু গল্প করি।"

গল্প করতে করতে যখন আড্ডা জমে উঠেছে, তখন একজন বললেন,

পাইলট নাকি আমার জন্য লন্ডন থেকে চিংড়ি মাছ তুলতে বলেছেন। কারণ আমি প্রায় কিছুই খাচ্ছিলাম না! আমি তো লজ্জায় একশেষ। কিন্তু প্লেন দিল্লিতে নামার ঘণ্টাখানেক আগে সেই বিমানসেবিকা বললেন, "আমরা তো কিছুক্ষণের মধ্যেই দিল্লি পৌঁছে যাব। অথচ আপনি এক কাপ চা-ও খেলেন না! আর পাইলটের তোলা চিংড়ি মাছেরই বা কী হবে?"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। আমায় একটা দিন। বাকিটা আপনারাই খেয়ে নিন।" ওঁরা কিছুতেই রাজি হবে না। তখন জানালাম, পাইলটের আতিথেয়তাকে সম্মান করার জন্য আমি একটু টুকরো খাচ্ছি। পাইলটকে যেন তাঁরা আমার হয়ে ধন্যবাদ দেন। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, বিদেশে গেলে এয়ার ইন্ডিয়া ছাড়া আর কোনো সংস্থার প্লেনে যাব না। নিউইয়র্কে থাকার সময় আমাদের সাংসদ কৃষ্ণা বসুর ছেলে সুগত আমায় বস্টনে নিয়ে গিয়েছিল। সুগত এখন হার্ভার্ডে আছে। কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষের বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য আমাদের সরকার ওকে 'মেন্টর গ্রুপে'র প্রধান করেছে এখন। বস্টন থেকে সুগত আমায় হার্ভার্ডেও নিয়ে গিয়েছিল। ওখানে 'গ্রাসরুট' রাজনীতির উপর একটা বক্তৃতা দেওয়ারও সুযোগ করে দিয়েছিল।

আমেরিকা, লন্ডন, কানাডায় প্রচুর প্রবাসী ভারতীয় থাকেন। আমি ওখানে গিয়েছি শুনে সকলেই প্রায় তাঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতেন। একদিন ওয়াশিংটন-ভার্জিনিয়া গিয়েছিলাম সুব্রত সমাদ্দারের বাড়ি। তিনি আদতে সোনারপুরের বাসিন্দা। খুব অনুরোধ করেছিলেন। সঙ্গে আবার প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্যোগে একটা মেলারও আয়োজন করা হয়েছিল তখন। গেলাম সুব্রত'দার বাড়ি। ওয়াশিংটন এয়ারপোর্ট থেকে যখন ওঁর ভার্জিনিয়ার বাড়িতে যাচ্ছি, সুব্রত'দা গাড়িতে চালালেন লতা মঙ্গেশকরের গান, 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে ভোরের তারার পানে চেয়ে..'।

* * *

২০১১ সালের ১৩ মে আমার কালীঘাটের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল সেই লাইনটা।

আমার সমালোচকরা সুস্থ থাকুন। শান্তি-উন্নয়নের আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে আমি এখনও তাকিয়ে সেই ভোরের তারার দিকে...।

বাম বিদায়

অনিন্দ্য জানা

হল অবশেষে!

টানা চৌত্রিশ বছরের কমিউনিস্ট-অচলায়তনের অবসান ঘটল পশ্চিমবঙ্গে।

তিনবছর আগে পঞ্চায়েত ভোটের পর রাজ্যে যে 'পরিবর্তনের' ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভা-পুরসভা-বিধানসভা উপনির্বাচন পেরিয়ে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল শুক্রবার। যে মহিলাকে একদা মহাকরণ থেকে চুলের মুঠি ধরে বার করেছিল পুলিশ, তাঁর হাতেই এল মহাকরণের অধিকার। এবং এল কী ভাবে!

সাংগঠনিক দিক দিয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএমকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে! রাজ্য বিধানসভার ২৯৪টি আসনের মধ্যে তৃণমূল-কংগ্রেসের বিরোধী জোট (এসইউসিআইসহ) পেয়েছে ২২৭টি আসন। সিপিএম সহ বামফ্রন্ট টিমটিম করছে ৬২টি আসনে!

কার্যত অবিসংবাদী কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যের এই 'পতনকে' পাশ্চাত্যের সংবাদমাধ্যম তুলনা করেছে ২২ বছর আগের বার্লিন দেওয়ালের পতনের সঙ্গে। আর এ রাজ্যের মানুষ বর্ণনা করেছেন 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলে! রাজ্যের রং যেখানে বদলে গিয়েছে সবুজে। হারিয়ে গিয়েছে সাড়ে তিন দশকের লাল রং। এবং সেই 'বদলের' সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন রাজ্যের সিংহভাগ মানুষ।

আসলে তাঁরা একাত্ম হয়ে গিয়েছেন মমতার সঙ্গে। একলা এক নারী এক বিপুলায়তন জরদ্গাবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন— এই আপাত-অবিশ্বাস্য ঘটনাকে মর্যাদা দিতে চেয়েছে জনতা। নইলে এমন এমন 'অভাবনীয়' আসনে তৃণমূল তথা জোটপ্রার্থীরা জিতেছেন, যা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য। তবুও তাঁরা জিতেছেন। কারণ, জনতা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দেখেনি। তারা প্রতীক

দেখেছে। আরও স্পষ্ট করে বললে, মমতাকে দেখেছে। ফলে সরাসরি ভোটে না-দাঁড়ালেও ফলিত স্তরে বিরোধীদের তরফে ২৯৪টি আসনে প্রার্থী ছিলেন মমতাই!

এই পরিবর্তন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে ছেড়েছে, রাজ্যের ধনী এবং দরিদ্র, নগর এবং গ্রাম— উভয় অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মমতার হাতেই রাজ্যের শাসনভার দিতে চেয়েছেন। মমতাকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেখতে চেয়ে শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে যে 'নেতিবাচক' রায়দানের ধারা পঞ্চায়েত ভোটে শুরু হয়েছিল, তা চূড়ান্ত হল মমতার এই বিপুল জয়ে (মমতা নিজে অবশ্য একে 'ইতিবাচক' রায় বলেই দেখতে চান)। যে ফলাফলে সিপিএম একক শক্তি হিসেবে নেমে গিয়েছে কংগ্রেসেরও নীচে! তৃতীয় স্থানে!

গত লোকসভা ভোটে রাজ্যে মাত্রই ৯৯টি আসনে এগিয়েছিল বামেরা। তারপর গত দু-বছরে এমনকিছু ঘটেনি, যার ফলে তারা সেখান থেকে কোনো 'উন্নতি' করতে পারে। বরং ঘটেছে নেতাইয়ের মতো ঘটনা। দ্বিতীয়ত, এবার নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারিতে নিজের ভোট নিজেরা দিতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ। বিস্ফোরণ ঘটেছে বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে!

বস্তুত, এই বিধানসভা ভোটে রাজ্যে শাসনক্ষমতার যে পরিবর্তন হল, তা যেমন 'ঐতিহাসিক', তেমনই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল যে, রাজ্যে বিরোধী শক্তির মূল চালিকাশক্তি ছিলেন মমতাই। এবং এই জায়গাটাতেই মমতা পিছনে ফেলে দিয়েছেন অতীতে কংগ্রেস-ত্যাগী নেতা ডি কে মুপানর, শরদরাও পওয়ার, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এমনকী প্রণব মুখোপাধ্যায়কেও! যাঁরা কংগ্রেস ছেড়ে সাফল্য পাননি। সেখানে মমতা মাত্র ১৩ বছরের মাথায় তাঁর সমর্থনে কংগ্রেসের সিংহভাগ ভোট 'সুইং' করিয়ে নিয়েছেন। তাঁর উপর ভর করেই লোকসভায় সাফল্য পেয়েছিল কংগ্রেস এবং এসইউসিআই। যে সাফল্য কংগ্রেস পেল বিধানসভা ভোটেও (এসইউসিআইয়ের আসন অবশ্য একটি কমে গেল)। যার ফলে প্রমাণিত হল যে, দলের একাংশের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়েও মমতার শর্ত নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে তাঁর সঙ্গে জোট গড়ে ভুল করেননি বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রণববাবু। তিনি 'বাস্তবতাকে' গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেমন দিয়েছিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীও। যে কারণে এদিনও প্রণববাবু বলেছেন, "অবশেষে এটা প্রমাণ হল যে, জোট গড়ার সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল!"

কয়েকটি জেলায় কংগ্রেস 'সঠিক' জোট না-গড়ায় তিনি যে সামান্য 'ক্ষুণ্ণ', তা গোপন করেননি মমতা। তাঁর কথায়, "আমরা কোথাও কোনো জোট-বিরোধী কাজ করিনি। ওদের আসন আরও বাড়ত। সে ক্ষেত্রে আমি খুশি হতাম।"

কংগ্রেস তো ভালো ফল করেছেই, নজিরবিহীন ফলাফল করেছে তৃণমূলও (মমতা নিজে যাকে আগাগোড়া বলছিলেন 'সুনামি')। বিধানসভা ভোটে প্রধান দুই যুযুধান তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে আসনের ফারাক আসমান-জমিন। মমতার তৃণমূল একাই পেয়েছে ১৮৪টি আসন। আর মমতার সঙ্গে জোট বেঁধে রাজ্যে নজিরবিহীন সাফল্য পেয়েছে কংগ্রেস। তারা পেয়েছে ৪২টি আসন। সেখানে সিপিএম পেয়েছে মাত্র ৪০টি আসন। কংগ্রেসের চেয়েও দু-টি আসন কম! তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৃতীয় স্থানে! পাঁচবছর আগের বিধানসভা ভোটে বামফ্রন্ট পেয়েছিল ২৩৫টি আসন। সিপিএম একাই ছিল ১৭৬। ভূমিশয্যা নিয়েছিল তৃণমূল। সেবার অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের জোট ছিল। বিপুল জয় পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "আমরা ২৩৫। ওরা ৩০। আমাদের কে রুখবে?"

সম্ভবত তখন থেকেই সিপিএম তথা মুখ্যমন্ত্রীর অধোগমন শুরু। যার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল এদিন, যখন যাদবপুরে নিজের কেন্দ্রে রাজনীতির ময়দানে একেবারে আনকোরা মুখ, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব মণীশ গুপ্তের কাছে প্রায় ১৭ হাজার ভোটে হারতে হল তাঁকে। পরাজিত সেনাপতি বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। হেরে গিয়ে তিনি যথেষ্ট 'বিহ্বল'। বলেছেন, "বুঝতে পারিনি!" আর তাঁর দল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক তথা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু মমতাকে আনুষ্ঠানিক অভিনন্দন জানানোর প্রশ্নে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন, "যাঁরা হেরে গিয়েছেন, তাঁদের যেমন সমবেদনা জানানোর নেই, তেমনই যাঁরা জিতেছেন, তাঁদের নিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করারও কিছু নেই!"

জয়ী মমতা অবশ্য যথেষ্ট পরিশীলিতভাবে বলেছেন, তিনি শুধু মানুষের শুভেচ্ছা কামনা করেন। অন্য কারও নয়। আর আপাতত 'তদারকি' মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, "উনি এবং ওঁর পরিবারের প্রতি আমার শুভকামনা রইল। ওঁরা দীর্ঘজীবী হোন। আমি ওঁদের সমর্থন এবং সহযোগিতা

কামনা করি।" এর মধ্যেই মমতাকে একের পর এক ফোন করেছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। কিন্তু পাম অ্যাভিনিউ থেকে কালীঘাটে অভিনন্দনসূচক ফোন যাওয়ার কোনো খবর নেই।

সম্পূর্ণ ফল ঘোষণার জন্য অপেক্ষা না-করেই এদিন দুপুরে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়ে আসেন বুদ্ধবাবু। বেলা ১টা নাগাদ রাজভবনে প্রবেশ করে তাঁর কনভয়। পিছনের গাড়িতে আপ্ত-সহায়ক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তবে অতীতের মতো এদিন বুদ্ধবাবুর আগমনকে ঘিরে পুলিশ এবং সংবাদ-মাধ্যমের প্রতিনিধি ছাড়া পথচারীদের মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। দুপুর ১টার কিছু পরে রাজভবন ছেড়ে যান বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। বুদ্ধবাবুর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে সাংবিধানিক প্রথা মেনে রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁকেই কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন।

তার প্রায় ছ-ঘণ্টা পর রাজভবনে আসেন ভাবী মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু প্রধান ফটকের বাইরেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েন তিনি। সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায় ও বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। উৎসুক পথচারীদের জোড়হাতে নমস্কার করে, ড্রাইভওয়ের নুড়িপাথর হেঁটে পেরিয়েই মমতা ঢোকেন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। পরে তিনি বলেন, "এটা একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার। উনি রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান। জেতার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।" শপথ নেওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয়ে কথা হয়নি বলেই জানিয়েছেন মমতা।

এর আগেও মমতা বহুবার রাজভবনে এসেছেন। বুদ্ধবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতেও তিনি এসেছিলেন একবার। সিঙ্গুর-সমস্যার সমাধানে সেই আলোচনা অবশ্য শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। তবে মমতাকে মহাকরণের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি-আন্দোলনই। সেই পঞ্চায়েত ভোট থেকেই জমি-আন্দোলন মমতাকে তাঁর ঈপ্সিত ফল দিতে শুরু করেছিল। বিধানসভা ভোটে গিয়ে যা পূর্ণতা পেল।

মমতা-ঝড়ে উড়ে গিয়েছেন বুদ্ধবাবু তো বটেই, নিরুপম সেন, অসীম দাশগুপ্ত, গৌতম দেব, অশোক ভট্টাচার্য, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুদর্শন রায়চৌধুরীর মতো মন্ত্রীরাও। জিতেছেন আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, সুশান্ত ঘোষ,

সূর্যকান্ত মিশ্র, আনিসুর রহমানের মতো কতিপয় মন্ত্রী। অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, বিরোধী দলনেতা কে হবেন, তা নিয়েও বিপাকে সিপিএম। এমন বিপর্যয়ের পর শাসক শিবিরে অবশ্যম্ভাবী ময়নাতদন্ত শুরু হয়েছে। যার ফলে শুরু হয়েছে দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপের পালা। সরাসরি বুদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সিপিএমের ডাকাবুকো নেতা আবদুর রেজ্জাক মোল্লা। শরিকরাও তাদের ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছে।

আর মমতা প্রস্তুতি শুরু করেছেন তাঁর জেলা-সফরের। প্রচারে সময়েই তিনি বলেছিলেন, জিতলে আবার আসবেন। এদিনও বলেছেন, "আমি ঝড়কে লড়ে বেঁচে থাকতে চাই। দুর্গম পথ অতিক্রম করে এসেছি। আরও দুর্গম পথ অতিক্রম করে দুর্দান্ত পথে পৌঁছব।"

নব্য বঙ্গে আসলে মমতা-ঝড় শেষ নয়, এই শুরু হল!

[১৪ মে ২০১১, *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত।]

বাধার পাহাড় ভেঙে

কুণাল ঘোষ

দুর্গাপুর থেকে বীরভূম যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিউড়িতে প্রশাসনিক বৈঠক। যাত্রাপথের দু-পাশ জনসমুদ্রে পরিণত। প্রাক-নির্বাচনী প্রচার সফরের থেকেও যেন আবেগ আর স্বতঃস্ফূর্ততা বেশি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে গাড়ি গতি কমাচ্ছে, দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে জনতা। ফুল, করমর্দন, স্লোগান, বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। তার মধ্যেই চিঠি, স্মারকলিপি। গাড়ি এগোচ্ছে। চিঠি খুলে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও অফিসারদের দিচ্ছেন খোঁজ নিতে, কখনও দলীয় নেতাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ব্যবস্থা নেওয়ার। কয়েকটি চিঠি, চিরকুটও বলা যায়, রেখে দিয়েছেন নিজের কাছে।

সেই চিরকুট বেরল একেবারে প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্যে। কৃষক সার পাচ্ছেন না। সারের কালোবাজারি হচ্ছে। জনদরবার থেকে একেবারে টাটকা নালিশ নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কৈফিয়ত তলব মুখ্যমন্ত্রীর। ওই ব্লকের বিডিও কে, কেন আসছে অভিযোগ, কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, জননেত্রী যখন প্রশাসক, তখন এভাবেই তৃণমূলস্তর থেকে মানুষের আর্তি প্রতিফলিত হবে সরকারের বৈঠকে।

সরকার নতুন। মাত্র আট মাসের। আগের ৩৪ বছরের তুলনায় এই সরকারের বয়স কিছুই নয়। সদ্যোজাত। ভালোমন্দ মূল্যায়নের সময়টাই আসেনি। তবু এই অতি-অল্প সময়ের মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিচ্ছেন কেন তিনি আলাদা। আগের সরকারের থেকে কোন কোন জায়গায় তফাত গড়ে তিনি চালাতে চান নতুন সরকার। এই মুহূর্তে নিশ্চিতভাবেই মমতার সামনে কিছু প্লাস পয়েন্ট। এবং অবশ্যই কিছু প্রতিবন্ধকতা, যা অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়াটা মমতার কাছে চ্যালেঞ্জ।

প্রাথমিক ইঙ্গিত বলছে, মমতা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগোচ্ছেন।

হিসাব করলে দেখা যাবে, গত কয়েকটি নির্বাচনে ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলের ভোট বেড়েছে। এমনকী, বিধানসভা ভোটের পরও মমতার সমর্থনে ভোট বাড়ছে তার প্রমাণ উপনির্বাচনের ফলাফলগুলি।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের নিজস্ব ভোট ছিল ৩৭.১৩ শতাংশ। বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৫০.১৮ শতাংশ। তৃণমূল পেয়েছিল ২৬.৬৪ শতাংশ ভোট।

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের ভোট দাঁড়াল ৩৩.১৬ শতাংশ। আর বামফ্রন্টের মিলিতভাবে ৪৩.৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ কমে যাওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। তৃণমূলের ভোট বেড়ে হল ৩১.২৩ শতাংশ।

এবার ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচন। সিপিএমের নিজস্ব ভোট ২৯.৫৮। বামফ্রন্ট এবং সহযোগী মিলে ৪১.০৫। অর্থাৎ সিপিএমের ভোটব্যাঙ্কে ধস চলছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের ভোট বেড়ে দাঁড়াল ৩৮.৯৩ শতাংশ। আর কংগ্রেস সহ জোট ধরলে ৪৮.৪৩।

এর পরেও কিছু উপনির্বাচনকে প্রতীক ধরা যেতে পারে। যেমন ভবানীপুর বিধানসভা এবং বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। ভবানীপুরে ইস্তফা দিলেন সুব্রত বক্সী। লড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিপিএমের ভোট কমল ৭ শতাংশ। আবার বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রটি বিধানসভা নির্বাচনের সময় জিতেছিল সিপিএম। বিধায়ক মুস্তফা বিন কাশেমের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে উপনির্বাচন হল। এখানে এবার তৃণমূল জিতে গেল এবং সিপিএমের ভোট কমল প্রায় ৯ শতাংশ। এরপর দক্ষিণ কলকাতা লোকসভার উপনির্বাচনেও রেকর্ড ভোটে জয় মমতার প্রার্থী সুব্রত বক্সীর এবং সিপিএমের ভরাডুবি।

অর্থাৎ পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে ভোট কিন্তু এখনও বাড়ছে। বিধানসভা ভোটের আগে যে ঊর্ধ্বমুখী জনসমর্থনের প্রবণতা, মমতা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেও একই স্রোত। বিরোধী নেত্রী হিসেবে মানুষ যেমন মমতার পাশে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় মমতার শুরুটা যে মানুষের ভালো লেগেছে, সেটাও কিন্তু উপনির্বাচনের ফলাফলের অঙ্কে পরিষ্কার।

যেমন ২০০৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ভোট পেয়েছিল ২৬.৬৪ শতাংশ। সেবার কংগ্রেস আলাদা লড়েছিল। পেয়েছিল ১৪.৭১ শতাংশ। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোটবদ্ধভাবে লড়েছে। তৃণমূল পেয়েছে ৩১.২৩ শতাংশ। কংগ্রেস ১৩.৪৭ শতাংশ। এতো গেল রাজ্যব্যাপী মোট ভোটের শতাংশ। কিন্তু ক'টি আসনে প্রার্থী দিয়ে কত শতাংশ ভোট পেয়েছে এই আনুপাতিক হিসাবেও তৃণমূল এগিয়ে। তাদের হার ৪৭.৫৭ শতাংশ। কংগ্রেস ৪১.৬৩ শতাংশ। এবার ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের জোট ছিল। তৃণমূল পেয়েছে ৩৮.৯৩ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পেয়েছে ৯.০৫ শতাংশ ভোট। তারও পরে যে বিধানসভা উপনির্বাচন, সেখানে ভবানীপুরে তৃণমূলের ভোট বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। বসিরহাট উত্তরে শুধু ১৫ শতাংশ ভোট বাড়েই নি, সিপিএমের হাত থেকে আসনটি চার মাসের মধ্যে ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। আর দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা উপনির্বাচনেও বিপুল জয় মমতার প্রার্থীর।

এখানেই আলোচনা, মুখ্যমন্ত্রীর প্লাস পয়েন্টগুলি কী কী।

(১) জননেত্রীর ভূমিকা। নিজস্ব এক নজিরবিহীন স্টাইলে জনসংযোগ। মেশার ক্ষমতা। মন বোঝার ক্ষমতা। প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানেই যান, অবাক হয়ে দেখেছি একটা বড় ভিড় দাঁড়ালে তার থেকে দু-চারজনকে নিশ্চিন্তে নাম ধরে ডেকে বসেন। একবার কথা হলে মনে রাখেন। ফলে ব্লকভিত্তিক একেবারে ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক তৈরি। দল বা সরকার-নির্ভর মুখ্যমন্ত্রী নন, এই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি জনগণের মুখ্যমন্ত্রী। এটা মানুষ বিশ্বাস করেন। জীবনযাত্রা থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে লড়াইয়ের সঙ্গী, মানুষ মমতাকে নিজের লোক ভাবেন।

(২) মমতা তৃণমূলের নেত্রী। কিন্তু তিনি দলীয় গণ্ডির বাইরের মানুষেরও ঢালাও সমর্থন পাচ্ছেন। সেইখানেই দেখা যাচ্ছে বাড়তি ভোট টানছে তৃণমূল। হয়তো অন্য দলের সমর্থক, কিংবা নির্দিষ্ট কোনো দলের সমর্থক নন, এমন মানুষও শুধুমাত্র মমতার টানে ভোট দিয়ে দিচ্ছেন। বিরোধী শিবির থেকেও এই সমর্থনটা আসছে। বামপন্থীরা কংগ্রেসকে বুর্জোয়া শ্রেণির দল বলেন। সেই কংগ্রেসের গর্ভগৃহ থেকে উঠে আসা মমতাকে আজ বামপন্থীদের পতাকাবাহী বলে স্যালুট করছেন জমি আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গরিব মানুষের লড়াইয়ের স্রোতে শামিল হওয়া লালঝাণ্ডাধারীরা।

(৩) দীর্ঘদিন বিরোধী রাজনীতিতে থাকা, মাঠে নেমে আন্দোলন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কর্মসূচি—এ সবের নিট ফল হল মমতা রাজ্যটাকে চেনেন হাতের তালুর মতো। দু'টি উদাহরণ দিই : (ক) সেই ১৯৯৩ সালে জনসংযোগ যাত্রায় বেরিয়ে জঙ্গলমহলের ভয়ঙ্কর দুর্দশা দেখেছিলেন, এবং উন্নয়ন না হলে বিপদের গন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম বই 'উপলব্ধি'-তে। সেই মমতা যদি এখন জঙ্গলমহলের উন্নয়নে হাত দেন, তা হলে অনেকের থেকে বেশি তিনি সমস্যাটাকে চিনে সমাধানের ওষুধ দেবেন, এটা বলাই বাহুল্য। (খ) এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লিতে নিজের ফ্ল্যাটের বসার ঘরে মমতা। পাশে অমিত মিত্র। ফিকি-র প্রাক্তন মহাসচিব তখনও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসছেন বা প্রার্থী হচ্ছেন বলে সিদ্ধান্ত হয়নি। তখন চলছে ইস্তাহারের খসড়া তৈরির পালা। পশ্চিমবঙ্গকে পুনরুজ্জীবনে রূপরেখা পেশ করবে তৃণমূল। একপ্রস্থ আলোচনা শেষে খসড়া নিয়ে এসেছেন অমিতবাবু জেলাভিত্তিক শিল্প, অর্থনীতির নানা তথ্য-পরিসংখ্যান। কিছুক্ষণ পর ছবিটা দাঁড়াল এইরকম, মমতা ছাদের দিকে তাকিয়ে মুখস্থের মতো জেলা ধরে ধরে কোন শিল্প ছিল, কী হাল, সেখানে কী কৃষিসম্পদ আছে, খনিজসম্পদ আছে, কোন শিল্প হতে পারে, রুগ্‌ণ শিল্প কীভাবে চাঙ্গা হতে পারে, নতুন শিল্প কোন পরিকল্পনায় আসতে পারে, অধ্যাপিকার মতো বুঝিয়ে চলেছেন অমিতবাবুকে। দ্রুতগতিতে নোট নিতে নিতে মাঝে মধ্যে বিস্মিত চোখে তাকাচ্ছেন অমিত, এভাবে কেউ রাজ্যটাকে চিনতে পারে! আজ, এখন মুখ্যমন্ত্রিত্বে বসে এটাই মমতার প্লাস পয়েন্ট। অন্য কারও তৈরি করে দেওয়া রিপোর্টের উপর দাঁড়িয়ে তাঁকে সমস্যার ভিতটা চিনতে হচ্ছে না।

(৪) দিনরাত সময় দিচ্ছেন, খাটছেন। কোনো পিছুটানের বালাই নেই। বাংলা ২৪×৭ মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে। পাল্লা দিতে বাকিরা নাজেহাল। নিজে বিষয়টা দেখতে চাইছেন, কথা বলছেন, ছুটে যাচ্ছেন। এমনকী, মহাকরণকে মিনি মহাকরণের অধিবেশনে পরিণত করে জেলায় জেলায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। এই কাজের তাগিদ, সদিচ্ছা আর গতিটা মানুষ দেখতে পাচ্ছেন। সময় নষ্ট করার কোনো প্রশ্ন নেই। যেমন ভাবা তেমন কাজ।

(৫) মমতা দলতন্ত্র তুলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্লোগানকে পুলিশ-প্রশাসনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। বিভিন্ন এলাকায় পুলিশকর্তাদের বলতে শোনা

যাচ্ছে স্পষ্ট নির্দেশ আছে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার। এমনকী, কোনো তৃণমূল নেতাও যদি অন্যায় আবদার করেন, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে। ফলে পুলিশ প্রশাসনে খানিকটা রাজনীতি মুক্তির হাওয়া লাগতে শুরু করেছে। এর সুফল পুরোপুরি একদিনে মেলা সম্ভব নয়। কিন্তু শুরুটা হয়েছে।

(৬) বিরোধী রাজনীতির পাশাপাশি মমতা দীর্ঘদিন প্রশাসনিক গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রে দু-দু'বার রেলমন্ত্রকের মতো সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। অন্য দফতরও সামলেছেন। ফলে প্রশাসন সামলানো, উন্নয়ন, নতুন পরিকল্পনা, এগুলোর ক্ষেত্রেও সাফল্যের ছাপ রেখেছেন। সেই অভিজ্ঞতা এখন তাঁর বিরাট ভাণ্ডার। মমতা নিজে কাজ করতে জানেন। কাজ করিয়েও নিতে জানেন।

(৭) এত কম বয়স থেকে এত উচ্চমার্গে রাজনীতি করেছেন মমতা, জাতীয়স্তরের বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁকে চেনেন। কেউ স্নেহ করেন, কেউ ভালোবাসেন, কেউ সমীহ করেন, আবার কেউ ঈর্ষা করেন। কিন্তু সব মিলিয়ে মমতা গুরুত্ব পান এবং প্রতি ক্ষেত্রেই নরমে-গরমে একটা সমীকরণ কাজ করে। রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় রাজনীতির চালচিত্রটা পিছনে রাখা এক অদৃশ্য চৌম্বকীয় শক্তির ভরকেন্দ্র। আজকের এই দুর্নীতিমাখা রাজনীতিতে মমতা সৎ, স্বচ্ছ ইমেজের এবং গদিতে বসে এখনও প্রতিবাদী ভূমিকায়।

(৮) মমতার নিজস্ব কিছু অদ্ভুত স্টাইল আছে। যাতে অবলীলায় তিনি কিছু নতুন পরিকল্পনা করে ফেলতে পারেন। মানুষ যাতে খুশি হন। সব সময়ে সেটা ট্র্যাডিশনাল পথ নাও হতে পারে। কিন্তু সাহসী মমতাকে মানুষ পছন্দ করেন। মমতা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। তাঁর এই নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

যদি কোনো কাজকে তিনি ঠিক মনে করেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে করার ক্ষমতা রাখেন। এমন কিছু স্কিম, এমন কিছু কাজ হঠাৎ হঠাৎ তিনি বলে বসছেন, যাতে মানুষের উপকার হচ্ছে, আবার মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্ভাবনী ক্ষমতায় অবাক হয়ে যাচ্ছেন সিনিয়র নেতারা আমলারাও।

(৯) মমতার সম্পদ তাঁর আবেগ এবং জেদ। এই মুহূর্তে এটা একটা বিরাট ফ্যাক্টর। কারণ, এই মুহূর্তে তাঁর সামনে যা যা প্রতিবন্ধকতা, সেগুলিকে অতিক্রম

করে কাজ করার প্রশ্নে এই দু'টি অস্ত্র তাঁর সেরা তুরুপের তাস। এমন এমন পরিস্থিতি আছে যাতে অন্য কোনো ব্যক্তি হলে বিভ্রান্ত হয়ে যেতেন। সেখানে জীবনের বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আকাশ স্পর্শ করা মমতা আত্মবিশ্বাসী। মাথা খাটান। কোনো না কোনো ফর্মুলা বের করে এগিয়ে চলেন। হাসেন। মেশেন। আবার তার মধ্যেই এক প্রবল ব্যক্তিত্ব। অনেক তাবড় প্রতিপক্ষ পিছনে বিস্তর সমালোচনা করেন। আবার মমতা যখন সামনাসামনি আলোচনায় বসেন, সেই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতে হয় জাঁদরেল রাজনৈতিক নেতাদেরও।

(১০) মমতার মন্ত্রিসভা তাঁর বড় প্লাস পয়েন্ট। দুরন্ত পরিকল্পনায় সাজিয়েছেন। দক্ষ সিনিয়ররা রয়েছেন, সমাজের অন্য জগৎ থেকে আসা সফলরা রয়েছেন, প্রাক্তন মুখ্যসচিবের মতো অভিজ্ঞরা রয়েছেন। আর রয়েছেন মমতার নিজের হাতে তৈরি করা রাজ্যের পরবর্তী প্রজন্মের একঝাঁক গতিশীল মুখ, নেত্রীর জন্য যাঁরা জান কবুল। এখানে বলব আর একটা বড় প্লাস, সংখ্যাতত্ত্বে এই সরকারের নিরঙ্কুশ স্থিতিশীলতা। জোট গড়ে লড়ে কেন্দ্রে কংগ্রেস একা সরকার গড়তে পারেনি। কিন্তু জোটে লড়েও তৃণমূল রাজ্যে একাই সরকার চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। আজকের জোট যুগে এই অঙ্কটাই মুখ্যমন্ত্রীর বড় আত্মবিশ্বাসের জায়গা। আর এখানে আরও বলব, শুধু মন্ত্রিসভা দেখবেন না, দেখুন 'টিম মমতা'। দল, সংগঠন, দলের বাইরের বৃত্ত, বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিত, সবমিলিয়ে মমতা একটি চমৎকার কার্যকরী 'টিম' তৈরি করে ফেলছেন। এটা অনেকটা নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানের মধ্যে যেন বিবিধের মাঝে দেখা মিলন মহান। মমতাকে কেন্দ্র করে একটি টিম। আমার ধারণা, যথেষ্ট ঠান্ডা মাথায় এই টিমকে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য সাজিয়ে রাখেন মমতা।

আর এই সূত্রেই আলোচনা করা দরকার এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সামনের বিপদগুলি কী কী। বাধাই বা কী কী। বাধা (১) তীব্র অর্থসঙ্কট। সাধ আছে, সাধ্য নেই। যতটা ভাবছেন, করতে পারছেন না। (২) রাজের কর্মসংস্কৃতি বেহাল। (৩) বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যে পরিকাঠামো ধ্বংস, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে পড়া। (৪) আগের সরকারের ৩৪ বছর, এই সরকার মাত্র সাড়ে সাত মাস। কাজ করতে হচ্ছে যে ব্যবস্থায় তাতে বিভিন্ন পদে যাঁরা সরকারের দায়িত্বে, তাঁরা আগের সরকারের বসানো। আগের সরকারের

আমলের স্রোতস্পর্শে অভ্যস্ত। সেখান থেকে আবার এই কাঠামোর সঙ্গে একটা মানসিক সেতুবন্ধন করে কাজে নামানোটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। (৫) কেন্দ্রের তরফ থেকে পূর্ণ আর্থিক সহযোগিতার ইঙ্গিত নেই। (৬) জোট শরিক কংগ্রেস মাঝেমধ্যেই উল্টো সুর গেয়ে শিরোনামে এসে অস্বস্তি বাড়াবে। (৭) বিরোধী দলের নাম সিপিএম। সিপিএম ভোটে হারতে পারে, দুর্বল হতে পারে, কিন্তু ন্যূনতম একটা সংগঠন এবং তার চেয়েও বিপজ্জনক সমাজের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শাখা সংগঠন এবং গণসংগঠন নিয়ে তারা এখনও উপস্থিত। সরকারে থাকাকালীন দায়িত্বশীল থাকতে হত। এখন স্বাভাবিকভাবেই সিপিএমের কাজ সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলা। (৮) আর একটি সমস্যা রয়েছে। ক্ষমতায় আসায় তৃণমূল পরিবারটি অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। ভোটের আগেও যাঁরা প্রকাশ্যে মমতাকে সমর্থন করেননি, সমাজের এরকম নানা শ্রেণি এখন তৃণমূলের মিছিলে হাঁটতে গর্বিত বোধ করেন। দল বাড়াতে গেলে এটা স্বাভাবিক। গণ্ডি বাড়াতে গেলে এটা করতেই হবে। আবার এই সমাজের সর্বস্তর থেকে আসা মমতার এই বিলম্বিত গুণমুগ্ধদের অনুপ্রবেশে বিভিন্ন জায়গায় সামান্য অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। পরিবারের অভিভাবক হিসাবে এটা মমতাকে সামলাতে হচ্ছে। এই কাজটি কিন্তু চলতেই থাকবে। (৯) মমতা ক্ষমতার ঔদ্ধত্য দেখাতে চান না। নেত্রীর এই বার্তাটি মানতে হবে তৃণমূলের সর্বস্তরের কর্মীদের। এখনও পর্যন্ত মোটের উপর কর্মী-সমর্থকদের এক দারুণ সংযম এবং সৌজন্যের মোড়কে রেখেছেন মমতা। নিয়ন্ত্রণও দেখাচ্ছেন। জেলাওয়ারি সর্বস্তরের নেতা এবং কর্মীদের আগামিদিনগুলিতেও মনে রাখা দরকার যে, তাঁদের কোনো আচরণে যেন নেত্রীর ইমেজ এবং বার্তার ক্ষতি না হয়। অনেক কষ্টে তিনি নিজের এবং দলের এক ব্যতিক্রমী ভাবমূর্তি তৈরি করেছেন। তাঁর পতাকা যাঁরা বহন করবেন তাঁদের নেত্রীর এই লড়াইটার কথা মনে রাখতেই হবে। ঠান্ডা মাথায় তৃণমূল চললে, লম্বা দৌড়ে সাফল্য কেউ ঠেকাতে পারবে না। (১০) আমাদের যা কাঠামো, অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, তাতে কিছু না কিছু ঘটনা চলতেই থাকবে। সেটা কৃষি, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা, শিক্ষা যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে। এই ঘটনাগুলি ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সেই ঘটনার কারণ হয়তো লুকিয়ে ৩৪ বছরের চিত্রনাট্যে, ফলাফল বিচ্ছিন্নভাবে এখন। ঘটনা ঘটলে, খবর হবে। আলোচনা হবে। বিরোধীরা বড়

করে দেখানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ইস্যুগুলি দিয়ে সাধারণ মানুষ সদ্যোজাত সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর মূল্যায়ন করবেন না। তবে ধরে রাখা ভালো, অস্বস্তিকর কিছু প্রচার হচ্ছে, হবে, স্বাভাবিক। সরকারকে লক্ষ রাখতে হবে। যেখানে দরকার সেখানে যথাযথ ব্যবস্থা। আর কোথাও সচেতন উপেক্ষা। প্রতিক্রিয়ার থেকে বেশি দরকার পরিস্থিতির যথাযথ মূল্যায়ন এবং মোকাবিলা। মানুষ সঠিকটা বুঝে নেবেন।

ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যা পরিস্থিতি তাতে মূখ্যমন্ত্রী মমতার যা ইমেজ, ওজন ও জনপ্রিয়তা তাতে বাধার ফ্যাক্টরগুলিকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। লক্ষ রাখতে হবে শুধু এই এগনোর যাত্রাপথে উপেক্ষিত কোনো সমস্যার বীজ পোঁতা থাকছে কি না। যদি থাকে, বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু নজরের মধ্যে রাখতেই হবে, সতর্ক থাকতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন মমতা। অনেক পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক কিশোরীর এই বেনজির উত্তরণ। নিজের চেষ্টায়, একার লড়াইতে। মমতা আজ নিজেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত। নিজেকে করে তুলেছেন মানুষের কাছে আদর্শ, নতুন প্রজন্মের কাছে 'আইডল'। গোটা দেশে বিস্ময়। গোটা বিশ্বে কৌতূহলের কেন্দ্র।

এর মধ্যেই তৃণমূল দলটাকে সংগঠিত চেহারা দিচ্ছেন মমতা। নিজের ম্যাজিকের জনসমুদ্রকে কী এক জাদুকৌশলে সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠনে রূপান্তরিত করেছেন নেত্রী।

নিজের ইমেজ দলীয় বৃত্তের ঊর্ধ্বে। অথচ জনপ্রিয়তা প্রতিফলিত দলীয় সংগঠনে। এটা বড় কম কথা নয়। বস্তুত, একদিকে তৃণমূল যেমন ক্রমশ একটি বড় দলের চেহারা নিয়েছে, রাজ্যের গণ্ডি টপকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক, পা রেখেছে ভিন রাজ্যে। আবার ঠিক উল্টোদিকে মমতা একাই যেন এক অলিখিত মহাজোটের প্রতীক। ভোটের অনেক আগে থেকে, জমি বা অন্যান্য ইস্যুতে আন্দোলনের সময় থেকেই এক অদৃশ্য চৌম্বকীয় আকর্ষণে বিস্ময়কর মহাজোট। কাগজে-কলমে রাজনৈতিক দলের জোটের বাইরে যেন সমাজের সর্বস্তরীয় মানুষের মহাজোট। এই মহাজোট কিন্তু এখনও বহাল।

তৃণমূল মানে কী?' তৃণমূল মানে মমতা এবং মানুষ। মাঝামাঝি জায়গায়

অবশ্যই দল বা সংগঠনটি আছে। কিন্তু তৃণমূলের এই ঝড়ো সাফল্যের পিছনে মানুষের এক অলিখিত মহাজোট কাজ করেছে বলে আমার স্থির বিশ্বাস। যে কারণে আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল অন্তত এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যদি আনুষ্ঠানিক জোটে নাও আসত, তাহলেও এই ফলাফলটিই কমবেশি হত।

এই মহাজোটে কারা ছিলেন বা আছেন?

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবর্তনপন্থীদের কাছে তিনিই প্রতীক। তাঁকে ঘিরেই যাবতীয় আশাভরসা, স্বপ্ন। পরিবর্তনপন্থী এই ট্রেনে ইঞ্জিন একমেবাদ্বিতীয়ম মমতা। তিনি ছাড়া পরিবর্তন হত না। তাঁকে ঘিরে যে বৃত্ত, যে জনসমর্থন, তার বিশ্লেষণ বহুমুখী।

(ক) দল দিয়ে ভাবুন। মমতা, সেই সঙ্গে তৃণমূল। কংগ্রেস। এসইউসি। এর সঙ্গে ধরুন সিপিএম এবং বামফ্রন্টের একটা বিরাট অংশ, যাঁরা নিজেদের সরকার এবং নেতৃত্বের কাজকর্মে বিরক্ত হয়ে ভোট দিয়েছেন পরিবর্তনের পক্ষে। সেই সঙ্গে বামফ্রন্ট বহির্ভূত কিছু বামশক্তি। সেই সঙ্গে আরও কিছু ছোট শক্তি যাদের সমর্থকরা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি এবং নেতৃত্ব পাননি। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল নাগরিক সমাজ এবং তাদের সূত্র ধরে সমাজের সাধারণ মানুষের একটা বড় পরিবর্তনকামী ইচ্ছা। এই গোটাটা মিলিয়ে মানুষের মহাজোট।

(খ) শ্রেণি দিয়ে ভাবুন। সিপিএমের ভোটব্যাঙ্ক কৃষক বা প্রবীণ মানুষ। কিংবা শ্রমজীবী শ্রমিক শ্রেণি। কিংবা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। কিংবা দীর্ঘদিন বঞ্চিত সংখ্যালঘু সমাজ। এ ধরনের বিভিন্ন শাখার তীক্ষ্ণ প্রত্যাখ্যান সিপিএমকে এবং অনেক স্বপ্ন নিয়ে সমর্থন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফলে যে শ্রেণি লড়াইয়ের পতাকা একসময় সিপিএমের হাতে ছিল, সেই নির্বাচন এবং এই সময় প্রমাণ করে দিয়েছে সেই পতাকা এখন মমতার হাতে দেখতে চান মানুষ।

(গ) আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের আশায় সমীকরণ এবং ভোটব্যাঙ্ক। সেটা জঙ্গলমহল হোক কিংবা পাহাড়। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন নানা যন্ত্রণার শিকার। এই জায়গা থেকে সেখানকার আবালবৃদ্ধবনিতা পূর্ণ ভরসা রাখসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি।

ফলে, রাজনৈতিক দলের গণ্ডিবিন্যাসে দেখুন, কিংবা শ্রেণিবিন্যাসে, কিংবা আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের আবেগে বা এ ধরনের আরও বেশ কিছু

মাপকাঠিতে, দেখা যাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে এক বৃহত্তর মহাজোট এ রাজ্যে তৈরি হয়েছিল এবং এখনও তা বহাল রয়েছে। মানুষ সমর্থন দিয়েছেন তৃণমূলকে হৃদয় উজাড় করে। এই বাতাবরণটাই রাজ্যে চলছে। রাতারাতি পরিস্থিতি বদলের কোনো কারণ নেই।

এখানে একটা কথা বলব। সকলের ভালো নাও লাগতে পারে। কাউকে আঘাত করার জন্য লিখছি না। যদি কেউ দুঃখ পান, আগাম ক্ষমা চাইছি। এই যে মানুষের মহাজোট, নানা স্রোত থেকে মমতার পাশে সমর্থন, এখানে মাঝেমধ্যে কারোর কারোর হয়তো মনে হয়, তাঁরা সমর্থন করেছেন বলেই পরিবর্তন এসেছে। আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে। দেখুন, আন্দোলনে সবার ভূমিকা আছে, এটা ঠিক। আবার কাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন, নেতৃত্বে কে, সেটাও কিন্তু বড় বিচার্য। অনেকে পরিবর্তনের আন্দোলনে এসেছেন, এই সেদিন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঘটনার পর। অনেকে প্রতিবাদী হয়েছেন তখন, যখন এই ধারণাটা আস্তে আস্তে গভীর হচ্ছে যে সিপিএমকে হারানো যায়। আমি বলব, এই ধারণাটা একদিনে হয়নি। তিন-চার বছরেও হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার মানুষের পাশে থেকেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বারবার লড়াই করেছেন। একাধিকবার মমতার লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নানা জটিল চিত্রনাট্য, রাজনৈতিক চক্রান্ত, মুখোশের আড়ালে চেনা-অচেনা মুখের খেলা, নির্বাচনী ব্যবস্থা—এ সব বিভিন্ন ফ্যাক্টরে প্রতিবাদী জনসমুদ্রে গর্জনটা ভোটের বাক্সে সত্যিকারের চেহারায় হয়তো প্রতিফলিত হতে পারেনি। কিন্তু আজ যে পরিবর্তন হয়েছে, তার ভিত্তিটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তৈরি করেছেন বহুদিন ধরে, বহু বছর ধরে। কংগ্রেসের ভেতরে থেকে। পরবর্তীকালে এই লড়াইটা স্বাধীনভাবে চালানোর নেশায় তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দিয়ে। তাই যখন দেখি কোনো কোনো বিশিষ্ট মানুষ কোনো ব্যতিক্রমী কথা বলছেন, মমতার পাশে থেকেও অযৌক্তিক প্রচারমুখী কথা বলছেন, এমন ভাব করছেন যেন পরিবর্তনে তাঁরা অন্যতম কান্ডারি, আমি বলব, নিশ্চয়ই তাঁরা আন্দোলনে ছিলেন এবং আছেন, কিন্তু পরিবর্তনের লড়াইয়ের কৃতিত্বটি কিন্তু মমতারই। অনেকদিন সুযোগ পেয়েও তাবড় কংগ্রেস নেতারা পারেননি সিপিএমকে সরাতে। বুদ্ধিজীবী নাগরিকরা বামজমানার একটা বিরাট সময়ে কোনো সন্ত্রাস, কোনো অপকীর্তির প্রকাশ্য

প্রতিবাদ করেননি। আগে এত মিডিয়াও ছিল না যে রেলের টিফিন কেরিয়ারে আরশোলার ছানা ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকিং নিউজ হবে। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বাধার পাহাড় ভেঙে লড়াইটা চালিয়ে গিয়েছেন কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম মমতা।

প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব পরিস্থিতি যদি বিচার করেন, তাহলে বলা ভালো এবারের বিধানসভা নির্বাচনের রায়টা পাঁচ বছরের নয়। সার্বিক বৃত্তটিতে বিভিন্ন ইস্যু, সাংগঠনিক অবস্থা, জনমত যেভাবে প্রতিফলিত, তাতে রায় যেন দশ বছরের রায়। এইখানে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য।

(১) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনমুখী সরকার চালিয়ে বাংলায় গ্রহণযোগ্যতা, সমর্থন আরও নিবিড় করা। ভোটব্যাঙ্ক আরও বাড়ানো। (২) সাংগঠনিকভাবে তৃণমূলকে আরও মজবুত করা। যাতে ভবিষ্যতে একক শক্তি হিসাবে যে কোনো সন্ধিক্ষণে যে কোনো স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তী অঙ্কে পা ফেলতে পারে। (৩) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নিজেদের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা এতটাই বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে এই জোট রাজনীতির যুগে কেন্দ্রের এখনকার সরকার কিংবা পরবর্তী লোকসভা ভোটের মাধ্যমে যে সরকার হবে, সেখানে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকতে পারে। (৪) পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে বিপুল সাফল্য পেতে হবে। জেলা পরিষদ অধিকাংশ যদি তৃণমূলের দখলে আসে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাজে আরও সুবিধা হবে। না হলে রাজনৈতিক এবং উন্নয়ন, দু'দিকেই সমস্যা থাকবে। (৫) তৃণমূলকে এই মুহূর্তে নানা ধরনের চক্রান্তের সামনে পড়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে। প্রতিপক্ষরা নানা প্রচারের বেড়াজাল তৈরি করবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। মিডিয়াজগতেও নানা চোরাস্রোত কাজ করবে। নানা অঙ্কে আসবে নানা পরিস্থিতি। যে কোনো শত্রুশিবির যে কোনো অন্তর্ঘাতমূলক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। অপপ্রচার করতে পারে। কুৎসা করতে পারে। মিথ্যা আক্রমণ চালাতে পারে। এসব ধরে নিয়েই মোকাবিলার রণকৌশল রাখতে হবে। মনে রাখবেন, যারা তৃণমূলের শত্রুপক্ষ, তারা কিন্তু নবজাতক সন্তান বলে নতুন সরকার সম্পর্কে বাস্তবমুখী মনোভাব নেবে না। বরং নবজাতক বলেই আসবে আরও বেশি আক্রমণ। নতুন নয়। মথুরার কারাগারে বন্দি নিজের বোন দেবকীর সন্তানদেরও অজানা আতঙ্কে পরের পর হত্যা করেছিলেন কংস। এই দুনিয়ায়

নবজাতক বলে কোনো শত্রু চুপ থাকে না। কোনো চক্রান্ত বন্ধ থাকে না।

তবু এর মধ্যেও কাজ করছেন মমতা। একা হাতে বহুমুখী কাজ। সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বাংলাকে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। স্বপ্ন স্পর্শ করার দৌড় শুরু করেছেন। সেই দৌড়ে আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছেন। সেই আত্মবিশ্বাস উৎসাহিত করছে বাংলার মানুষকে। মাত্র আট মাসের মধ্যে নতুন কিছু করার, জনমুখী কর্মযজ্ঞের, বাংলাকে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে পৌঁছে দেওয়ার লড়াইয়ের বার্তাটা ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

মমতা কাজ করছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে হাল ধরার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখছি। বাংলা দেখছে। দেশ তাকিয়ে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শুভেচ্ছা রইল।

—

“

আমার স্বর্গীয় পিতা যে আদর্শের বীজ আমার অন্তরে রোপণ করেছিলেন, মানবিকতার স্বরূপ যে ভাবে আমার সামনে উন্মোচিত করেছিলেন, তা আজও আমার অনুপ্রেরণা জোগায়। মনে হয়, ‘সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই। যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, যারা উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কোনো হিসেব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না, সমস্ত থেকেও কেন কিছুতেই তাদের কোনো অধিকার নেই—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের অন্যায়ের নালিশ জানাতে’। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তিই আমার, আমাদের লড়াইয়ের অনেকটা সম্বল।

”

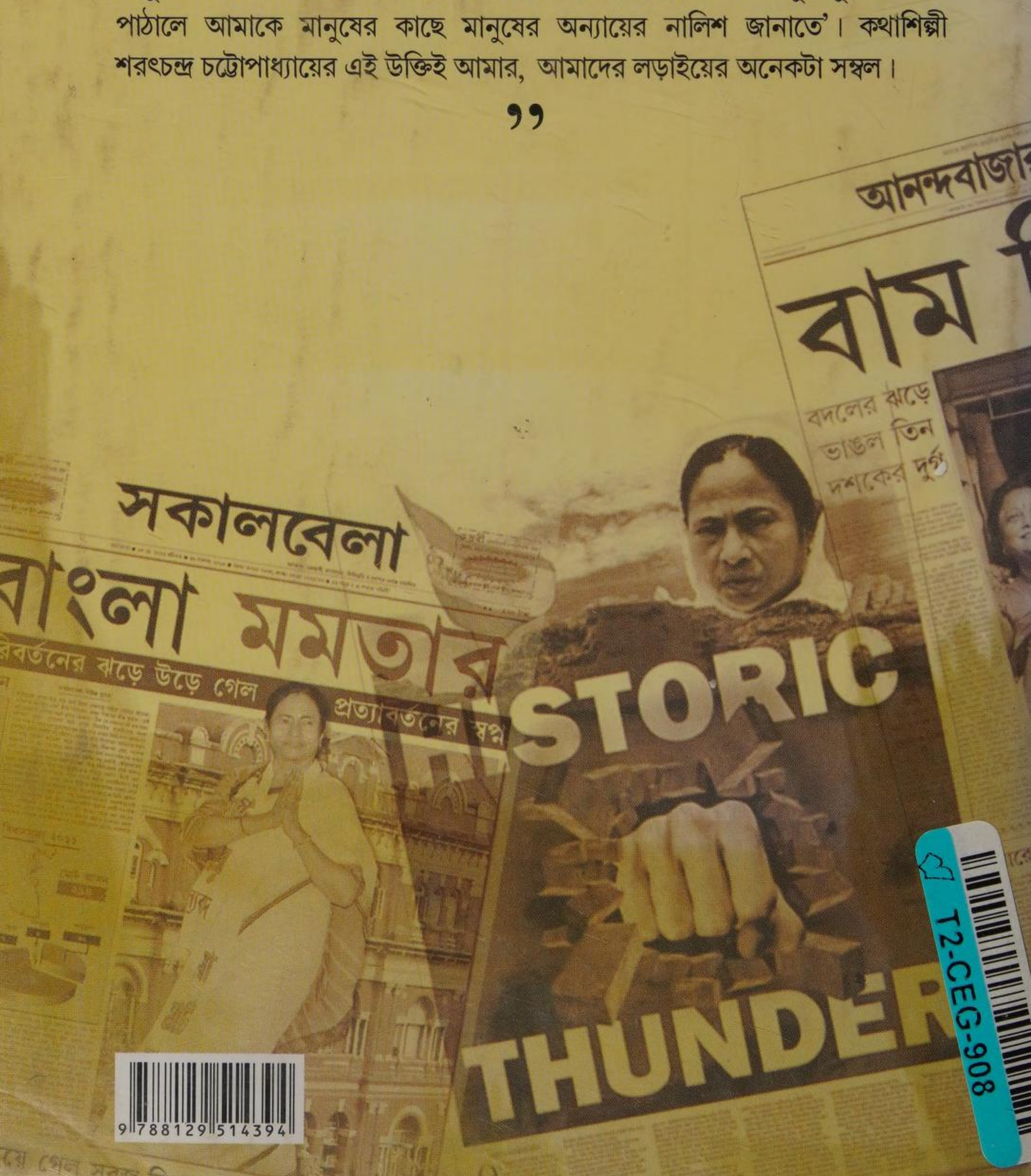

T2-CEG-908